সখা

প্রমদাচরণ সেন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

শ্রীঅম

প্রক।

THE CHILD IS THE FATHER

কলিকাতা

৩৩নং মুসলমানপাড়া লেন, "সখা"-যন্ত্রে, শ্রীললিতমোহন দাস কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

সখা

প্রমদাচরণ সেন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

শ্রীঅন্ন—

প্রক।

THE CHILD IS THE FATHER

কলিকাতা

৩৩নং মুসলমানপাড়া লেন, "সখা"-যন্ত্রে, শ্রীললিতমোহন দাস কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

সখা

একাদশ ভাগ। ১ম সংখ্যা।

জানুয়ারি, ১৮.৩।

নববর্ষ।

আমরা ভাই বোন
এসেছি দুই জন,
এনেছি নব 'সখা'
দিতে উপহার।
তোমরা ভাই বোনে,
নিলে তা প্রীতমনে,
সুখী যে হ'ব কত
বলিব কি আর!

একাদশ বর্ষ।

সখার ছোট ছোট পাঠকপাঠিকাগণ, এই নূতন বৎসরের আরম্ভে তোমাদের কাহার কত বয়স হইল, তাহার হিসাব তোমরা নিজে নিজে রাখ কি? বোধ হয়, সকলে তাহা রাখ না। তোমাদের কাহার কত বয়স হইল, আমাদেরও তাহা জানা নাই বটে, কিন্তু তোমাদের সখার বয়স আমরা বলিয়া দিতে পারি—তোমাদের সখা আজ এগার বছরে পড়িল। আজ সখার জন্মদিন। সন্তানের জন্মদিনে, তাহাকে ভাল জিনিস খাওয়াইয়া, ভাল করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া পিতামাতার কতই না আনন্দ! কিন্তু সখার দুরদৃষ্ট যে, সখার যিনি পিতামাতার স্বরূপ, সখাকে সাজাইবার গুছাইবার ভার যাঁহার উপর, যিনি সখাকে বড় হইতে দেখিলে আজ কতই না আনন্দ করিতেন, সেই প্রমদাচরণ সখার অতি শৈশবে ইহাকে অনাথ করিয়া স্বর্গগত হইয়াছেন। সখা তাঁহাকে হারাইয়া শৈশবেই পিতামাতার স্নেহে বঞ্চিত হইয়াছে, এজন্য সখার পানে চাহিলেই দুঃখ হয়, বৎসরান্তরে সখার কথা ভাবিতে গেলেই চক্ষে জল আইসে।

সখার এত দুঃখেও কিন্তু আমরা তাহাকে দেখিয়া সময়ে সময়ে একটু আনন্দ লাভ করি। যে করুণাময়ের করুণায় সখা মাতৃপিতৃহীন হইয়াও জীবিত রহিয়াছে, ক্ষুদ্র হইলেও, তাঁহারই কৃপায় যে সে তাহার মত ছোট ছোট বালকবালিকাদের কিছু না কিছু মঙ্গল সাধনও করিতে পারে, ইহা ভাবিয়া একটু আশ্বস্তও হই।

আর আমরা আনন্দিত হইতে পারি, যদি দেখি যে, সখার ছোট ছোট সখাগুলি সকলেই সখার সহিত মিশিতে, সখার কথা ভাবিতে, সখার সঙ্গে নানা বিষয়ের কথোপকথন করিতে ব্যগ্র হন। কিন্তু আমাদের সখার অনেক ক্ষুদ্র বন্ধুকেই এ বিষয়ে তত উৎসাহশীল দেখিতে পাই না। তাঁহারা যেন সখার সহিত না খেলিলে নয় তাই খেলান, না কথা কহিলে নয় তাই কথা কহেন, সখার কথা না জিজ্ঞাসিলে নয়, তাই জিজ্ঞাসা করেন। অনেক সময় সখার অনেক বন্ধু সখার সহিত আলাপ করিতে আসেন বটে, কিন্তু সে আলাপ যেন ভাসা ভাসা। যে প্রাণের বন্ধু তাহার সঙ্গে ভাসা ভাসা আলাপে চলে না—তাহার সহিত প্রাণ খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে হয়; নিজে যাহা জানি না তাহা তাহার কাছে প্রাণ খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হয়; আমরা যাহা ভালবাসি, যাহা চাই, তাহাও তাহার কাছে প্রাণ খুলিয়া বলিতে হয়। এই রূপেই প্রকৃত সখ্য জন্মে। ভরসা করি, বর্ত্তমান বৎসরে আমাদের সখার ছোট ছোট বন্ধুগণ সখার সহিত এইরূপেই প্রাণ খুলিয়া কথোপকথন করিবেন।

এক্ষণে আমাদের যে সকল বন্ধু গত বর্ষে অনুগ্রহ করিয়া সখায় লিখিয়াছেন, সখা পড়িয়াছেন, সখার হইয়া দু কথা বলিয়াছেন, বা সখার হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া সখার কথা ভাবিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রদান পূর্ব্বক মঙ্গলময়ের মঙ্গল ভিক্ষা করিয়া নববর্ষে বালকবালিকাদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলাম।

বিবিধ।

নূতন জলযান।—বাবু জগদীশ্বর ঘটক অনেক দিন হইল ধানভাঙ্গা কল আবিষ্কার করিয়াছেন। সম্প্রতি ইনি, পায়ে ঠেলা দুই চাকার গাড়ীর ন্যায় এক রকম জলযান প্রস্তুত করিয়াছেন। এক দিন এই নূতন জলযানের পরীক্ষা হয়। জগদীশ্বর বাবু কালীঘাট হইতে গঙ্গায় নামিয়া ৫ পাঁচ ঘণ্টায় শিবপুর সরকারী বাগান পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

*
* *

মাকড়সার বাসা।—ইহাও যে কাজে আসিতে পারে, তাহা বোধ হয় আমাদের অনেক পাঠকেরই জানা নাই। কিন্তু মাকড়সার বাসায় যে সূতা পাওয়া যায়, সেই সূতায় বহুমূল্য বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। ১৮৭৭ খ্রিষ্টীয় অব্দে ব্রেজিলের রাণী আমাদের ভারতেশ্বরীকে একটি বহুমূল্য পোষাক উপহার দেন। পোষাকটি মাকড়সার জালে প্রস্তুত। শুনা যায়, ইহার চাকচিক্য ও পারিপাট্য বহুমূল্য রেসমের পোষাক অপেক্ষাও অধিক।

*
* *

ধনকুবের।—জে, গোল্ডের বাড়ী মার্কিন্ দেশে। সংপ্রতি ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। বাল্যকালে ইনি অত্যন্ত গরিব ছিলেন। স্বীয় অধ্যবসায় গুণে মৃত্যুকালে যে ধনরাশি রাখিয়া গিয়াছেন, শুনিলে তোমরা আশ্চর্য্য হইবে। একজন লোক প্রতি মিনিটে এক টাকা করিয়া দায় ধনরাশি বিতরণ ক[illegible] লাগিবে।—তোমরা একবার [illegible] তাঁহার সম্পত্তি কত ছিল!

*
* *

পিষ্টকবৃক্ষ।—প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দ্বীপে এই গাছ জন্মে, ইংরেজীতে ইহাকে (Bread fruit) রুটীবৃক্ষ বলে। গাছের ডালে কাঁটালের মত সুন্দর ফল হয়, দ্বীপবাসীদিগকে গম বা চাউল গুঁড়া করিয়া পিঠে তৈয়ারি করিতে হয় না, তাহারা এই ফল হইতেই তাহা পায়। পিঠে গাছ সরু, ঊর্দ্ধে ৪০।৫০ ফিট হয়, অর্দ্ধেক দূর পর্য্যন্ত ডাল পালা হয় না। ইহার আকৃতি কাঁটালের মত হইলেও ভার তত নয়; তথাপি দুই বা আড়াই সের হইবে। ফলের মধ্যে যে শাঁস অর্দ্ধপক্ক অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহা শাদা এবং ময়দার মত। প্রথমে দেখিলে টাটকা রুটীর মত বোধ হয়। সেখানকার লোকেরা এই ফল ৩.৪ ভাগে কাটিয়া যত্নের সহিত ইহার ভিতরের শাঁসটা বাহির করিয়া লয়। পরে মাটিতে গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার তলায় তপ্ত প্রস্তরখণ্ড সকল রাখে। প্রস্তরখণ্ড গুলির উপরে সবুজ পাতা বিছাইয়া দেয় এবং তাহার উপর ফলের এক এক ভাগ রাখিয়া দেয়। ইহার উপরে আবার তাহারা পাথরের খণ্ড, পাতা ও ফল থাক্ থাক্ করিয়া সাজায়। যে পর্য্যন্ত গর্ত্তটী প্রায় পূর্ণ না হয়, সে পর্য্যন্ত এইরূপ করে। তৎপরে পাতা ও মৃত্তিকা কয়েক বুরুল পুরু করিয়া তাহার উপরে দেয়। তপ্ত পাথরের তাপে এইরূপ অদ্ভুত উনানে রুটী সেকা হয় অথবা পিঠে গাছের ফল মানুষের খাইবার উপযুক্ত করিয়া লওয়া হয়।

ভাল ছেলে ও মন্দ ছেলে।

ভাল ছেলে পাঠশালে সোজা চ'লে যায়।
দাঁড়ায়ে না কথা কয়, পথে না খেলায়॥

মন্দ ছেলে পথে দেরি করে খেলা নিয়ে।
পুকুরে ভাসায় জুতা পাল তুলে দিয়ে॥

ভাল ছেলে বড় আশা হৃদয়েতে পোষে।
এক মনে আপনার পড়া করে ব'সে॥

মন্দ ছেলে সারাদিন ঘোরে খেলে খেলে।
না চায় ছুঁইতে বই, পায়ে ছুঁড়ে ফেলে॥

ভাল ছেলে পড়া দিতে নাহি করে ডর।
জিজ্ঞাস যা, দেয় তার তখনি উত্তর॥

মন্দ ছেলে—মাথা ওর চুলকান সার।
"চিক্কণ" বানান করে "চ"য়েতে "আকার"॥

ভাল ছেলে পড়া তার ভাবে শুধু ব'সে।
অঙ্কটি না দিতে দিতে দেয় তাই ক'সে॥

মন্দ ছেলে শ্লেট ধ'রে কাটিয়া আঁচড়।
মুখ লুকাইয়া দেয় সন্দেশে কামড়॥

ভাল ছেলে ধেয়ে চলে পুলকিত মন।
পাইয়াছে পুরস্কার মনের মতন ॥

মন্দ ছেলে দাঁড়াইয়া যেন জানয়ার।
মাথায় গাধার টুপি থাসা পুরস্কার ॥

রোমীয় বীর রেগুলস্।

কার্থেজবাসীদিগের সহিত রোমীয়দিগের বহুকাল ধরিয়া যুদ্ধ চলিয়াছিল। কার্থেজের সৈন্যদল একটি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রোমীয় সেনাপতি সুপ্রসিদ্ধ রেগুলস্ নামক বীরপুরুষকে বন্দী করিয়া কারাগারে প্রেরণ করিল। রোমীয়দিগের সহিত যুদ্ধে কার্থেজীয়দিগকে বিস্তর কষ্ট ও ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছিল, এজন্য কারাগারে রেগুলস্‌কে তাহারা কষ্ট দিতে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু রোমের ক্রমাগত শত্রুতায় তাহারা এরূপ কাতর ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে যে, রোমের সহিত সন্ধি তাহাদের বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠে। তখন তাহারা রেগুলসের কারাগারের ক্লেশ হ্রাস করিতে আরম্ভ করে এবং তিনি যাহাতে কার্থেজীয় দূতগণের সহিত রোমে গিয়া রোমীয়দিগকে বুঝাইয়া কার্থেজের সহিত রোমের সঙ্গত নিয়মে সন্ধি সংস্থাপনের চেষ্টা পান, এজন্য অনুরোধ করে। অন্য বিষয়ে সন্ধিও যদি একান্তই অসাধ্য হয়, তবে উভয় পক্ষ হইতে উভয় পক্ষের বন্দীদিগকে যাহাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, এজন্য চেষ্টা করিতেও তাহারা তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিল।

রেগুলস্ তাহাদের প্রার্থনায় রোমে যাইতে সম্মত হইলেন এবং যদি তাঁহার সন্ধি সংস্থাপনের চেষ্টায় কোন ফল না হয়, তাহা হইলে, ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবেন বলিয়া গুরুতর শপথে আবদ্ধ হইলেন। তখন তাঁহাকে রোমে লইয়া যাইবার জন্য জাহাজ নির্দ্দিষ্ট হইল। রেগুলস্ কার্থেজীয় দূতগণের সহিত জাহাজে চড়িয়া রোমের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জাহাজ ইটালীর

উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইল। রেগুলস্ নগরের প্রবেশ-দ্বারে উপনীত হইলেন, কিন্তু নগরে প্রবেশ করিলেন না। বলিলেন, "আমি দুর্ভাগ্য বশতঃ কার্থেজীয়দিগের ক্রীতদাস হইয়াছি,—এক্ষণে আমি আর রোমের স্বাধীন নগরবাসী নহি। রোমের রাজকার্য্য নির্ব্বাহক সভা এক্ষণে আমাকে নগর মধ্যে প্রবেশের অনুমতি না দিতেও পারেন।" এইরূপে তিনি নগরে প্রবেশ না করিয়া, বাহিরে থাকিয়াই, রোমের রাজকার্য্যনির্ব্বাহক সেনেট নামক মহাসভার সভ্যগণের সহিত সাক্ষাৎপ্রার্থী হইলেন।

রেগুলসের পত্নী তখন তাঁহার শিশু দুই-টীকে সঙ্গে লইয়া রেগুলসের নিকট উপস্থিত হইলেন। রেগুলস্ তাঁহাদের প্রতি বারেক মাত্র উদাস নেত্রে চাহিয়া, কোন কথা না কহিয়াই ভূমির দিকে দৃষ্টি অবনত করিলেন। তাঁহার তৎকালীন অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল যেন তিনি আপনাকে স্বীয় পত্নীর আলিঙ্গন ও সন্তানগণের সমাদর লাভের অযোগ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন।

সেনেটের সভ্যগণ নগরোপান্তে সমবেত হই-লেন। রেগুলস্ অন্যান্য কার্থেজীয় দূতগণের সহিত তাঁহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যে প্রস্তাব লইয়া রোমে আগমন করিয়াছেন, কার্থেজীয় দূতগণের সহিত তাহা সেনেটের সভ্য-গণের নিকট ব্যক্ত করিলেন। তিনি বলিলেন,—"সভ্য মহোদয়গণ, আমি এক্ষণে কার্থেজবাসিগণের ক্রীতদাস, এজন্য তাঁহাদের ইচ্ছাক্রমে আপনাদিগের নিকট সন্ধি এবং যুদ্ধে বন্দীকৃত ব্যক্তিগণের বিনিময় সাধনার্থ প্রস্তাব স্থির করিতে উপস্থিত হইয়াছি।" এইমাত্র বলিয়াই তিনি প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। তিনিও ইতিপূর্ব্বে এই সেনেটের এক-জন সভ্য ছিলেন, এই জন্য সেনেটের সভ্যগণ, তাঁহাকেও এ বিষয়ে স্বীয় মত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি তথায় অধিকক্ষণ থাকিতেও ইচ্ছা করিলেন না। পরে কার্থেজীয় দূতগণ অনুমতি প্রদান করিলে, তিনি সভাতলে নিঃশব্দে আসন গ্রহণ করিলেন এবং সেনেটের সভ্যগণের কথা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অবনত নেত্রে ভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সভ্যগণের বক্তব্য শেষ হইলে, রেগুলসের বলিবার সময় উপস্থিত হইল। রেগুলস্ সেনেটের সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"সভ্য মহোদয়গণ, যদিও কার্থেজ নগরে আমি ক্রীতদাস, তথাপি রোমনগরীতে আমি স্বাধীন এবং এজন্য স্বাধীনভাবেই এখানে স্বীয় মত প্রকাশ করিব। রোমীয়গণ! কার্থেজীয়দিগের সহিত সন্ধি স্থাপন বা তাহাদের সহিত বন্দী বিনিময় করায় তোমাদের কোনই ইষ্টলাভ নাই। কার্থেজবাসিগণ একান্তই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং ক্রমাগত যুদ্ধ চালাইতে অশক্ত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই সন্ধির প্রার্থনা করিতেছে। রোমবাসিগণ! কার্থেজীয়দিগের সহিত সন্ধিতে তোমাদের কোনও লাভই নাই, লাভের আশাও করা যায় না। এজন্য আমি তোমাদিগকে যুদ্ধ চালাইতেই পরামর্শ দিতেছি।"

সেনেটের সভ্যগণ রেগুলসের এইরূপ সত্য-প্রিয়তা, উদারতা এবং নিজ জীবনের প্রতি যত্ন-হীনতা দেখিয়া নিরতিশয় চমৎকৃত হইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে রক্ষা করিতে এবং কার্থেজের সহিত যুদ্ধ চালাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন, ইহা বলাই বাহুল্য। কেহ কেহ রেগুলস্‌কে এরূপ বলিয়াও বুঝাইয়াছিলেন যে, শত্রুর দেশে শত্রু কর্ত্তৃক তাঁহাকে বলপূর্ব্বক যে শপথে আবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহা পালন করিতে তিনি ধর্ম্মতঃ বাধ্য নহেন। কিন্তু রেগুলসের মহৎ হৃদয় কিছুতেই বিচলিত

হইল না। তিনি সত্যের নিকট জীবন অতি তুচ্ছ বোধ করিতেন। এজন্য এই সকল কথায় তাঁহার সাহস ও মহত্ত্বের প্রতি যেন সন্দেহ করা হইতেছে এই রূপ বোধ করিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং গম্ভীর স্বরে সভামণ্ডপ বিকম্পিত করিয়া বলিলেন,—"কার্থেজে আমার নিমিত্ত যে কি ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত করা রহিয়াছে তাহা আমি জানি, কিন্তু আমার হৃদয়ে স্বজাতীর সাহস ও বীর্য্যের পরিমাণ এতই অধিক যে, এরূপ গ্লানিজনক কার্য্যের লজ্জা বহন করা অপেক্ষা কার্থেজীয়দিগের প্রদত্ত যন্ত্রণাকে তুচ্ছ বোধ করি।" আবার বলিলেন,—"কার্থেজে ফিরিয়া যাওয়া আমার কর্ত্তব্য। অপর সকল বিষয় দেবতাগণ দেখিবেন।"

মহত্ত্বসম্ভূত এই রূপ নির্ভীকতা দর্শনে সেনেট সভা এতাদৃশ বীরপুরুষকে রক্ষা করিবার জন্য অধিকতর আগ্রহযুক্ত হইলেন। তিনি যাহাতে স্বদেশে থাকিয়া যান, এজন্য সাধারণ লোক ও সেনেটের সভ্যগণ কর্ত্তৃক বহুবিধ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। কিন্তু পাছে স্নেহের বন্ধন তাঁহার সত্যনিষ্ঠাকে পরাজিত করে, এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না, সন্তানগণকেও নিকটে আসিতে দিলেন না।

কার্থেজে ফিরিয়া যাইবার জন্য কার্থেজীয় দূতগণের সহিত যখন তিনি জাহাজে আরোহণ করিলেন, তখন নগরনিবাসী সমস্ত লোক হাহাকার রবে বিলাপ ও অশ্রুপাত করিতে লাগিল। তিনি কিন্তু স্থির ও প্রফুল্ল, তাঁহার মুখমণ্ডলে বিষাদের চিহ্নমাত্রও লক্ষিত হইল না।

কার্থেজবাসিগণ অতিশয় নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিল, এবং ইহারা তাঁহার প্রতি নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। এজন্য তিনি কার্থেজে উপনীত হইলে, তাহারা তাঁহাকে যার পর নাই যন্ত্রণা দেয়। চক্ষুর পাতা কাটিয়া দিয়া প্রচণ্ড সূর্য্যের দিকে তাহারা তাঁহার চক্ষু ফিরাইয়া রাখিয়াছিল। অবশেষে তাঁহাকে সূচ্যগ্র-শলাকা-বেষ্টিত একটি সিন্দুকে বন্ধ করিয়া অনাহার, অনিদ্রা ও বিবিধ যন্ত্রণার সাহায্যে তাঁহার প্রাণসংহার করে। স্বর্গই এই স্বদেশহিতৈষী সত্যপ্রতিজ্ঞ পুরুষের উপযুক্ত বাসস্থান।

রামানন্দ ও তাহার কাকা।

রামানন্দ নিমন্ত্রণ পাইলে পেট উঁচু করিয়া এতই খাইয়া ফেলিত যে, উঠিয়া আসিবার সময় আর সে একাকী সহজে উঠিয়া আসিতে পারিত না। কেহ না কেহ হাত ধরিয়া তাহাকে বাড়ীতে আনিয়া হাজির করিত। আসিতে আসিতেই হয় ত সে পথে বমি করিত। বমি না করিলেও, ঘরে আসিয়া সে এরূপ অসুখ অনুভব করিত, যে প্রায় প্রতিবারই নিমন্ত্রণে আহারের পর সে 'আর বেশি করিয়া খাইব না' বলিয়া শপথ করিত। কিন্তু সে শপথ কতক্ষণ থাকিত? বেশি খাইবার নিমিত্ত যে কষ্ট উপস্থিত হইত, তাহা যাই কমিতে আরম্ভ হইত, রামানন্দও অমনি সঙ্গে সঙ্গে আপনার প্রতিজ্ঞা ভুলিতে আরম্ভ করিত। পৌষ-সংক্রান্তির দিন কিন্তু আমাদের রামানন্দ ঘরে তাহার কাকার সম্মুখে খাইতে বসিয়া বড়

বিপদে পড়িয়াছিল। নানা রকম পিঠা পরমান্নের গন্ধে রামানন্দ প্রথমে এতই উৎসাহিত হইয়াছিল যে, সে ভাবিয়াছিল, আজি পিঠা খাইব, পরমান্নে ডুবিয়া থাকিব। কিন্তু কাকা কাছেই বসিয়াছিলেন বলিয়া তাহার সে আশা পূর্ণ হইল না। কাকা তাহাকে কিছুই খাইতে দিলেন না এমন নয়, তবে যত পাইলে রামানন্দ তুষ্ট হইত, তত পাইল না। রামানন্দ তখন বলিল, "কাকা আমি আরও পিঠা ও পরমান্ন খাইতে পারি।"

কাকা বলিলেন,—"না, তুমি যথেষ্ট খাইয়াছ, আরও খাইলে তোমার পীড়া হইবে।"

রামানন্দ বলিল,—"কেন, এখনও ত আমি অনেক খাইতে পারি। বিমল, সুমতি দুজনের যে পিঠা ও পরমান্ন র'য়েছে সে দুই ভাগও এখন আমি একলা খেতে পারি কাকা!"

কাকা বলিলেন,—"স্বচ্ছন্দে আর পার না, এখন যা খাইবে, তাহাতে কষ্ট হইবে।"

রামানন্দ পুনরপি বলিল,—"বেশি কষ্ট হ'বে না, কাকা! তা না হয়, শুধু বিমলের ভাগই খাব? মা আবার তাকে দেবেন এখন।"

কাকা মনে মনে একটু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, ততক্ষণ যাহা পাইয়াছ, তাহাই খাও।" বলিয়া, রামানন্দের বই রাখিবার যে ব্যাগটি ঘরে ঝুলিতেছিল, তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভাল, রামানন্দ, বিমল তোমার ভাই হয়, এই ত তোমার ব্যাগ র'য়েছে, তবে বিমলের বইগুলি কেন তুমি উহারই মধ্যে করিয়া স্কুল লইয়া যাও না?"

রামানন্দ বলিল,—"তাহা কিরূপে হইবে? আমার পাটীগণিত আছে, অভিধান আছে, আরও কত বই র'য়েছে; এর উপর আবার বিমলের বইগুলা উহাতে ধরিবে কেন?"

কাকা বলিলেন,—"ধরিলে আপত্তি নাই ত? ভাল, আমি চেষ্টা করিয়া দেখিতেছি, তুমি দেখ।"

বলিয়া কাকা বিমলের বইগুলিও ব্যাগের মধ্যে প্রবেশ করাইতে লাগিলেন। ক্রমে ব্যাগটির এমন অবস্থা হইল যে আর তাহাতে বই ধরে না। কাকা কিন্তু তবুও ক্ষান্ত নন, ব্যাকরণখানি ব্যাগের পাশ দিক দিয়া গুঁজিয়া, ভূগোলখানি আখ্যানমঞ্জরীকে একটু সরাইয়া, এবং পেনসিল কলমগুলি বইয়ের আশ পাশের একটু আধটু ফাঁক দিয়া গলাইয়া দিতে লাগিলেন। এখনও কিন্তু দুইখানি বই বাকি। কাকা ব্যাগের হাতল দুইটি উপরদিকে টানিয়া বইগুলি চাপিতে আরম্ভ করিলেন।

রামানন্দ কাতর হইয়া বলিল,—"গেল—ছিঁড়ে গেল—আর টেনে কাজ নাই—আর চেপে কাজ নাই কাকা,—তুমি ওর বই বা'র ক'রে নাও।"

কাকা বলিলেন,—"এই যে, আর বেশি নয়, খান দুই হইলেই হয়।" বলিয়া বাকি দুইখানি বই খুব জোরে চাপিয়া ব্যাগের ভিতর দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এতক্ষণে রামানন্দের আর সহ্য হইল না। সে খাওয়া ফেলিয়া একবারে উঠিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি আসিয়া ব্যাগ ধরিয়া বলিল,—"তুমি বিমলের বই বা'র ক'রে নাও, কাকা,—গেল—আমার ব্যাগ ছিঁড়ে গেল!"

কাকা কিন্তু বই দুখানি কোন রকমে তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া খুব জোর দিয়া ব্যাগের মুখটি বন্ধ করিয়া, ব্যাগটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাহাকে দেখাইয়া বলিলেন,—"কৈ, ব্যাগ্ তো কোথাও ছিঁড়ে নাই! তুমি প্রতিদিন ইহাতে করিয়া বিমলের বইগুলি লইয়া যাইও। বরং সব বইগুলি যদি ইহাতে গুছাইয়া প্রবেশ করাইতে

না পার, আমার কাছে লইও যাইও, আমি সবগুলি গুছাইয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিব।"

রামানন্দ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিল—"না কাকা! তোমার গুছাইয়া দিতে হইবে না, আজ তুমি আগে ও গুলি বাহির করিয়া নাও।"

কাকা বলিলেন,—"কেন, তোমার ব্যাগ তো কৈ, কোথাও ছিঁড়ে নাই?"

রামানন্দ বলিল,—"ছেঁড়ে নাই বটে, কিন্তু ছিঁড়িতেও তো বড় দেরি নাই, ব্যাগ চড় চড় করিতেছে; ব্যাগ্‌টি আমার জন্মের মত খারাপ হইয়া গেল!"

কাকা শুনিয়া বলিলেন,—"বিমলের বই-গুলি রাখিতেই তোমার ব্যাগটি খারাপ হইয়া গেল বাপু!"

রামানন্দ বলিল,—"তা হইবে না, আমার অত বই র'য়েছে, আবার বিমলের বই ধরে কি?"

কাকা তখন হাসিয়া বলিলেন,—"বাপু বিমলের পিঠা পরমান্নটুকু তোমার পেটে ধরিবে, কিন্তু তাহার বই কখানি তোমার ব্যাগে ধরিবে না, এ বড় অত্যাচার! একটি চামড়ার ব্যাগের উপর তোমার এতই মমতা, কিন্তু নিজের উদর-ব্যাগটির উপর মমতা এত কম কেন? ব্যাকরণ কেমন কাজের বই, ভুগোলে এই সমস্ত পৃথিবীটার বিষয় জানিবার কত প্রয়োজনীয় কথা আছে, এমন ভাল ভাল বই তোমার ব্যাগে রাখিতে চাহিলাম, তুমি কত আপত্তি করিলে, কিন্তু উদরে আর ধরে না, তবু ছাই দুটো পিঠে আর একটু পরমান্ন ইহা পেটে ঠাসাঠাসি করিয়া রাখিবার জন্য এত ব্যস্ত হইতেছিলে কেন?" ভাবিয়া দেখ, ব্যাগটি ছিঁড়িলে তত ক্ষতি নাই, কিন্তু উদরটি ছিঁড়িলে বিলক্ষণ ক্ষতি। বেশি খাইলেই উদরটি তখনই ছিঁড়িয়া যাইতে বা লোক তখনই মরিতে না পারে বটে, কিন্তু তন্নিমিত্ত ক্লিষ্ট হইয়া উদরযন্ত্র যে শীঘ্রই অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, ইহা বড়ই ঠিক কথা। এরূপ হইলে লোক বেশিদিন বাঁচিতে পারে না। খাইবার জন্য বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই, বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই খাওয়ার প্রয়োজন। ভরসা করি, তুমি এ কথা ভুলিবে না।"

ব্যাগে বই রাখিবার কথা হইতে হইতে, অকস্মাৎ উদরে পায়স পিষ্টক রাখিবার কথা আসিয়া জুটিল দেখিয়া রামানন্দ কাকার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

কাকা বলিলেন,—"কি রামানন্দ, চুপ করিয়া রহিলে যে?"

রামানন্দ তখন মনে মনে কি একটু ভাবিয়া বলিল,—"তা, পেটের সঙ্গে ব্যাগ কি সমান হ'তে পারে, কাকা! তুমি আর একটু চাপাচাপি করিলেই ত ব্যাগ ছিঁড়িত, কিন্তু আমি কত বেশি ক'রে খেয়েও ত দেখেছি, কৈ পেট ত ছিঁড়ে না?

কাকা তাহার কথা শুনিয়া বড়ই হাসিয়া উঠিলেন। কাকার হাসির পরই রামানন্দ বলিল,—"আর বলিতে হইবে না, বুঝিয়াছি কাকা!"

কাকা বলিলেন,—"তবে যাও 'আঁচিয়ে এস, তোমাকে আজ ক্ষুধা ও খাদ্যের সম্বন্ধে আমি কয়েকটি কথা বুঝাইয়া বলিয়া দিব।"

রামানন্দ হাসিয়া আঁচাইতে গেল। আঁচাইয়া আসিলে কাকা বিমলকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাদের দুই জনকে কাছে বসাইয়া এ সম্বন্ধে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। আমরা কিন্তু আজ আর সে কথা বলিব না।

নব-বর্ষের উপহার

নলিনী।—সুরেন, এই দেখ আমার কেমন দুটি বিড়াল। নূতন বছরে বাবা আমাকে এই দুটি বিড়াল দিয়েছেন। বল ত কোনটি ভাল?

সুরেন।—আমি বলি ঐ শাদা বিড়ালটি ভাল।

নলিনী।—তা নয়, কাল বিড়ালটি ভাল। ওকে না দিলে কিছুই খায় না, চুপ ক'রে থালার ধারে বসে থাকে। শাদা বিড়ালটি কিন্তু থালা হ'তে মাছটাছ চুরি ক'রে খায়।—আমি কালটিকে বেশি ভালবাসি, তাই তার গলায় ফিতে বেঁধে দিয়েছি।

শুভ সম্ভাষণ।

১

সখা'র জনম দিনে আয় তোরা আয়,
প্রিয়তম শিশু ভাই বোন!
বরষের পরে আজি হরষ পরাণে
নে গো এই শুভ সম্ভাষণ।

২

সাধ হয়, গেঁথে আজি ফুল্ল ফুলকুল
পরিয়ে দি তোদের গলা'য়,
সোণা-মুখে সোণা-হাসি, প্রভাতের ফুল,
যত দেখি আরো প্রাণ চায়।

৩

সাধ হয়, ঢেলে দিই প্রীতি ভালবাসা
ওই কচি বুকগুলি ভরি,
পরাণের স্নেহে মেখে আদরের ভাষা
সাধ পূরে বিতরণ করি।

৪

সাধ হয়, জগতের ধরম করম
জাগিয়ে দি তোদের পরাণে,
জগতের শুভ আশা সত্যের বিক্রম,
এনে দিই যা' পাই যেখানে।

৫

সাধ হয়, হ'স্ তোরা এ'মর জগতে
মা বাপের কুলোজ্জ্বল ধন,
কীর্ত্তিমান, উচ্চ প্রাণ,—অভাগা ভারতে
বুকভরা অমূল রতন!

৬

সাধ হয়, ভাই গুলি "দেবতার ছেলে"
বোন গুলি "দেবতার মেয়ে,"—
চাই না স্বরগ বুঝি হেন দিন পেলে,
অনিমিষে তাই দেখি চেয়ে!

৭

ক্ষুদ্র "সখা" ক্ষুদ্র প্রাণে বর মাগে তাই,
জগদীশ! ও চরণ-তলে,
"সখা"র প্রাণের সখাগুলি
থাকে যেন সবাই কুশলে।

৮

ধরণীর শোক তাপ খর রবিকরে
না শুকায় মুকুলেই ফুল,
কুপথে সুপথ ভাবি কণ্টক-কাননে
পড়ি যেন না হয় আকুল।

৯

বড় সাধ, ভাই বোন! আজি শুভক্ষণে
তোদের পরি'য়ে নব বেশ,
হাতে দিই নব "সখা" সোহাগের ধনে,
মুখে দিই সুমিষ্ট সন্দেশ!

১০

"সখা"র জনম-দিনে, আয় তোরা আয়
"সখা"র সে প্রিয় সখাগণ,
বরষের প'রে আজি হরষ পরাণে
করে "সখা" শুভ সম্ভাষণ।

জৈত্রী ও জায়ফল।

ভূগোলগ্রন্থ পড়িবার সময় তোমাদের মধ্যে অনেকেই মানচিত্রে দেখিয়া থাকিবে, ভারতমহাসাগরের পূর্ব্বাংশে ভারতসাগরীয় দ্বীপ-পুঞ্জ নামে কতকগুলি দ্বীপ আছে। দ্বীপগুলি পরস্পর অতি নিকটবর্ত্তী। এই সকল দ্বীপে জৈত্রী, জায়ফল, এলাচ, লবঙ্গ, কর্পূরাদি অনেক রকম মসলা উৎপন্ন হয়। মসলাকে ইংরাজি ভাষায় Spice (স্পাইস্) বলে, এইজন্য এই সকল দ্বীপের অনেকগুলিই Spice Islands (স্পাইস্ আইলাণ্ড্স্ অর্থাৎ মসলা দ্বীপ) নামে খ্যাত।

কর্পূরাদি বৃক্ষ চীন ও সিংহলদ্বীপাদিতেও জন্মে, আবার লবঙ্গাদি আমেরিকার West India Islands (ওয়েষ্ট্ ইণ্ডিয়া আইলাণ্ড্স্) নামক দ্বীপাদিতেও পাওয়া যায়; কিন্তু জায়ফলের গাছ এই সকল স্পাইস্ আইলাণ্ড্স্ ভিন্ন আর কোথাও জন্মে না। এই দ্বীপের ন্যায় প্রাকৃতিক ধর্ম্মবিশিষ্ট অন্য দ্বীপেও অনেকে এই বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই সফল হইতে পারেন নাই। কেবল লঙ্কাদ্বীপে ইহার দুই চারিটী গাছ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এখানেও সে গাছ ভাল বাড়ে না। ইহার স্বদেশে এই গাছ ৩০।৩৫ হাত লম্বা হয়, কিন্তু লঙ্কাদ্বীপে ১৫।২০ হাতের বেশি বড় হয় না।

জায়ফলের চাষে বেশ লাভ আছে। গাছ-গুলি দেখিতে মৌরা গাছের মত। এক বিঘা জমিতে ৭০টা গাছ জন্মিতে পারে এবং এক একটা গাছ হইতে প্রতি বৎসর ১০।১২ টাকার জৈত্রী জায়ফল পাওয়া যায়। সুতরাং এক এক বিঘায় বৎসরে সাত শ আট শ টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু লাভের কথা শুনিলে কি হয়, গাছ জন্মাইতে ও রক্ষা করিতে কষ্টও বিলক্ষণ, আর লাভও অনেক বিলম্বে ঘটিয়া থাকে। পনর বৎসরকাল কষ্ট করিয়া এই গাছকে রক্ষা করিতে হয়। উইপোকা শুয়া-পোকায় গাছ নষ্ট করিয়া ফেলে, ঝড় বৃষ্টিতেও গাছের অনেক ক্ষতি হইয়া যায়। উইয়ের দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঐ দ্বীপের লোকেরা শূকরের বিষ্ঠা গুলিয়া গাছের গোড়ায় ছড়াইয়া দেয়। তাহারা বলে, এইরূপ করিলে, উইয়ের বংশ একেবারে নির্ব্বংশ হইয়া যায়।

যে স্থানে বেশি ছায়া আছে আর ঝড় বৃষ্টিরও উপদ্রব নাই, এইরূপ স্থানেই এই গাছ ভাল রকম জন্মে। আমাদের দেশের নারিকেল গাছের মত এই গাছেও বার মাসই ফুল ফল হয়। সুতরাং আম ও অন্যান্য অনেক ফল উৎপন্ন হইবার সময়ে বেশি ঝড়, জল, কি বেশি কোয়াসা হইলে যেমন সংবৎসরের আশায় একবারে নিরাশ হইতে হয়, ইহার চাষে সে ভয়টি নাই। এই বৃক্ষের ফল দেখিতে গাব ফলের মত। এই ফলের বীচিকেই আমরা জায়ফল বলি। আর, এই ফলের বীচি ও খোসা এই দুইয়ের মাঝখানে যে একটি পদার্থ থাকে, তাহাকেই জৈত্রী বলা যায়। হরিতকী, আমলকী প্রভৃতি কতকগুলির মত জায়ফল যে একটি ফল নয়—একটি ফলের বীচিমাত্র—ইহা বোধ হয়, তোমরা এখন বুঝিতে পারিয়াছ। এই জায়ফল ও জৈত্রী দুইটি জিনিসই বিলক্ষণ সদ্‌গন্ধ-বিশিষ্ট আর এই দুইটি জিনিসই আমাদের অনেক ব্যবহারে লাগে।

বালিকাদিগের বিশেষ পৃষ্ঠা।

(প্রাপ্ত)

সেলাই।

(দস্তানা।)

—*—
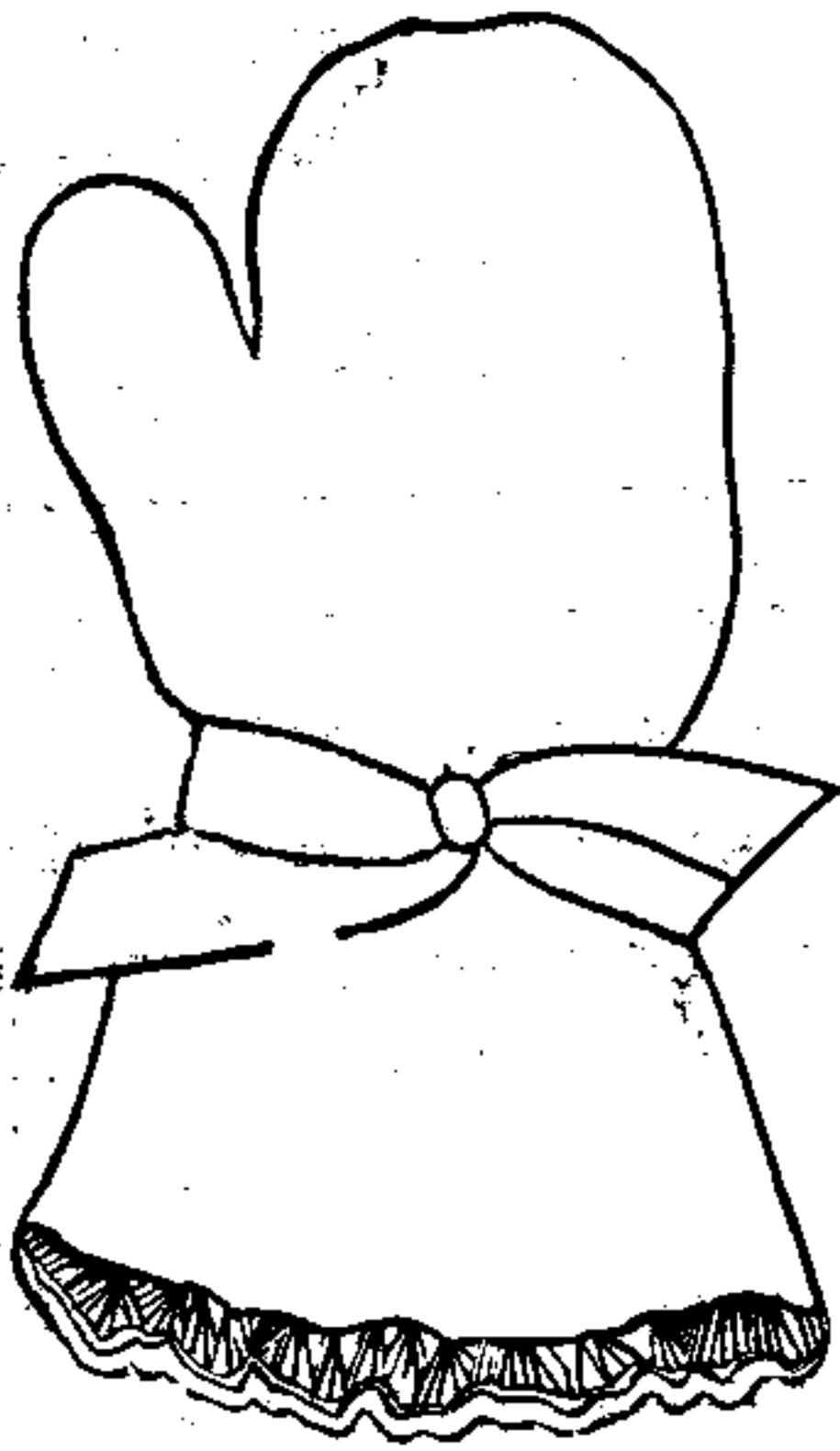
পাঠিকাগণ! এই শীতের সময় আমাদের দেশের লোকেরা নানাপ্রকার দস্তানা গলাবন্ধ, মোজা, টুপি, প্রভৃতি কিনিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা বোধ হয় জানেন না যে, আমরাও সেইরূপ সুন্দর সুন্দর জিনিষ নিজের হাতে তৈয়ারি করিতে পারি। আরও ঐ সমস্ত দস্তানা ইত্যাদির মূল্যও অত্যন্ত অধিক, সুতরাং সকলে কিনিতেও পারেন না, এমন অবস্থায় যদি আমরা নিজের হাতে ঐ সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করি, তাহা হইলে মনের মত অথচ অল্প খরচে হয়।

আজ আমি তোমাদিগকে ছোট ছোট ছেলেদের দস্তানা তৈয়ারি করিবার এক নূতন উপায় বলিতেছি; আশা করি, তোমরা নিজে উহা তৈয়ারি করিয়া তোমাদিগের ছোট ছোট ভাই ভগ্নীকে উপহার দিবে।

এই দস্তানা ৫।৬ মাসের ছেলেদের জন্য। ৫।৬ মাসের ছেলেদের ৫টা অঙ্গুলিবিশিষ্ট দস্তানা পরান বিশেষ কষ্টকর। এইজন্য নিম্নে যে দস্তানার কথা বলা হইতেছে, উহার কেবল বৃদ্ধ অঙ্গুলি একদিকে, আর চারিটা আঙ্গুল একত্রে।

দস্তানা বুনিবার জন্য তিনটা লোহার কাঁটা, ১ আউন্স এণ্ডালুসিয়ান (*Andalusian* অর্থাৎ ফিকে গোলাপি রঙ্গের পশম) আর ২ হাত ১ আঙ্গুল চওড়া নীল রেসমি ফিতা চাই।

১ম লাইন—প্রথমে ১টা কাঁটাতে ৪৮টা ঘর তোল। পশম সামনে আনিয়া বাম হাতের কাঁটা হইতে না বুনিয়া ১ ঘর খুলিয়া লও, (উল্টা বুনিবার সময় যে ভাবে ঘরের ভিতর কাঁটা দাও সেই ভাবে এই ঘর খুলিয়া লইতে হইবে,) ১টা ঘর সোজা বুন; পুনর্ব্বার পশম সামনে আনিয়া ১টা ঘর খুলিয়া লও, ১টা সোজা বুন, বাম হাতের কাঁটাতে যত গুলা ঘর আছে, সব গুলাই এই প্রকারে বুন।

২য় লাইন—*পশম সম্মুখে আনিয়া ১টা ঘর খুলিয়া লও এবং আর একটা ঘর ও পূর্ব্ববারের পশম সামনে আনিয়া বুনাতে যে ঘরটা হইয়াছে ঐ দুইটা ঘর এক সঙ্গে সোজা বুন * পুনর্ব্বার চিহ্নিত স্থান হইতে আরম্ভ কর। দ্বিতীয় লাইনের ন্যায় ক্রমাগত ৩৮ লাইন বুনিতে হইবে।

৪১ লাইন—১টা ঘর সোজা, ২টা এক সঙ্গে সোজা চিহ্নিত স্থান হইতে আরম্ভ কর।

৪২ লাইন—১টা ঘর সোজা ১টা ঘর উল্টা চিহ্নিত স্থান হইতে আরম্ভ কর। ৪২ লাইনের ন্যায় আরও ১০ লাইন বুনিতে হইবে।

৫৩ লাইন—প্রথম লাইনের ন্যায়।

৫৪ লাইন—দ্বিতীয় লাইনের ন্যায়। হাতের চেটোর জন্য দ্বিতীয় লাইনের ন্যায় ২৮ লাইন বুন।

৮৩ লাইন—এইবার বৃদ্ধ অঙ্গুলি বুনিতে হইবে। কাঁটায় সর্ব্বশুদ্ধ ৭২টা ঘর আছে, অঙ্গুলির জন্য ২৪টা ঘর বুন, বাকি সব ঘর আর একটা কাঁটায় তুলিয়া রাখ, ঐ গুলা এখন বুনিতে হইবে না; কাঁটা ফিরাইয়া লইয়া ঐ ২৪টাই ক্রমাগত ২০ লাইন বুন।

২১ লাইন—* ১টা সোজা, ২টা এক সঙ্গে সোজা চিহ্নিত স্থান হইতে আরম্ভ কর। ২১ লাইনের ন্যায় আরও ৪ লাইন বুনিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দাও।

এখন তৃতীয় কাঁটাতে যে ঘরগুলা আছে, সেই গুলা দ্বিতীয় লাইনের ন্যায় ২৮ লাইন বুন।

১১২ লাইন—১টা সোজা ২টা এক সঙ্গে সোজা চিহ্নিত স্থান হইতে আরম্ভ কর।

১১২ লাইনের ন্যায় আরও ৪ লাইন বুনিয়া মুখ বন্ধ কর।

প্রথমে বৃদ্ধ অঙ্গুলি সেলাই করিয়া পরে বাকিটা সেলাই করিবে। বাম হাতের জন্য বুনিবার সময়, হাতের চেটোর জন্য, ২৮ লাইনের স্থানে ২৭ লাইন বুনিতে হইবে।

এখন দেখিবে দস্তানার মধ্যখানে গোড়া ও শেষ হইতে অন্য রকম বোনা হইয়াছে। দস্তানা হাতে দিয়া, এই স্থানের উপর প্রত্যেক দস্তানায় ১হাত করিয়া নীল রেসমি ফিতা বাঁধিয়া দাও।

বালকবালিকা।

নববর্ষ।

কালের অনন্ত গভীর সাগরে
  ডুবিল একটি বরষ এবে,
দেখিতে দেখিতে আইল নূতন—
  দাও হে যাইতে পুরাণে তবে।

যদিও পুরাণ হইল অতীত
  ভাব একবার কি দিলে তারে;
কাঁদিতে কাঁদিতে গেল সে কি চলে,
  অথবা গেল সে আনন্দ ভরে?

উদ্যম ভরসা লইয়া সহিতে
  উদিত হইল নূতন বরষ,
আহ্বান' তাহারে বালকবালিকা
  দেখায়ে তাহারে মনের হরষ।

আবার নূতন ভালবাসা ল'য়ে
  এল "সখা" তোমা সবার কাছে
সখা বলি ডাকি লও হে তাহারে,
  দাও উপহার যার যা আছে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু।

নববর্ষের ধাঁধা।

—•—

১। চিরজীবী হয়ে আছি বিধাতার বরে,
বয়সের চিহ্ন কিছু নাহি কলেবরে।
মার কোলে পেট হ'তে প'ড়েছি যে ভাবে,
সেই ভাবে নাকি মোর চিরদিন যা'বে।
মা দিলেন জন্মকালে ছয়খানা শাড়ী,
দুইমাস পরে তার একখান ছাড়ি।
মাথার টোপর রাখি খুলিয়া যখন,
বৎস ব'লে সবে মোরে করে সম্ভাষণ।
গুটাইয়া রাখি যবে দুইখানি পা,
সর বলে লোক সব, বলে সরে যা।
এই আমি আসিয়াছি সাহেবের বাড়ী।
কি নাম আমার ভাই বল তাড়াতাড়ি।
নব বেশে মোরে যদি দেখিবারে চাও।
শান্ত শিষ্ট হয়ে চৈত্র-সংক্রান্তি কাটাও।
তখন আসিব আমি তোমাদের ঘরে।
কীর্ত্তিরূপ উপহার দিও যত্ন ক'রে।
চিরকাল রেখে দিব আকাশের গায়,
যাহাতে সকল লোক দেখিবারে পায়।
ঝড়ে জলে কোন কালে নষ্ট না হইবে।
রবির কিরণ-পাতে আরো ঝলসিবে।
কিন্তু যদি উপহার দাও টাকা কড়ি।
অতল সাগর-তলে ফেলি দড়বড়ি।

২। লেজ নিয়ে সুস্থ দেহে থাকে সে যখন,
জ্ঞান আশে তার পাশে যায় কত জন।
কিন্তু কেটে দিলে লেজ, ভাঙ্গে নিজ ঘর।
ডাকিয়া কাকের ডাক হয় সে কাতর।

৩। যম, শশ ও স্বর্ণ এই তিনটীরই তিন অক্ষরের এমন এক একটি প্রতিশব্দ আছে যে, সেই তিনটিকে গুছাইয়া তিন পংক্তি করিয়া সাজাইতে, পারিলে ১ম, ২য়, ৩য় পংক্তি ক্রমান্বয়ে পড়িয়া গেলেও যা হয়, উপর হইতে প্রত্যেকের ১ম, ২য়, ৩য় বর্ণগুলি পর পর পড়িয়া গেলেও তাই হইবে।—বল ত তিনটি শব্দ কি? সাজাও ত কার নীচে কোন্‌টি লিখ্‌বে?

পত্রপ্রেরকদের প্রতি

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার, বোয়ালিয়া।—রাণী ভবানীর বাকি অংশটুকু পাইলাম। এখনও পড়িয়া উঠিতে পারি নাই।

শ্রীহরকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, আগড়তলা।—এখন আর পদ্যটি প্রকাশের সময় নাই।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র রায়, হেয়ার স্কুল।—ধাঁধার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার উত্তর পাঠাইতে হয়।

সখা। একাদশ ভাগ। ২য় সংখ্যা।

ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩।
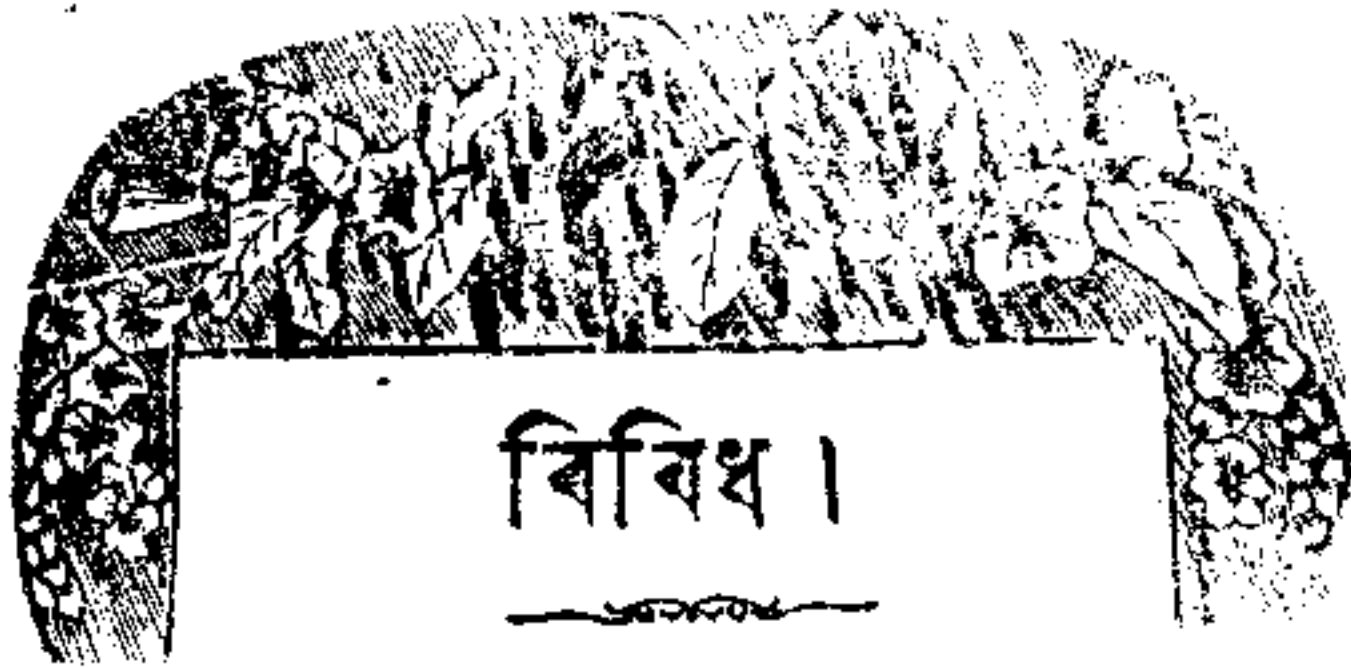
বিবিধ।

শোক-সংবাদ।—সখার পাঠক পাঠিকাদিগকে আজ আমরা একটি দুঃখের সংবাদ দিব। তাঁহারা সখায় অনেক সময় বাবু অম্বিকাচরণ সেনের লেখা পড়িয়াছেন। সেই অম্বিকা বাবু ১৪ ই ফেব্রুয়ারি রাত্রি ৮টার সময় পরলোকগত হইয়াছেন। অম্বিকা বাবু স্বর্গীয় প্রমদাচরণেরই জ্যেষ্ঠ সহোদর। সখার প্রতি তাঁহার বড়ই স্নেহ ছিল। কিন্তু তিনি যে কাজ করিতেন, তাহাতে তাঁহার এক দণ্ডও অবকাশ ছিল না। তবু কিন্তু তিনি সখার উন্নতির জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা কি বলিব। তিনি খুলনার জজ্ আদালতের প্রধানতম উকীল ছিলেন। দেশ-হিতকর কার্য্যে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি বিদ্বান্, অথচ অতি অমায়িক ও মিষ্টভাষী ছিলেন। বয়সও চল্লিশ বৎসরের কিছু বেশি হইয়াছিল মাত্র। তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই আজি তাঁহার জন্য কাতর। ঈশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মাকে শান্তি দান করুন।

* * *

ছাত্র-নিমন্ত্রণ।—মফস্বলের যে সকল ছাত্র এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন, ছোট লাট সাহেব তাঁহাদিগকে আপনার বেল্‌বেডিয়রের বাটীতে একটি গার্ডেন পার্টিতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ক্রীড়া, কৌতুক, বাদ্য, ব্যায়াম—সকল বন্দোবস্তই ছিল; জলযোগের ব্যবস্থাও না ছিল এমন নয়। ছোট লাট ও তাঁহার পত্নী কথায় বার্ত্তায় বালকদিগকে আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন।

* * *

যৌথ কারবার।—আমাদের দেশে ক্রমেই যৌথ কারবারের প্রতিপত্তি বাড়িতেছে। বোম্বাই প্রদেশে এখন ২৩২টি যৌথ কারবারের কোম্পানি আছে; এই কোম্পানিগুলির মূলধন প্রায় ১১ কোটি টাকা। গত বৎসর আবার, ৩১টি যৌথ কারবারের কোম্পানি নূতন খোলা হইয়াছে। এখানে কল কারখানার ১৩১টি কোম্পানি আছে। এ সকলগুলিই কিন্তু এদেশীয় লোকের নয়। আমাদের দেশের লোকে যখন এই সকল কাজ নিজে নিজে করিতে পারিবেন, তখনই বুঝিব আমাদের দেশের উন্নতি।

* * *

সম্রাটের পোষাক।—জর্ম্মন্ সম্রাটের পোষাকের উপর ঝোঁকটা বড়ই বেশি। ঘুমাইবার সময়টা বাদ দিলে, দিবারাত্রির মধ্যে তিনি বাকি ১৮ ঘণ্টা মাত্র সময় পান। এই ১৮ ঘণ্টার

মধ্যেই সম্রাট ১২টি বার পোষাক পরিবর্ত্তন করেন। তাঁহার পোষাকের ঘরে কত রকম পরিচ্ছদ আছে, তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। পাঠক পাঠিকাগণ! সম্রাটের পোষাকের কথা পড়িয়া তোমরা কি মনে করিতেছ, বল দেখি।

* *
*

পানামা যোজক।—সুয়েজ খালের খননকর্ত্তা বৃদ্ধ ফরাসি কৌণ্ট ফার্ডিনাণ্ড ডি লেসেপ্‌স্ সাহেবের নাম সভ্য জগতের সকলেই শুনিয়াছেন। লেসেপ্‌স্ সাহেবের বয়স এখন ৮৭ বৎসর। ইনি আমেরিকার পানামা যোজক কাটিয়া উহা খালে পরিণত করিতে গিয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন। খাল কাটিবার পূর্ব্বে ইনি আরও কয়েকজন ধনীর সহিত মিলিয়া একটি কোম্পানি গঠন করিয়া দেশের লোককে ইহার অংশ বিক্রয় করেন। ফরাসি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতেও সাহায্য প্রাপ্ত হন। এখন কিন্তু কাটায় ব্যাঘাত পড়িয়াছে। এদিকে ফ্রান্সের এখনকার মন্ত্রিসমাজের লোকেরা বলিতেছেন, লেসেপ্‌স্ প্রভৃতি না কি তখনকার মন্ত্রিসমাজের সভ্যদিগকে উৎকোচ দিয়াই রাজকোষ হইতে টাকা বাহির করিয়া লইয়াছিলেন। এই সকল গোলযোগ লইয়া লেসেপ্‌সের নামে অভিযোগ আইসে। বিচারে লেসেপ্‌স্‌কে অপরাধী সাব্যস্ত করা হইয়াছে, এবং ইহাঁর পাঁচ বৎসর কালের জন্য কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। বৃদ্ধ লেসেপ্‌সের জন্য সমগ্র ইউরোপ দুঃখিত। ফ্রান্সেও অনেকে গবর্ণমেণ্টের বিচারে দোষ দিতেছে।

* *
*

ইতর প্রাণীর চিকিৎসা।—কুকুর বিড়ালের অপরিপাক হইলে, উহারা ঘাস খাইয়া বমন করে, তাহাতেই অসুখ সারিয়া যায়। গরু, ভেড়া প্রভৃতি কতকগুলি পশু পীড়িত হইলে এক প্রকার বুনো গাছের পাতা খায়। বাতরোগগ্রস্ত হইলে, পশুগণ সাধ্যানুসারে আপনাদিগকে সূর্য্যোত্তাপে রাখিতে চেষ্টা পায়; আবার বাতিক জ্বরে ইহারা শীতল জল ব্যবহার করিতে কসুর করে না। কোন জন্তুর হাত, পা, কি লেজে আঘাত লাগিয়া পচিয়া যাইতে আরম্ভ হইলে, উহারা দাঁতে করিয়া ঐ স্থানটা কাটিয়া ফেলিয়া দেয়। ইহাতেই তাহাদের অস্ত্র-চিকিৎসার কাজ সমাধা হইয়া যায়। বনমানুষদের গাত্রের কোন স্থানে ক্ষত হইয়া রক্ত পড়িলে, হয় সে স্থানটি হাত দিয়া টিপিয়া ধরে, নয় সে স্থানটি ঘাস বা গাছের পাতা দিয়া ঢাকিয়া দেয়। আহত পিপীলিকাদের চিকিৎসার জন্য যোদ্ধা পিপীলিকাদের মধ্যে সুন্দর বন্দোবস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। একবার এক জন একটা পিপীলিকার শুঁড় কাটিয়া দিয়াছিলেন; আর কতকগুলা পিপীলিকা উহা দেখিতে পাইয়া, মুখ হইতে এক প্রকার স্বচ্ছ তরল পদার্থ বাহির করিয়া ঐ স্থানটায় লাগাইয়া দিতে লাগিল। একটা কুকুরকে একবার সাপে কামড়াইয়াছিল; সে কয়েক দিন ক্রমাগত স্রোতের জলে ডুব দিত, ডুব দিতে দিতেই তাহার অসুখ সারিয়া গেল। আর একটা কুকুরের চোকে একবার খুব আঘাত লাগিয়াছিল; সে টেবিলের নীচে, যেখানে আলো নাই সেখানে, গিয়া চুপটি করিয়া বসিয়া থাকিত, আর থাবায় করিয়া মুখের লালা লইয়া চোকে লাগাইত। পূর্ব্বে সে খুবই আগুনের কাছে থাকিতে ভাল বাসিত, কিন্তু চোকটি আহত হইবার পর সে আলো কি উত্তাপের কাছেও ঘেঁসিত না। ইহাতেই সে ভাল হইয়া গিয়াছিল। এমন অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। জন্তুদের মধ্যেও কেমন সুশৃঙ্খলা দেখ!

কাকাতুয়ার আদর।
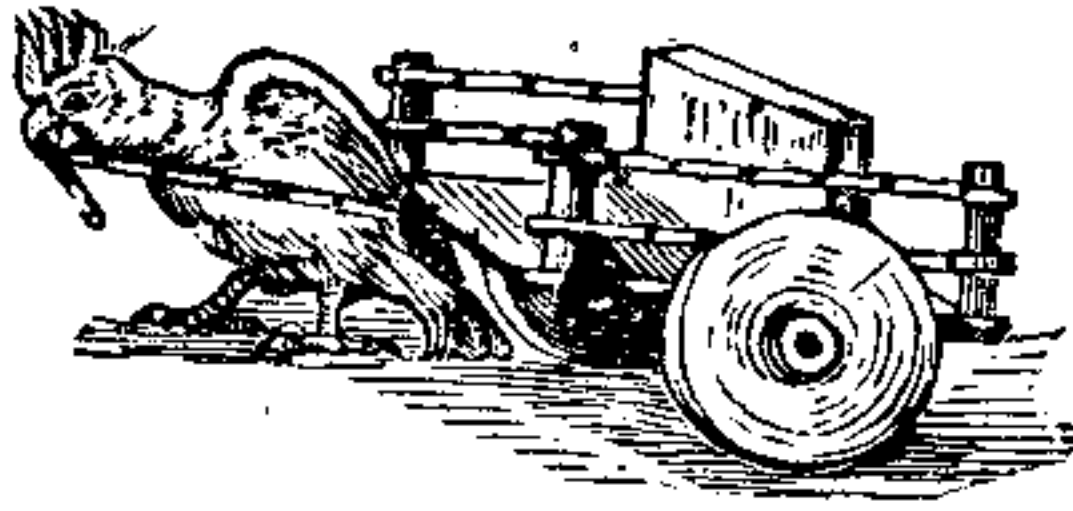
আয় লীলা, আয় চারু, আয় রে অমল,
আমার পাখীর তোরা দেখে যা রে বল!
কাঁধে গাড়ী যোথা, তবু ছোটে যেন ঝড়,
কাকাতুয়া টানে গাড়ী গড়্ গড়্ গড়্!
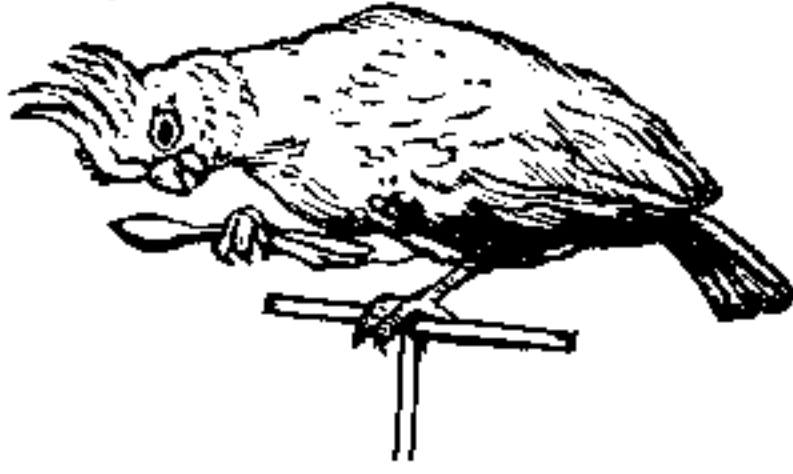
খাওয়া দাওয়া বেশ বুঝে কাকাতুয়া মোর,
থামিল খাবার পেয়ে চেঁচানিটি ওর।
উঁচু হ'য়ে দাঁড়ে ব'সে, নীচু ক'রে মুখ,
চামচে চা খায় পাখি চুক্ চুক্ চুক্!
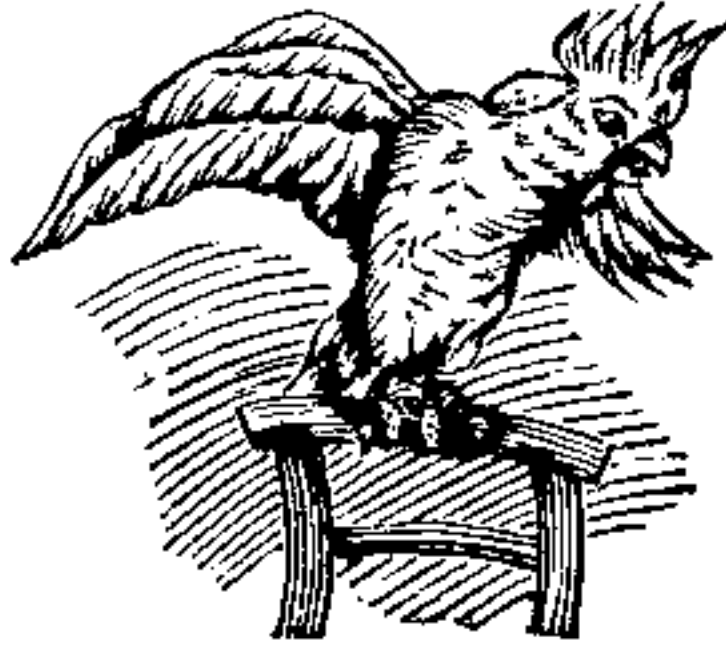
কাকাতুয়া ব'সেছিল এই খেয়ে দেয়ে,
আবার খাবার দেখে গেল খিদে পেয়ে।
যে ক'রে হাঁ ক'রে পাখি আসে ডানা মেলে,
ভয় হয় মাসিমার হাতটা বা গেলে!
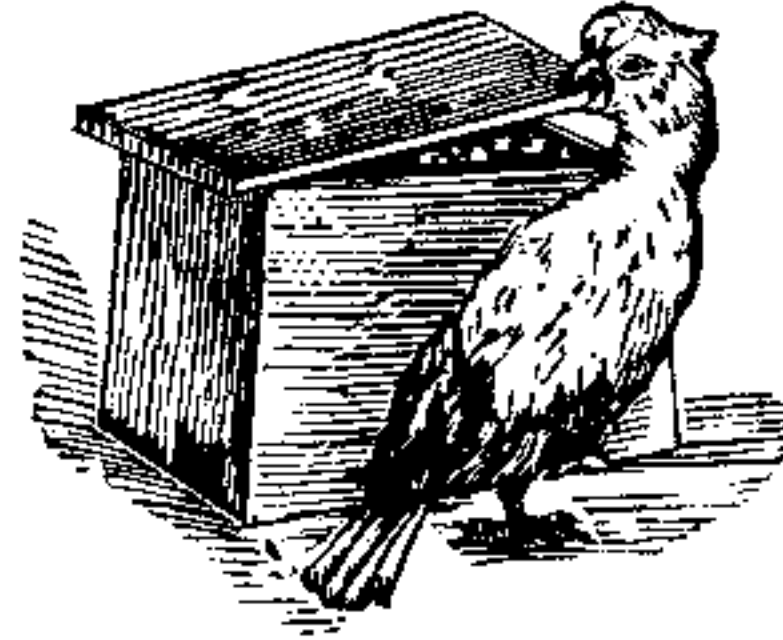
সে দিন খাবার খেয়ে পেয়ে গেছ লোভ,
তুলিছ বাক্সের ডালা মিটাইতে ক্ষোভ।
খাবার জিনিস ওতে নাই আজ, বাবু,
ডালা চাপা প'ড়ে মিছে হবে কেন কাবু?

কাক্কার হ'য়েছে জ্বর দেখ গো আসিয়ে,
শুয়েছে বাছাটি তাই লেপ মুড়ি দিয়ে।
এই বেলা বৈদ্য ডেকে কর প্রতীকার,
বিকার জুটিলে বাছা বাঁচিবে না আর!

এতক্ষণ কোথা ছিলি কাকাতুয়া মোর,
আয় পাখি, চাঁদমুখে চুম খাই তোর।

তোরে না দেখিলে, পাখি, বড় দুখ পাই,
থাকি থাকি, তোর কাছে ছুটে আসি তাই।
পাঠশালে যাই যবে পড়িবার তরে,
তোরে না দেখিয়া মন কেমন যে করে।
তোর কথা ভাবি আমি থাকি যথা তথা,
বড় ভালবাসি তোর পাকা পাকা কথা।
পড়িতে যাব না আমি, আজি রবি বার,
মার ঘরে পাঠশালা করিব তোমার।
শিখাব তোমারে আমি আজি কত বোল,
দাঁড় করাইয়া দিব যদি কর গোল।
সুরেন সেলেট্ ধুয়ে দিবে তোরে এনে,
ক খ গ লিখিবি ঠোঁটে পেন্‌সিল টেনে।
মাতা শিখাবেন আসি নীতিকথা তোরে,
বেজার কোর'না যেন 'কেও?' 'কেও?' ক'রে।
ভাল ছেলে হ'লে সুখ বাড়িবে বিস্তর,
কোলে নিয়ে করিবেন সবাই আদর।
আমি তোরে খেতে দিব দুধ চিনি ছোলা,
শুনাবি হরেক বোল তুই হরবোলা।

ষোড়শ লুইর মৃত্যু।

প্রসিদ্ধ ফরাসি বিপ্লবের কথা বোধ হয় তোমাদের মধ্যে অনেকে শুনিয়া থাকিবে। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের অধিপতি পঞ্চদশ লুইর মৃত্যু হইলে, তাঁহার পৌত্র ষোড়শ লুই নাম ধারণ করিয়া ফ্রান্সের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনি দয়াবান্, ন্যায়প্রিয় ও উদারচেতা রাজা ছিলেন। কিন্তু ইঁহার মনের তেমন দৃঢ়তা ছিল না, ইহাই ইঁহার প্রধান অভাব।

ইঁহারই পূর্ব্বে যাঁহারা ফ্রান্সের রাজাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায়ই অতি অকর্ম্মণ্য বলিয়া লোকসমাজে পরিচিত। বিশেষতঃ পঞ্চদশ লুইর মত ভোগাভিলাষী অকর্ম্মণ্য রাজা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল রাজার শাসন দোষে ফ্রান্সে রাজস্বের অবস্থা অতিশয় মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। পুনঃপুনঃ কর-সংস্থাপনাদি দ্বারা প্রজাগণ একান্ত প্রপীড়িত ও উত্ত্যক্ত হইয়া উঠে। রাজস্ব সম্বন্ধীয় অবস্থা উন্নত করিবার জন্য নূতন রাজা এক জন উত্তম অর্থনীতিবিদ্ ব্যক্তিকে এই কার্য্যে নিয়োগ করেন। কিন্তু রাজস্বের অবস্থা তখন এতই মন্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, তিনি উহার কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

এই সময় আমেরিকায় রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া যুক্তরাজ্যে (United States) সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালীর সৃষ্টি হয়। ফ্রান্সের উৎপীড়িত প্রজাপুঞ্জও এই অভিনব শাসনপ্রণালীর প্রতি আগ্রহের সহিত দৃষ্টিপাত করিতেছিল। এইরূপ সাধারণতন্ত্র রাজত্ব-প্রণালীর সুখ সৌভাগ্যের বিষয় তাহারা যতই চিন্তা করিতে লাগিল, আপনাদিগকে উত্তরোত্তর ততই অসুখী বলিয়া অনুভব করিতে লাগিল। ফরাসিদিগের প্রকৃতি অতি উচ্ছৃঙ্খল, ইহারা সহজেই অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠে। যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, সেই সময়েও এই রূপে ইহারা সাধারণতন্ত্রের সুখ সৌভাগ্যের কল্পনায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়ে। দেশের রাজা, রাজকর্ম্মচারী, পুরোহিত, ভদ্রলোক ও অন্যান্য ব্যক্তি মাত্রেই এই উত্তেজিত প্রজাপুঞ্জের ভীষণ অত্যাচারে বিত্রস্ত হইয়া উঠে। দিবারাত্র অবিশ্রান্ত

নরহত্যা চলিতে লাগিল। এত লোকের শিরশ্ছেদন দণ্ড হইতে লাগিল যে, হস্তে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে বিলম্ব হয় দেখিয়া গিলোটিন নামে একটা শির-শ্ছেদক যন্ত্রেরই সৃষ্টি হইল। রক্তে দেশ প্লাবিত হইয়া গেল। শত শত রমণীর ছিন্ন মুণ্ড,—শত শত যাজক, রাজ-কর্ম্মচারী ও সম্ভ্রান্ত লোকের মৃতদেহ ফ্রান্সের ঘর দ্বার পথ ঘাট সমস্ত ছাইয়া ফেলিল। শেষে, বিদ্রোহিদল ১৭৯২ খ্রিষ্টীয় অব্দের শেষ-ভাগে কারাগার ভগ্ন ও রাজগৃহ লুণ্ঠন করিয়া রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের সহিত লুইকে বন্দীকৃত করিয়া পারিস্ নগরে লইয়া গেল। এই স্থানে তাহাদের জাতীয় সমিতির সভ্যগণের দ্বারা রাজার বিচার আরম্ভ হইল। ১৭৯৩ সালের ১৭ই জানুয়ারি তাঁহার বিচার শেষ হইলে, তিনি প্রজাবর্গের হিতের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী বলিয়া প্রমাণিত হন এবং তাঁহার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়।

লুই ইতিপূর্ব্বে স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য মেল্-শারবেস্ নামক একটি প্রবীণ লোকের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইবার পর তিনি কারাগারে নীত হইলে, এই মেল্শার্-বেস্ আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। মেল্শারবেস্ আসিয়া দেখিলেন, লুই হস্তে মস্তক রক্ষা করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়া-ছেন। লুই মেল্শারবেসকে নিজের অদৃষ্টের পরি-ণামের বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই, এমন কি তাঁহার দিকে না চাহিয়াই নিজে বলিতে-ছিলেন,—"দুই ঘণ্টা ধরিয়া ভাবিলাম, কিন্তু কই, আমি যে আমার রাজত্বকালের মধ্যে কোন দিন ইচ্ছাপূর্ব্বক আমার প্রজাবর্গের অসন্তোষের কারণ উৎপাদন করিয়াছি, ইহা ত কিছুতেই মনে করিতে পারিতেছি না। পরমেশ্বরের সিংহাসন-সম্মুখে উপনীত হইবার আমার আর অধিক বিলম্ব নাই; এখনও আমি সরলভাবে প্রকাশ করিতে পারি, আমি কোনরূপে আমার প্রজাপুঞ্জের তিরস্কার লাভের যোগ্য নহি; তাহাদের সুখস্বচ্ছন্দ ভিন্ন কখনও অন্য প্রকার বাসনা করি নাই।" এই বলিয়া মেল্শারবেসের দিকে চাহিয়া পুনরায় বলিলেন,—"বন্ধু, তোমার পূর্ব্বেই, আমি সাধুগণের নিবাস-স্থানে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়াছি। ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবে না—পরে পুনর্ম্মিলিত হইব। এখন কেবল আমি আমার স্ত্রীপুত্রাদির বিষয় চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন হই-তেছি। আমি আমার পুত্রকন্যাদিগকে কিরূপ অবস্থায় ফেলিয়া যাইতেছি, তাহা ভাবিয়া আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে। আমি তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি মনে এমন বল নাই; কেবল ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার দ্বারাই তাহাদের সহিত শেষ সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিব বলিয়া ভরসা করিতেছি।"

মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা রহিত হওয়াও অসম্ভব নয় বলিয়া, বৃদ্ধ মেল্শারবেস্ তাঁহাকে সাহস দিবার চেষ্টা করি-লেন। কিন্তু লুই মস্তক সঞ্চালন করিয়া বুঝাইলেন যে, তাহা হইবার নহে। অবশেষে আপনার শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহাকে পরিত্যাগ না করিয়া যাইবার জন্য তিনি বন্ধুকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষিত হইতে পারিল না। তখন তিনি, হিউম্ সাহেবের ইতিহাসের যে খণ্ডে প্রথম চার্লসের মৃত্যুবিবরণ লিখিত আছে, উহা আনিয়া দিবার জন্য স্বীয় পরিচারকের নিকট অভি-লাষ প্রকাশ করিলেন। পরিচারক উহা আনিয়া দিলে, তিনি যে কয় দিন জীবিত ছিলেন, সে কয় দিনই উহা অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন।

অবশেষে ২০শে জানুয়ারি প্রভাতে সেনেটিয়র তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। সেনেটিয়র বিদ্রোহী

দলের নেতা রূপে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি রাজার নিকট তাঁহার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা পড়িয়া শুনাইলেন। লুই স্থিরচিত্তে উহা শুনিলেন। তৎকালে তাঁহার মুখমণ্ডলে উদ্বেগের অধীরতা বা বিষাদের কালিমা বিন্দুমাত্রও পরিলক্ষিত হইল না। তিনি কেবল পরলোকগমনের জন্য প্রস্তুত হইতে, পরিবারবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতে, এবং ধর্ম্মযাজকের মুখে পবিত্র ধর্ম্মকথা শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইতে তিন দিন মাত্র সময় প্রার্থনা করিলেন। তিনি পরিবারবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও ধর্ম্মযাজকের নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এইজন্য যে তিন দিন সময় প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেনেটিয়র তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করেন নাই। পরদিন প্রাতঃকালে বেলা ১০টার সময়ই তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

লুই অন্যান্য দিন যেরূপ ভাবে মধ্যাহ্নভোজন করিতেন, এই দিনও সেইরূপ স্বচ্ছন্দে ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। আহারের সময় ছুরি, কাঁটা প্রভৃতির ব্যবহার ইহাঁদের রীতি। পাছে তিনি আত্মহত্যা করিয়া বসেন, এই আশঙ্কায় এই দিন কিন্তু তাঁহার প্রহরী সৈনিকগণ ছুরি কাঁটাগুলি সরাইয়া রাখিয়াছিল। তাহা দেখিয়া লুই বলিয়াছিলেন,—"লোকে কি আমাকে এতই নীচ মনে করে যে আমার দ্বারা আত্মহত্যা সম্ভব? আমি নিষ্পাপ এবং নির্দ্দোষ,—নির্ভয়ে প্রাণত্যাগ করিতে পারি।"

তাঁহার পরিবারগণের সহিত শেষ সাক্ষাৎকার অতি হৃদয়বিদারক দৃশ্য। রাত্রি সাড়ে আটটার সময় তাঁহার প্রকোষ্ঠের দ্বার উন্মুক্ত হইল, এবং রাণী নিজে, জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী ও রাজকুমারী এলিজাবেথের হাত ধরিয়া লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই বেগে রাজার নিকট ধাবিত হইলেন, রাজা সকলকেই আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কেবল ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ ভিন্ন কাহারও মুখে কোনও কথা নাই,—সকলই নীরব ও নিস্তব্ধ। কিয়ৎক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত হইলে, রাণীকে আপনার বামভাগে, রাজকুমারী এলিজাবেথকে দক্ষিণভাগে, জ্যেষ্ঠা রাজকুমারীকে সম্মুখে এবং শিশু যুবরাজকে উভয় জানুমধ্যে লইয়া রাজা উপবিষ্ট হইলেন। সে সময়ে তাঁহাদের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য।

এই দারুণ দৃশ্য প্রায় দুই ঘণ্টা স্থায়ী হইয়াছিল। রাজার কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহারা যেরূপে অশ্রুবিসর্জ্জন ও বিলাপ করিয়া উঠিতে লাগিলেন, তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল যে, রাজা স্বয়ংই আপনার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার বিষয় তাঁহাদের নিকট ব্যক্ত করিতেছিলেন।

ইহার পর রাত্রি দশটা পনর মিনিটের সময় রাজা গাত্রোত্থান করিলেন। রাজা এবং রাণী উভয়েই শিশু যুবরাজকে তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন। রাজকুমারী তখনও বাহু দ্বারা রাজার কটিদেশ আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। রাজা দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেই, তাঁহারা সকলেই হৃদয়বিদারক চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

রাজার এই সময়কার শোকের বিষয় বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। তিনি তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিবার জন্য কাতরস্বরে বলিলেন,—"আমি নিশ্চয় বলিতেছি কাল্ আবার প্রাতে আটটার সময় তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব।" রাজার এই কথা শুনিয়া তাঁহারা সকলেই একত্রে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"সাতটার সময় নয় কেন?"

রাজা বলিলেন, ভাল, তবে সাতটার সময়ই।—বিদায়—এক্ষণে বিদায়!" রাজা এতই কাতরস্বরে এই কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন যে, তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহাদের বিলাপধ্বনি পুনরায় দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল, এবং জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী এই কথায় সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহার পাদমূলে নিপতিত হইলেন। অবশেষে এই নিদারুণ ক্লেশকর দৃশ্যের শীঘ্রই পরিসমাপ্তি আবশ্যক বোধ করিয়া লুই তাঁহাদের সকলকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া, তাঁহাদের বাহুপাশ হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বস্থানে চলিয়া আসিলেন।

রাত্রি ১২টার সময় শয্যাগত হইয়া লুই প্রত্যূষে ৫টা পর্য্যন্ত ঘুমাইলেন। তাহার পর নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাঁহার পার্শ্বস্থ একটি লোকের হস্তে, একটি আঙ্‌টি, একটি সিলমোহর আর এক গাছি চুল দিয়া বলিলেন,—"তুমি আমার এই অঙ্গুরীয়টি রাণীকে দিও এবং বলিও কিরূপ শোকের সহিত আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। আর সিলমোহরটি শিশু যুবরাজকে দিও,—বলিও, আমি মৃত্যুকালে তাঁহাদের সকলকে শেষ আলিঙ্গন করিতে না পাইয়া কতই যাতনা অনুভব করিতেছি। কিন্তু আমি এরূপ নিদারুণ বিচ্ছেদ-ক্লেশ তাঁহাদিগকে দিতে ইচ্ছা করি না।"

প্রাণদণ্ডের পূর্ব্বে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেয়, এজন্য তিনি ঘাতকগণের দ্বারা তদ্রূপ নিগ্রহসূচক কেশকর্ত্তনের হস্ত হইতে মুক্তি লাভের আশায় স্বহস্তে কেশ কর্ত্তন করিবার জন্য তাঁহার পার্শ্বস্থ প্রহরী সৈন্যগণের নিকট এক খানা কাঁচি চাহিলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিল না।

বেলা ৯টার সময় সেনেটিয়র কারাগারে রাজা যে প্রকোষ্ঠে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন,—"আপনি আমাকে যথার্থ লইয়া যাইতে আসিয়াছেন—আমাকে এক মিনিট সময় দিন।" এই বলিয়া তাঁহার গোপনীয় ক্ষুদ্র অপর একটি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শেষ উইলখানি হস্তে করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। সেনেটিয়রকে বলিলেন,—"এই পুলিন্দাটি আমায় পত্নী রাণীকে দিবার জন্য আপনার নিকট প্রার্থনা করি।" সেনেটীয়র উত্তর করিলেন,—"ইহা আমার কাজ নয়, আমি আপনাকে বধমঞ্চে লইয়া যাইবার জন্যই কেবল এখানে আসিয়াছি।" এই বলিয়া তাঁহাকে বধমঞ্চে লইয়া চলিলেন।

লুই সেই টেম্পল্ নামক দুর্গের চত্বর দিয়া গমন করিবার সময়, যে প্রাসাদে তাঁহার ইহজগতে যে কিছু প্রিয় পদার্থ সে সমুদয়ই ছিল, সেই প্রাসাদের প্রতি একবার শেষ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। এবং পুনরায় ক্ষণমাত্রে হৃদয়ে সাহস সঞ্চার করিয়া শকটে ধর্ম্মযাজকের পার্শ্বে প্রশান্তভাবে স্বীয় আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সম্মুখভাগে আরও দুই জন সৈনিক পুরুষ উপবিষ্ট ছিল। বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইতে পথে দুই ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইল। এই সুদীর্ঘকাল তিনি একবারও পার্শ্বোপবিষ্ট ধর্ম্মযাজকের প্রদর্শিত ঈশ্বরস্তোত্র আবৃত্তি করিতে নিরস্ত হন নাই। সমস্ত সময় তিনি এরূপ নিরুদ্বিগ্ন ও প্রশান্ত ভাবে স্তোত্র সকল আবৃত্তি বরিতেছিলেন যে, তাঁহার স্থিরতা দেখিয়া সমীপস্থ সৈনিকগণও বিস্ময়ান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল।

রাজপথ লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সকলেই ত্রস্তচিত্তে নীরবে এই শোচনীয় ব্যাপার দর্শন করিতেছিল। শান্তিরক্ষার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য শকটের চারি পার্শ্ব ঘেরিয়া চলিয়াছিল। এই রাজবিদ্রোহিদলের জাতীয় প্রহরিগণ সশস্ত্র হইয়া চারি

দিক রক্ষা করিতে করিতে চলিয়াছিল। সম্মুখে ভয়ঙ্কর কামান সকল বর্ত্তমান থাকিতেও, কেহ যে রাজাকে উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত করিতে পারিবে, তাহার সম্ভাবনা মাত্রও ছিল না।

এই রূপে রক্ষিত হইয়া রাজা বধ্যভূমিতে উপনীত হইলে তিনি ঘাতকগণের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ংই শকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া আপনিই পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু ঘাতকগণ যখন তাঁহার হস্তদ্বয় বন্ধন করিতে উদ্যত হইল, তখন তিনি তাহাদের প্রতি ক্ষণকালের জন্য বিরক্তি ও ক্রোধ পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এই সময় ধর্ম্মযাজক মেঃ এজ্‌ওয়ার্থ্‌ যেন ঈশ্বরাদেশের সহিত অনুপ্রাণিত হইয়া উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"ত্রাণকর্ত্তা নিজে যেরূপ স্বচ্ছন্দে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, আপনিও সেই রূপ স্বচ্ছন্দে এ সমুদয় সহ্য করুন, অচিরেই তিনি আপনাকে আপনার যন্ত্রণার পুরস্কার প্রদান করিবেন।" ইহা শুনিয়া লুই দ্বিরুক্তিমাত্র না করিয়া সহজেই বধমঞ্চের পাদদেশে গমন করিলেন।

তিনি বধমঞ্চে আরোহিত হইবামাত্র দৃঢ় পদবিক্ষেপে মঞ্চের সম্মুখভাগে অগ্রসর হইয়া ঢক্কা-বাদকদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করিলে, তাহারা স্ব স্ব কার্য্য ভুলিয়া যেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"আমার উপর যে সকল দোষারোপ করা হইয়াছে, আমি তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও নিষ্পাপ থাকিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিতেছি। যাহারা আমার মৃত্যুর কারণ, তাহাদিগকে মার্জ্জনা করিতেছি; ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আমার স্বদেশবাসীদিগকে যেন আমার মৃত্যুজনিত পাপের ফলভোগ করিতে না হয়। আর, তোমরা হতভাগ্য লোকগণ—"এই পর্য্যন্ত বলিলেই, সেনেটীয়র ঢক্কাবাদনের আদেশ প্রদান করিলেন। ঢক্কাবাদকগণ বাজাইয়া উঠিল, আর কিছুই শুনা গেল না। ঘাতকগণ বলপূর্ব্বক রাজাকে ধরিল এবং গিলোটিন্‌ যন্ত্র দ্বারা মুহূর্ত্তমধ্যে রাজার মুণ্ড খণ্ডিত হইয়া গেল।

চারি ভাই।

শ্যাম, শীতল, শরৎ, শশী—চারি ভাই। শ্যাম বড়, শীতল মেজ, শরৎ সেজ, শশী ছোট। শ্যাম না কি সকলের বড়, কাগজ কলম কাটিতে না কি তাহার ছুরির দরকার হয়, এজন্য তাহার পিতা তাহাকে একখানি ছুরি কিনিয়া দিলেন। শ্যাম ছুরি পাইয়া বড়ই খুসি হইল; সে কলম কাটিতে বসিয়া প্রথম দিনেই ত চারি পাঁচটা কুইল আগা গোড়া কাটিয়া নষ্ট করিল। শীতল, শরৎ, শশী—তিন ভাই-ই সে দিন দাদার চক্‌চকে ছুরিখানি দেখিয়া উহার বড়ই প্রশংসা করিতে লাগিল। দাদা ছুরিখানি লইয়া কখন কি কাটিতেছেন, তাহারা তাহাই দেখিতে লাগিল।

কয়েক দিনের পর ছুরিখানির উপর শ্যামের আর ততটা যত্ন বা ঝোঁক রহিল না, তখন ছোট ছোট গাছটি পালাটির সঙ্গেও ছুরির আলাপ চলিতে লাগিল। এই সময় এক দিন শীতল তাহার দাদার কাছে একবার ছুরিখানি চাহিল। বলিল,—"দাদা, আমি একটা কলম আনিয়াছি,

কাটিয়া লইব, তোমার ছুরিখানি একবার দিবে?" দাদা বলিলেন,—"না, আমার ছুরি খারাপ হইয়া যাইবে।"

আর একদিন শরৎ বলিল,—"দাদা, আমার ঘুড়ীর লেজটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, কাগজের একটা লেজ করিয়া লইব, তোমার ছুরিখানা একবার দিবে?" দাদার উত্তর সেই একই রকম,—"না, লেজ কাটিতে হইবে না, আমার ছুরি খারাপ হইয়া যাইবে।"

শশী একদিন আসিল,—"দাদা, আমার জামার একটা বোতাম পরাইয়া লইব। মা বলিলেন,—'একটা ছুরি চাই।' তোমার ছুরিখানা একবার আমাকে দিবে?" দাদা বলিলেন,—"আঃ! ভারি ত জামা, তা আবার ছুরি চাই! না, না,—ছুরি হবে না—যা, বঁটিতে কেটে নিতে বল্ গিয়ে।" শশী ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া গেল।

আর কেহ তাহার দাদার কাছে ছুরি চাহিতে আসিত না। তাহাদের ছুরির অভাবও শীঘ্র ঘুচিয়া গেল। এক দিন তাহাদের পিতা তিন খানি ছুরি আনিয়া তিন জনকে ডাকিয়া তিন খানি দিলেন। ছুরি পাইয়া তাহারা বড়ই আনন্দিত হইল।

ইহারই দিন কয়েক পরে শ্যামের ছুরিখানি হারাইয়া গেল। একদিন বিকালে শ্যাম পায়রার একটা খোপ তৈয়ার করিবার জন্য ডেস্কের মধ্যে ছুরি খুঁজিতে গিয়া দেখেন, তাঁহার ছুরি নাই। ডেস্কের চাবিকাটি তাঁহার নিজেরই কাছে থাকিত, কাজেই আপনিই কোথাও ছুরিখানি ফেলিয়াছেন বুঝিয়া হাঁ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। মনে পড়িল, দুইদিন আগে সকালে পুকুরের পাড়ে ছুরি রাখিয়া মুখ ধুইতে ঘাটে নামিয়াছিলেন, ফিরিবার সময় ছুরিখানি আনিতে মনে নাই। আর অন্বেষণ করা বৃথা, ইহা ঠিক হইল। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, ছুরি না হইলে ত চলিতেছে না। ছুরি না হইলে পায়রার খোপ এখন কিরূপে তৈয়ার হয়? একবার ভাবিলেন,—"শীতলের ছুরিটা একবার চাহিয়া আনি।" আবার ভাবিলেন, "শীতলকে চাহিব কি? চাহিলে শীতল দিবে কি? আমাকে সে একদিন ছুরি চাহিয়াছিল, আমি দি নাই। সে ত এই সে দিনকার কথা মাত্র, সে ইহারই মধ্যে কি তাহা ভুলিয়া গিয়াছে? তবে, না হয়, শরতের কাছেই দেখিব? তাহাই বা কিরূপে হয়—সে পথই বা রাখিয়াছি কই? শরৎ, শশী—সবারই মনে যে কষ্ট দিয়াছি! তাই ত, কি করি? তিন—তিনখানা ছুরি থাকিতে আমার পায়রার খোপটি তৈয়ার হইবে না? যাই,—একবার শীতলের কাছেই যাই; একবার চাহিয়াই দেখি না। না দেয়, না দিল, তাহাতেই ক্ষতি কি?"—এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে শীতলের কাছেই গেল।

শীতলকে গিয়া বলিল,—"শীতল, আমার ছুরিখানা হারাইয়া গিয়াছে। পায়রার একটা খোপ তৈয়ার করিব, তোমার ছুরিখানা একবার আমাকে দিবে?" শ্যামের ছুরি হারাইয়া গিয়াছে শুনিয়া শীতল বড়ই খুসি হইল। শীতল ভঙ্গী করিয়া বলিল,—"এত সুখ! তুমি বড় আমাকে তোমার ছুরি দিয়াছিলে? আজ চাহিতে লজ্জা করে না?" শ্যাম তাহার কথা শুনিয়া, বিরক্ত হইয়া শরতের কাছে গেল।

শরতের কাছে গিয়া বলিল,—"ভাই শরৎ! পায়রার খোপ তৈয়ার করিব, তোমার ছুরিখানা একবার দিবে?" শরৎ বলিল,—"কেন, তোমার ছুরি কি হইল?" শ্যাম বলিল,—"হারাইয়া গিয়াছে।" শরৎ বলিল,—"মনে আছে, তুমি

আমাকে সেদিন ছুরি দাও নাই? তা হউক, আমি তোমার মতন খল নই,—ছুরি এনে দিচ্চি।" শ্যাম তাহার কথায় মনে আঘাত পাইল। "তোমার ছুরি আমি চাই না" বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

শ্যাম, ছুরির জন্য শশীর কাছে যাইবে বলিয়া ভাবিতেছিল। শশী কিন্তু জানালার মধ্য দিয়াই দাদাকে ছুরি পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে ও তাহাতে হতাশ হইতে দেখিয়াছিল। দেখিয়া, দাদা না আসিতে আসিতেই, নিজে ছুরিখানি লইয়া দাদাকে দিতে দৌড়িয়া আসিল। "এই যে আমার ছুরি আছে, তুমি নাও-না দাদা! এই একখানা ছুরিতেই দু'জনের চল্‌বে এখন।" বলিয়া দাদার হাতে ছুরি দিল।

ছোট ভাইটির এইরূপ সরলতা দেখিয়া দাদার প্রাণ গলিয়া গেল। দাদা বলিলেন,—"শশী! তোমাকে আমি সে দিন ছুরি দি নাই, আমার দোষ হইয়াছে, আমি সেজন্য দুঃখিত হইয়াছি, তুমি সে কথা আর মনে করিও না ভাই!" শশী কেবল বলিল,—"আমরা ত চারি ভাই, আমাদের এক জনের জিনিসই কি চারি জনের জিনিস নয়? আমাদের এক জনের সুখে কি চারি জনের সুখ, এক জনের দুঃখে কি চারি জনের দুঃখ নয়?" শশীর ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট হইল।

তাহাদের পিতা বাটী আসিলে, তাঁহার কর্ণে যখন এই সকল কথা উঠিল, তখন তিনি বলিলেন,—"শ্যামের কার্য্য অতি গর্হিত হইয়াছিল, কিন্তু সে তজ্জন্য অনুতাপ করিয়াছে। শীতলের কার্য্যও গর্হিত হইয়াছে; শরৎও নির্দ্দোষ নহে। কিন্তু শশী বড়ই মহত্বের পরিচয় দিয়াছে—শশীই শ্রেষ্ঠ। আমি ভরসা করি, শশীর সহোদরগণ শশীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া চলিবেন।"

রাগী ছেলে।

গোপাল বড় রাগী ছেলে। তাহার কথায় কথায় রাগ। রাগের জন্য কত জিনিষ ভাঙ্গিয়াচুরিয়া নষ্ট করিত ও কত শাস্তি পাইত, কিন্তু রাগ নিবারণ করিতে পারিত না। বড় ক্ষুধা হইয়াছে, বামন ঠাকুর ভাত আনিতে পাঁচ মিনিট কি সাত মিনিট দেরী করিয়াছে, আর গোপালের সহ্য হইল না। অমনি রাগ হইল—"আজ আমি ভাত খাইব না।" ভাই ভগিনী, মা সবাই কত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিছুতেই মন নরম হইল না। "কখনই খাইব না" বলিয়া বাবু বই লইয়া পড়িতে গেলেন। পিতাকে ভয় করে, কিন্তু তিনি তখন বাড়ী ছিলেন না। ক্রমে এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল, দুই ঘণ্টাও অতীত হইল। ভাত শুকাইয়া চাউল হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ কাঁদিতেছে। ভাই বোনগুলি খাইয়া সুখী হইল না। মাতা খাইতে বসিলেনও না। গোপাল অনাহারে রহিল, মা কি করিয়া খান?

পাঠক কি মনে করিতেছ গোপল পড়িতেছে?—হায়! হায়! পড়িবে কি? ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে, মাথা ব্যথা করিতেছে, হাত পা ঝিম্ ঝিম্ করিতে আরম্ভ করিয়াছে; দশ বছরের ছেলে, দুই প্রহর অতীত হইয়া যায়, কত আর সহ্য করিতে পারে? সে আর পড়িবে কি? কেবল বইএর দিকে চক্ষু দিয়া ভাবিতেছে। কি ভাবনা এখন গোপালের মনে? পাঠক কি বুঝিতে পারিতেছ? সে মনে করিতেছে:—

"আমি কি নির্ব্বোধ? ভাতের উপর কেন রাগ করিলাম। দশ মিনিট দেরী হইয়াছিল বৈ ত নয়। এখন যে কত দশ মিনিট হইয়া গেল। যদি রাগ না করিতাম ত এতক্ষণ ভাত হজম হইয়া যাইত।" আবার ভাবিতেছে—"বাবা আসিয়া শুনিলে কত দুঃখ করিবেন, বকিবেন, হয় ত প্রহারও খাইতে হইবে।—আর যদি এই অনাহারে থাকার জন্য কোন অসুখ হয়, তাহা হইলে কি অন্যায় হইবে! আহা! দশ মিনিটের বিলম্বে কি এত ক্ষতি হইত? কিন্তু কি জানি কেন, হঠাৎ রাগ হইয়া উঠে। সেই সময়ে যদি ভাবিতাম যে রাগ করিলে এত দেরী হইবে, এত কষ্ট হইবে ও গোলযোগ হইবে, তাহা হইলে হয় ত রাগ হইত না।"

একবার মনে হইল "দূর হোক্! খাই-না কেন গিয়ে?" আবার ভাবিল, "তাই বা কিরূপে যাই! কিশোরী, ললিত ও বামা সবাই যে হাসিবে, ও ঠাট্টা করিবে। মা যে বলিবেন—'এমন রাগ কেন করেছিলে বাপু?' ঠাকুর বল্‌বে যে, 'গোপাল বাবুর ক্ষুধার চোটে রাগ পালাইয়া গেল।' এ সব প্রাণ থাকিতে সহ্য করিতে পারিব না। ছি! যা হবার তা হইয়াছে। ইহার উপর আবার এ অপমান ত কখনই সহ্য হইবে না।"

কিছুক্ষণ পড়াতে মনোযোগ দিবার চেষ্টা করিল। মনের আবেগে পাঁচ মিনিট মন লাগিল। কিন্তু এ বৃথা বল কতক্ষণ থাকে? আবার মাথা ব্যথা করিতে লাগিল, আবার মনে পড়িল যে মা নিশ্চয়ই উপবাস করিয়া আছেন, আবার বাবার ভয় মনে হইল, নিজের অন্যায় স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি পড়িল, আবার গোপাল অন্যমনস্ক হইয়া আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

"ছি! রাগ করা বড় অন্যায়; আর এ রূপ করা হইবে না; পরে বড় বিভ্রাটে পড়িতে হয়। আচ্ছা, এই সময়ে একবার ডাকিতে আইসে, ত বেশ হয়। এই সময়ে কোনও রূপে মানে মানে যদি যাইয়া খাইতে পারি, ত সব দিক্ বজায় থাকে।"

গোপাল আপনার শ্রেণীতে ভাল ছেলেদের মধ্যে একজন। শিক্ষক মহাশয় তাহাকে খুব ভাল বাসিতেন। সকল দিনই সে উত্তম পাঠ প্রস্তুত করিত ও সুন্দররূপে বলিতে পারিত। সে দিন তাহার শুষ্ক মুখ ও অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়া শিক্ষকের মনে ক্রমে সন্দেহ উপস্থিত হইল। অবশেষে তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। এবার গোপাল বড়ই বিপদে পড়িল। শ্রেণীর সকল বালকের সম্মুখে আপনার এ লজ্জার কথা প্রকাশ হইবে, সকলে উপহাস করিবে, গোপালের ইহা সহিবে না। আবার অপর দিকে মিথ্যা কথাও কহিতে পারে না, তাহার সে কু-অভ্যাস নাই। অনেকক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া চুপ করিয়া রহিল। শিক্ষক মহাশয় আরও একবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে? কেন অমন করিয়া রহিয়াছ?"—গোপাল কেবল মাত্র মাথা হেঁট করিয়া বলিল—"আজ্ঞা কিছু হয় নি।"—শেষে শিক্ষক তাহাকে কাছে ডাকিয়া স্নেহের সহিত আদর করিলেন ও মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "কেন গোপাল! তোমার ত অসুখ হয় নি? কপাল গরম কেন?"

তখন সুযোগ পাইয়া সে বলিল,—"হাঁ আজ বড় মাথা ব্যথা করিতেছে; আপনি অনুমতি দেন ত বাড়ী যাই।" শিক্ষকের আদেশ পাইয়া সেদিন ছুটি লইয়া বেলা প্রায় ২টার সময়ে গোপাল বাড়ী গেল। বাড়ী গিয়া দেখে যে সকলে মহাকষ্টে আছে। মার খাওয়া হয় নাই, বামন ঠাকুরও খায় নাই। ছোট ছোট ভাই বোনগুলি খেলিতে যায় নাই। তাহার মনে খুব বাজিল। নিজের ঘরে গিয়া চেয়ারে বসিয়া টেবিলে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরে মনে মনে স্থির করিল যে :—"আমি ত রাগ করিয়াছি এই এক অন্যায় কাজ। তার জন্য মা, ভাই, ভগিনী, ব্রাহ্মণ সবাই কষ্টে রহিয়াছে ; বাবা জানিয়া দুঃখিত ও বিরক্ত হইবেন, সবই মন্দ। তার উপরে আবার এই যে বৃথা অহঙ্কার করিতেছি, মিছা অভিমান করিয়া চুপ করিয়া রহিয়াছি, এখন ক্ষুধায় কাতর হইয়াও খাইতেছি না, লোকে কে কি বলিবে সেই ভাবনায়, রাগ পড়িলেও ও রাগ অন্যায় কর্ম্ম বুঝিলেও তবু রাগের ভাণ করিয়া রহিয়াছি—এ যে আরও অন্যায় কর্ম্ম, এ যে মিথ্যা ব্যবহার হইতেছে। আর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলে, মা শুনিলেই এখনই আবার ডাকিতে আসিবেন। কিন্তু তাহা অপেক্ষা, কেহ ডাকিবার পূর্ব্বেই খাইতে যাওয়া উচিত।"

ইহা স্থির করিয়া গোপাল তৎক্ষণাৎ একটা কাগজে এই কয়েকটি কথা লিখিয়া মার নিকট পাঠাইয়া দিল :—"মা, আমি রাগ করিয়া বড় অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছি, তোমাদের কষ্ট দিয়াছি, এখন আমি খাইব। আর আশীর্ব্বাদ করিও যেন এমন দুর্ম্মতি আর না হয়।"

গোপালের মাতা এই পত্র পাইবামাত্র পরম আনন্দিত হইয়া সেখানে আসিলেন ও গোপালকে কোলে লইয়া তাহার চক্ষের জল মুছিয়া দিলেন ও মুখচুম্বন করিতে করিতে আপনার ঘরে লইয়া গিয়া আহার করাইলেন।

তাহার পর অবধি গোপাল এমন শান্ত ও ধীর হইয়াছে যে, দেখিলে আনন্দ হয়। সেদিনকার কষ্ট তাহার চিরদিন মনে ছিল। যখনই রাগ হইত, তৎক্ষণাৎ সেদিনকার ঘটনা স্মরণ করিয়া আপনাকে দমন করিত ও রাগ থামাইয়া ফেলিত।

—*—

সত্যশরণের গল্প।

কোন একটি ক্ষুদ্র গ্রামে ধনেশ্বর নামে একটি কৃষক বাস করিত। তাহার স্বভাব বড় ভাল ছিল না। সে এমনই চোর ছিল যে, কাহারও জমিতে ভাল ফসল হইয়াছে দেখিলেই তাহার যতগুলা গাছ পারিত রাত্রিযোগে আনিয়া আপনার জমিতে রোপণ করিত। এই কাজে আবার তাহার এমনই বাহাদুরি ছিল যে, তাহা বলিবার নয়। সে রাত্রির মধ্যেই গাছগুলি নিজের জমিতে এমনই পরিপাটি করিয়া রোপণ করিত যে, সকলে তাহা নূতন বসান বলিয়া বুঝিতেও পারিত না। কিন্তু এমন করিয়া ক দিন চলে? যাহাদের গাছ হারাইত, তাহারা ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে ধনেশ্বরের ক্ষেত্রে আপন আপন জমির গাছগুলি দেখিতে পাইত। তেমন গাছ হয় ত সেই গ্রামটুকুতে সে বৎসর আর কাহারও জমিতে জন্মে নাই, কিম্বা ধনেশ্বরের ক্ষেত্রে হয় ত দুই এক দিন পূর্ব্বেও কেহ তেমন ভাল ভাল গাছ দেখে নাই। কাজেই তাহারা অনেক সময় সাহসের সহিত ধনেশ্বরের নিকটে আসিয়া তাহাকে ইহা জানাইত। তাহাদের ফসল তাহার জমিতে কিরূপে আসিল এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেই সে উত্তর করিত, কি আশ্চর্য্য! তোমরা কি বলিতেছ কিছুই যে, বুঝিতে পারিতেছি না। যদি এ কথা যথার্থ হয়, তাহা হইলে ইহা কোনও উপদেবতার লীলা ভিন্ন ত আর কিছুই বলিয়া বোধ হয় না। আমি ত কাল সন্ধ্যার পরই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, ইহার

কিছুই জানি না।" গাছগুলি ফিরিয়া পাইবার আশায়, ইহার পরও যদি কেহ কথা কহিত, তাহা হইলে, সে তাহাকে একবারেই হাসিয়া উড়াইয়া দিত। বাস্তবিকও সে এমনই কৌশলে গাছগুলি রোপণ করিত যে, তাহাকে চোর বলিতে গেলে, লোককে তাহার কাছে নিজেই অপ্রস্তুত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইত।

এক দিন কিন্তু তাহার এই চুরি এক জন দেখিতে পাইল। যে দেখিতে পাইল, সে আর অন্য কেহই নহে—উহারই গৃহে পালিত একটি অনাথ বালক। বালকটির নাম সত্যশরণ। ধনেশ্বর দয়াপরবশ হইয়া সত্যশরণকে খাইতে দিত এমন নয়; সে এক গুণ খাইতে দিয়া তাহাকে সাত গুণ খাটাইয়া লইত। বালকটির কিন্তু ইহাতেও বিরক্তি ছিল না। তাহার বিশ্বাস ছিল, এক দিন না এক দিন তাহার সমস্ত কষ্ট দূর হইবে। তাহার এ বিশ্বাসের কারণ এই, তাহার মাতা মৃত্যুশয্যায় শুইয়া বলিয়া গিয়াছিলেন,—"বাছা সত্যশরণ, ধর্ম্ম-পথে থাকিও—তোমার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি এক দিন তোমার খুব সুখের সময় আসিবে।" সত্যশরণ তাঁহার এই কথায় এরূপ বিশ্বাসবান্ ছিল যে, এক সময় তাহার খুব সুখের দিন আসিবে বলিয়া সে মনে মনে স্পর্দ্ধা করিতেও ছাড়িত না।

যাহা হউক, ধনেশ্বরের চুরি কিরূপে ধরা পড়িল এখন সেই কথাই বলি। এক দিন রাত্রে ধনেশ্বর কোনও প্রতিবেশীর ক্ষেত্র হইতে কয়েকটি ভাল বাঁধা কপির গাছ চুরি করিয়া নিজের ক্ষেত্রে রোপণ করে। সে যখন যে রূপে সেই গাছগুলি চুরি করে এবং যেরূপে নিজের ক্ষেত্রে রোপণ করে, এ সমস্তই সত্যশরণ দেখিয়াছিল। সত্যশরণ প্রভাতেই উহা গ্রামময় রাষ্ট্র করিয়া দিল।

ধনেশ্বর ইহাতে প্রথমে কিছু ভয় পাইয়াছিল এবং সত্যশরণ যাহাতে আর কাহাকেও তাহার চুরির কথা না বলে, তজ্জন্য চেষ্টাও করিয়াছিল। কিন্তু সত্যশরণ চুপ করিয়া যাইবার ছেলে নয়। সে গ্রামে বাহির হইয়াই যাহাকে দেখিতে পাইল, তাহার কাছেই প্রভুর চুরির কথা বলিল।

এই রূপে অপমানিত হইয়া ধনেশ্বর শীঘ্রই ইহার প্রতিবিধানের একটা উপায় ঠিক করিয়া ফেলিল। সে গ্রাম্য বিচারকের নিকটে গিয়া তাঁহাকে উৎকোচ দিয়া সত্যশরণের নামে বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত করিল। বিচারক সত্যশরণকে বিচারালয়ে আহ্বান করিলেন। সত্যশরণ আসিয়া বিচারকের সম্মুখে সত্য কথা কহিল। তখন বিচারক প্রমাণের জন্য তাহাকে সাক্ষী উপস্থিত করিতে কহিলেন। এবার কিন্তু সত্যশরণের পরাজয় হইল। সাক্ষী, সত্যশরণ কোথায় পাইবে? সে বিচারকের নিকট কহিল—"ইহা বাস্তবিক ঘটিয়াছে, বাস্তবিকই ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।" কিন্তু "বাস্তবিক" দেখিয়া থাকিলে কি হইবে, সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ না করিতে পারিলে ত কিছু হইবে না! মানুষের বিচারালয়ে সত্যশরণের পরাজয় হইল। চোর আনন্দে আস্ফালন করিয়া সাধু হইয়া বিচারালয় হইতে বহির্গত হইয়া চলিল, আর সত্যশরণ, ঈর্ষ্যা বশতঃ ধনেশ্বরের নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়াছিল বলিয়া, বিচারপতি কর্ত্তৃক সংশোধনাগারে প্রেরিত হইল।

যাহারা বিচার শুনিতে আসিয়াছিল, তাহারা বাড়ীতে গিয়া আপন আপন পুত্রকন্যাদিগকে বলিল,—"সত্যশরণ আজি যে অসদৃষ্টান্ত দেখাইল, ইহা তোমরা যাবজ্জীবন মনে রাখিও। ধনেশ্বর তাহার প্রভু ও পরম উপকারক, কিন্তু তথাপি সে তাঁহার নামে অপবাদ দিয়া তাঁহার প্রতিপত্তি নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। সে অতি অসৎ বালক তাহাতে সন্দেহ নাই।"

সত্যশরণ কষ্টে কারাগারে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিল। যথাকালে কারাগারের যৎসামান্য খাদ্য ও একটু জল তাহার নিকট উপস্থিত হইলে সত্যশরণ ভাবিল,—"কি যন্ত্রণা, এ সকলই দেখিতেছি আমার সত্যকথনের ফল! ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক ধনেশ্বর চুরি করিয়াও গৃহে রাজভোগে রহিল, আর আমি সত্য কথা কহিয়া এই নরক-যন্ত্রণা ভুগিতে আসিয়াছি! হউক,—আমি ইহাতে দুঃখিত হইব না। আমি সত্যকথা বলিব আশা করিয়াই পিতা মাতা আমার সত্যশরণ নাম রাখিয়াছিলেন, আমি সত্য কথাই কহিব। এ কষ্ট বা কি, ইহা অপেক্ষা শতগুণ কষ্ট পাইলেও আমি সত্য কথা কহিতে ছাড়িব না।"

পুষ্কর তীর্থ।

পুষ্কর জনপদ রাজপুতানার সুদূরবিস্তৃত মরুভূমির পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত। আজমীর হইতে পশ্চিম দিকে চারি ক্রোশ গমন করিলেই এই স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। এখানে একটি সুন্দর হ্রদ আছে। হ্রদটির নাম পুষ্কর। এই পুষ্কর হিন্দুদিগের একটি পরম পবিত্র তীর্থ মধ্যে পরিগণিত।

পুষ্কর প্রকৃতির লীলাভূমি। ইহার এক দিকে পর্ব্বতমালা শিখর উন্নত করিয়া বিরাজিত, অপর দিকে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী মৃদুল প্রবাহে প্রবাহিত।

অন্তত্র সমতল ক্ষেত্রে আজমীর নগরের উন্নত অট্টালিকাশ্রেণীর দৃশ্য বড়ই মনোহর।

হ্রদটি ডিম্বাকৃতি। পর্ব্বতশিখরভগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড সমূহে ও বালুকার স্তূপে হ্রদটির চারিদিক বেষ্টিত। এই হ্রদটির উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণে একটি সুন্দর গল্প আছে। পুরাণে লিখিত আছে, —একদা ব্রহ্মা যজ্ঞ করিবার জন্য স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে এখানে উপস্থিত হন। তিনি ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া, এই স্থানেই যজ্ঞারম্ভ করেন। দেবী সরস্বতী যজ্ঞারম্ভ কালে উপস্থিত ছিলেন না। এজন্য তিনি এখানে উপস্থিত হইলে, মনোদুঃখে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এইরূপে রোদন করিতে করিতে তিনি স্রোতস্বিনী রূপে প্রকাশিত হইলেন। ইহার বহুকাল পরে এক রাজা মৃগয়া করিতে করিতে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া এই নদীতীরে আসিয়া ইহার সুমিষ্ট সলিল পান করেন। তাঁহার দুরারোগ্য ব্যাধি ছিল, কিন্তু এই স্রোতস্বিনীর সলিলপানে তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্যাধিবিমুক্ত হইয়া দিব্যকান্তি ধারণ করিলেন। সেই রাজাই একটি সুবৃহৎ সরোবর খনন করাইয়া তাহাতে এই স্রোতস্বতীর জল সংগ্রহ করেন। সেই সরোবরই এই পুষ্করহ্রদ রূপে পরিণত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের নানা স্থানের রাজগণ বিশেষতঃ রাজপুতানার রাজা সকল এখানে অনেক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এতগুলি মন্দির এই হ্রদটিকে বেষ্টন করিয়া আছে যে, দেখিলেই বিস্মিত হইতে হয়। শ্রেণীবদ্ধ মন্দিরের তিনটি সারি হ্রদটিকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে। গ্রীষ্মকালে জল কমিয়া গেলে হ্রদগর্ভেও অনেক মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্ষাকালে এই সকল মন্দিরের অনেকগুলি ডুবিয়া যাইত, অনেক গুলির শিখরদেশ মাত্র জলের উপর জাগিয়া থাকিত। এইরূপে অনেকগুলি মন্দির নষ্ট হইয়া গিয়াছে। হ্রদের জল বাহির করিবার জন্য ইংরাজদিগের দ্বারা একটি খাল খনিত হওয়ায়, বর্ষাকালেও এখন আর মন্দিরগুলি ডুবিয়া যায় না।

(প্রাপ্ত)

সেলাই

(জুতা।)

পাঠিকাগণ! এবারে তোমাদের জুতা বুনিবার উপায় বলিব। পশমের জুতা বলিলে সাধারণতঃ কার্পেটের জুতাই বুঝায়। আমি কিন্তু আজ যে জুতার কথা বলিতেছি, ইহা কাঁটা দিয়া বুনিতে হয়, কার্পেটের নহে। ইহা দেখিতে অতি সুন্দর এবং বুনাও অতি সহজ। পাঠিকাগণ! পরীক্ষা করিয়া দেখিও।

এই জুতা দেড় কিংবা দুই বৎসরের বালক বালিকার জন্য। ইহা বুনিবার জন্য দুই রঙ্গের পশম দরকার,—সাদাতে কালিতে কিংবা সাদাতে গোলাপীতে। ইচ্ছা করিলে, নিজের নিজের পছন্দ মত যে কোন রকমের পশম দিয়াও বুনিতে পার। আমি এখন তোমাদিগকে সাদাতে কালতে বুনিবার কথাই বলিব। ইহার জন্য এক আউন্স সাদা ও এক আউন্স কাল সিঙ্গ্‌ল্ বার্‌লিন্ পশম (Single Berlin), দুইটা ১৪ নং লোহার কাঁটা, এক জোড়া কর্কের সুখতলা, এক আঙ্গুল চওড়া এক হাত সাদা রেসমি ফিতা, ও খানিকটা ফ্লানেল চাই।

১ম লাইন—কাল পশম দিয়া ১৮টা ঘর তোল; কাল পশম দিয়া তিনটা ঘর সোজা বুন; পশমটা পশ্চাৎদিকে বাম হাত দিয়া ধরিয়া থাক; সাদা পশম আরম্ভ কর, সাদা পশম দিয়া তিনটা ঘর

সোজা বুন *। সাদা পশমটা পশ্চাতে ধর ও পূর্ব্বের কাল পশমটা পশ্চাৎভাগ দিয়া টানিয়া লইয়া তিনটা সোজা বুন; পুনর্ব্বার কাল পশম পশ্চাতে ধরিয়া সাদা পশম দিয়া তিনটা সোজা বুন*। পুনর্ব্বার চিহ্নিত স্থান হইতে আরম্ভ কর।

২য় লাইন—একটা ঘর খুলিয়া লও; সাদা পশম দিয়া ২ টা উল্টা; পশম সম্মুখভাগে বাম হাত দিয়া ধরিয়া থাক *। কাল পশম দিয়া ৩ টা উল্টা, সাদা পশম দিয়া ৩ টা উল্টা * চিহ্নিত স্থান হইতে আরম্ভ কর।

৩য় লাইন—১টা ঘর খুলিয়া লও, কাল পশম দিয়া ২টা সোজা, পশম পশ্চাতে ধরিয়া সাদা পশম দিয়া ৩ টা সোজা বুন *। ৩ টা ঘর কাল ৩ টা ঘর সাদা * চিহ্নিত স্থান হইতে আরম্ভ কর।

৪র্থ লাইন—দ্বিতীয় লাইনের ন্যায়।

৫ম লাইন—কাল পশম দিয়া সমস্ত সোজা।

৬ষ্ঠ লাইন—কাল পশম দিয়া সমস্ত উল্টা, এইরূপ ৬ লাইন ক্রমান্বয়ে বুনিতে থাক; এই ৬ লাইনকে একটি থাক বলিব। এখন একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পূর্ব্বের থাকে যেখানে সাদার চারকোণা ঘর হইয়াছে, পরের থাকে সেখানে কালর ঘর হওয়া চাই; অর্থাৎ প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম ইত্যাদি থাক কাল পশম দিয়া এবং দ্বিতীয়,চতুর্থ, ষষ্ঠ ইত্যাদি থাক সাদা পশম দিয়া আরম্ভ করিবে। এইরূপে ১৫থাক বুন; পায়ের এক পাশের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া গোড়ালি বেষ্টন করিয়া অপর পাশের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত হইল। এখন যে কাঁটাতে ঘরগুলা আছে, তাহাতেই আরও ১৫টা ঘর তুল ও এই বোনাটার শেষভাগের ১৮ টা ঘর তুলিয়া লও। সবশুদ্ধ ৫১টা ঘর হইল। এই ঘরগুলা পূর্ব্বের ন্যায় থাক থাক করিয়া বুনিয়া যাও; কিন্তু প্রতি লাইনের প্রথমে ও শেষে ২ টা ঘর এক সঙ্গে বুনিতে হইবে। যখন দেখিবে ঘর কমিয়া কাঁটাতে ১৫ টা ঘর আছে, তখন কাল পশম দিয়া দুই লাইন সোজা বুনিয়া মুখ বন্ধ কর। এখন ইহার ভিতরদিকে ফ্ল্যানেল দিয়া সেলাই কর; পরে কর্কের সুখতলার সহিত ইহা সেলাই কর। এখন এই জুতার উপরিভাগের জন্য ফুল বুনিতে হইবে। সাধারণ টুপির ফুলের ন্যায় এই ফুল বুনিতে হয়। বোধ হয়, তোমরা সকলেই ইহা বুনিতে জান,বিশেষ করিয়া বলিবার দরকার নাই। এইমাত্র বলিতেছি, ৪ টা ঘর করিয়া বুনিলেই ইহার পক্ষে যথেষ্ট। জুতার উপরিভাগের যতখানি ঘের, ততটা মাপিয়া বুনিয়া ইহার সহিত সেলাই করিয়া দাও, এবং ভিতর দিয়া ফিতা দিয়া সাম্‌নে ফাঁস দিয়া দাও।

পাঠিকাগণ! তোমরা যদি ক্রোসে (Crotchet) কাঁটায় বুনিতে শিখিয়া থাক, তাহা হইলে তোমরা "সখা"র সম্পাদক মহাশয়কে লিখিও,—তিনি অনুগ্রহ করিয়া তোমাদের চিঠি আমার কাছে পাঠাইয়া দিলে, আমি পরের সংখ্যায় ক্রোসের বোনার বিষয় কিছু লিখিব।

ধাঁধা।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

১। বৎসর।

২। কালেজ।

৩। শ শ ক
শ ম ন
ক ন ক

সখা
একাদশ ভাগ। ৩য় সংখ্যা।

মার্চ্চ, ১৮৯৩।

বিবিধ।
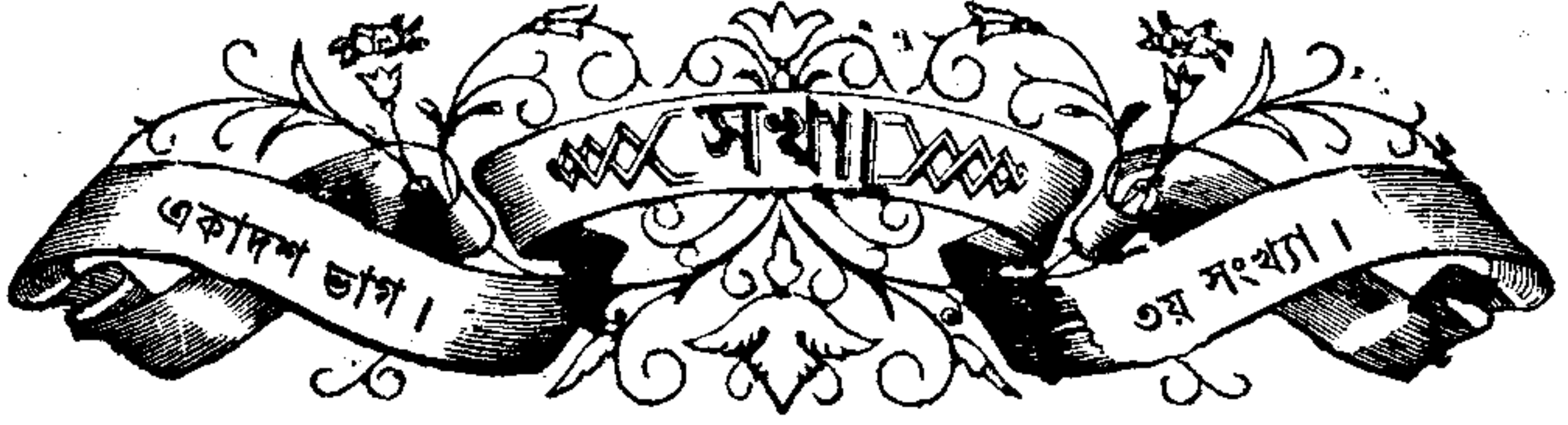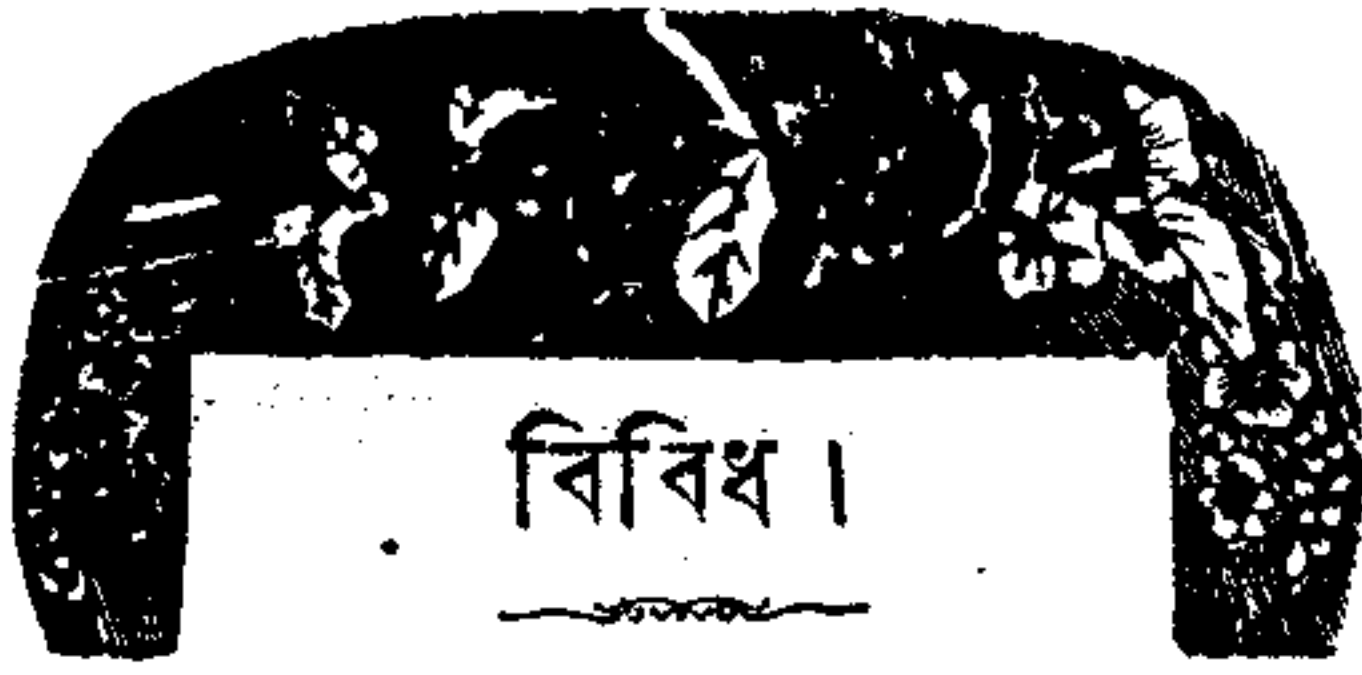
বৃহস্পতি গ্রহে নূতন উপগ্রহ।—তোমরা সকলেই বোধ হয় জান, আমাদের এই পৃথিবীর একটি মাত্র উপগ্রহ—চন্দ্র। বৃহস্পতিরও সেই প্রকার চারিটি উপগ্রহ সাধারণে এতদিন পর্য্যন্ত জানিতেন। কিন্তু গত ৯ই সেপ্টেম্বর মার্কিন্ দেশীয় অধ্যাপক বার্ণার্ড্ বৃহস্পতির একটি নূতন উপগ্রহ আবিষ্কার করিয়াছেন। লিক্ মানমন্দিরে যে বৃহৎ দূরবীক্ষণ আছে, ইহা তাহারই সাহায্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৃহস্পতিতে এক্ষণে সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচটি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইল। নূতন উপগ্রহটির এখনও নামকরণ হয় নাই।

* * *

কাবুলি।—আজ কাল প্রায় সকলেই কাবুলি মূর্ত্তি দেখিয়াছ। ইহাদের কেহ নানা রকম ফল বিক্রয় করিতেছে, কেহ বা গ্রামে গ্রামে শীতবস্ত্র বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছে। ইহাদিগকে দেখিলে অত্যন্ত অসভ্য বলিয়া মনে হয়। পরিচ্ছন্নতা যে কি, তাহা ত ইহাদের মধ্যে কখন দেখিতেই পাওয়া যায় না। ইহাদের জন্মভূমি আফগানিস্তান। এই দেশের রাজধানী কাবুল হইতেই ইহাদিগের কাবুলি নাম। আফগানিস্তানের অধিপতিকে আমির বলে। সংপ্রতি আমিরের বিশ্বস্ত ইংরাজ ইঞ্জিনিয়র কলিকাতা আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত অনেকেই দেখা করিতে গিয়াছিলেন, এবং শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন যে, কাবুলিরা নিজেদের দেশে কামান, বন্দুক, গোলা, গুলি, সাবান, কাপড় ইত্যাদি অনেক জিনিস প্রস্তুত করিতেছে। কাগজের কল ও ছাপাখানা শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই সমস্ত প্রস্তুত করণোপযোগী কল ইংরাজ ইঞ্জিনিয়র ইউরোপ হইতে আনিয়া কাবুলিদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। এবং গত দশ বৎসরে ইহারা অনেক জিনিস প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা করিয়াছে। চেষ্টায় মানুষ কি না করিতে পারে?

* * *

চিকাগো বিশ্বপ্রদর্শনী।—তোমাদের মধ্যে অনেকেই সম্ভবতঃ আমেরিকার চিকাগো নগরের নাম ভূগোলে পড়িয়াছ। এই চিকাগো নগরে পৃথিবীর সমস্ত দেশের নানা রকম দ্রব্যাদি প্রদর্শনের একটি প্রকাণ্ড মেলা হইবে। এই বিশ্বপ্রদর্শনীতে উপস্থিত হইবার জন্য বাঙ্গালীর মেয়ে শ্রীযুক্তা কাদম্বিনী গাঙ্গুলি নিমন্ত্রিতা হইয়া তথায় যাত্রা করিয়াছেন। বাঙ্গালীর পক্ষে শ্লাঘার বিষয়।

* * *

কুকুরের প্রভুভক্তি।

একজন ফরাসি দেশীয় বণিকের কোন স্থানে কতকগুলি টাকা পাওনা ছিল। তিনি টাকা গুলি আনিবার জন্য এক দিন অশ্বারোহণে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার একটি কুকুর ছিল। কুকুরটিকে তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন। বাটী হইতে বহির্গত হইবার সময়, ইঙ্গিত করিলে, কুকুরটিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলিল।

গন্তব্য স্থানে উপনীত হইলে, বণিক হিসাব-পত্র করিয়া আপনার টাকাগুলি বুঝিয়া লইলেন, এবং উহা একটি ব্যাগে পুরিয়া আপনার সঙ্গে লইয়া অশ্বারোহণে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কুকুর-টিও তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া, কখন ঘোড়ার আগে আগে, কখন পিছু পিছু এবং কখন বা পাশে পাশে ছুটিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে চলিল।

কিয়দ্দূর গমন করিলে, পরিশ্রান্ত হইয়া, বণিক অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং একটি বৃক্ষের শীতল ছায়ায় অশ্বটিকে বিশ্রাম করিতে দিয়া আপনিও তথায় উপবেশন করিলেন। টাকার ব্যাগটি আপনার পাশেই রাখিলেন। বিশ্রাম উপভোগ করিয়া স্নিগ্ধ হইলে, বণিক গৃহগমনের নিমিত্ত পুনরায় অশ্বারোহণ করিয়া অশ্বকে চালিত করিলেন। কিন্তু টাকার ব্যাগটি যে আপনার পাশেই রাখিয়াছিলেন, তাহা তুলিয়া লইতে ভুলিয়া গেলেন। সুতরাং উহা সেই খানেই পড়িয়া রহিল।

কুকুর দেখিল, প্রভু ব্যাগটি ভুলিয়াছেন। তখন ব্যাগটি লইয়া যাইবার জন্য সে ব্যাগটির কাছে ফিরিয়া গেল। কিন্তু ব্যাগটি ভারি বলিয়া তুলিতে না পারিয়া, ডাকিতে ডাকিতে পুনরায় প্রভুর নিকট ফিরিয়া আসিল। সে পুনঃপুনঃ চীৎকার করিয়া অনেক ইঙ্গিত করিল, কিন্তু প্রভু কিছুতেই তাহার চীৎকারের কারণ বুঝিতে পারিলেন না। সুতরাং বেগে অশ্বচালনা করিয়া চলিলেন। কুকুর তবুও ছাড়ে না, সে অশ্বের গতিরোধ করিবার অভিপ্রায়ে পুনঃপুনঃ অশ্বের পায়ে কামড়াইতে লাগিল।

কুকুরের এই প্রকার আচরণ দেখিয়া, বণিক তখন ভাবিলেন, আর কিছু নয়, কুকুরটা ক্ষেপিয়াছে। একটি ছোট খাল পার হইয়া বণিক দেখিতে লাগিলেন, কুকুর জল পান করে কি না। কেন না, ক্ষেপিলে কুকুর জলপান করে না, জল দেখিয়া ভয় পায়। এ দিকে, কুকুর তৃষ্ণার্ত্ত হইলেও, জলপান করিল না। বরং কিসে তাহার প্রভুকে তাঁহার অসাবধানতার বিষয় জানাইয়া দিতে পারে, অধিকতর ব্যগ্রতা ও চীৎকার দ্বারা কেবল তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল।

বণিক নিরাশ হইলেন। কুকুর যে নিশ্চয়ই ক্ষেপিয়াছে, তাহাতে তাঁহার আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রহিল না। পাগ্‌লা কুকুর কামড়াইলে মানুষ বাঁচে না। সুতরাং তিনি নিজের জীবনের বিষয় চিন্তা করিয়া অবিলম্বে কুকুরের প্রাণসংহার করাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ কুকুরকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িলেন। গুলি কুকুরের শরীর ভেদ করিল, এবং কুকুর রক্তাক্ত দেহে ভূমি-তলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

বণিক আর সে দৃশ্য দেখিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়া দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিয়া চলিলেন, এবং মনে মনে বলি-লেন,—"হায়! আমি অতি দুর্ভাগ্য, তাই কুকুরটি হারাইলাম। কুকুরটি যাওয়া অপেক্ষা টাকাগুলি

গেলেও আজ আমার এত কষ্ট হইত না।" মনোমধ্যে এইরূপ চিন্তা উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার টাকাগুলির খোঁজ পড়িল। তখন দেখেন, সঙ্গে টাকা নাই। টাকা সঙ্গে নাই দেখিয়াই বুঝিলেন, উহা নিশ্চয়ই বৃক্ষতলে পরিত্যক্ত হইয়াছে। কুকুর যে কেন পুনঃপুনঃ তাঁহার গমনে বাধা জন্মাইতেছিল, এখন আর তাঁহার তাহা বুঝিবার বাকি রহিল না। এবং এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ দুঃখে বণিকের হৃদয় পীড়িত হইতে লাগিল।

বণিক ফিরিয়া চলিলেন। পথে বরাবর শোণিত-চিহ্ন অনুসরণ করিয়া চলিলেন, কিন্তু তাঁহার কুকুরকে দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে, যে বৃক্ষতলে তিনি বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন, সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু, হায়, সেই বৃক্ষতলে কি নিদারুণ দৃশ্য! ব্যাগটির পাশে শুইয়া কুকুরটি মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে! বণিক নিকটে গেলে, কুকুর তাঁহাকে দেখিয়া লেজ নাড়িয়া আনন্দ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিল। উঠিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তখন কাতরনয়নে প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়াই চিরকালের জন্য নয়ন মুদ্রিত করিল।

আহা! একটি প্রাণী, প্রভুর সম্পূর্ণ হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়াও, কেবল বাক্‌শক্তির অভাবে, আপনার মনের কথা প্রকাশ করিতে না পারিয়াই, প্রভুর হস্তে প্রাণত্যাগ করিল! অত্যাচারী ও অসৎ কৌতুকপ্রিয় বালকবালিকাদের কাছেও ত কত প্রাণী কাঁদিয়া নিত্য হৃদয়ের বেদনা জানায়, কাতরনয়নে চাহিয়া অত্যাচার হইতে নিরস্ত হইতে অনুনয় করে, কিন্তু, হায়! তাহারা তাহা বুঝিয়া কাজ করে কি?

জেম্‌স্‌ ওয়াট্‌।
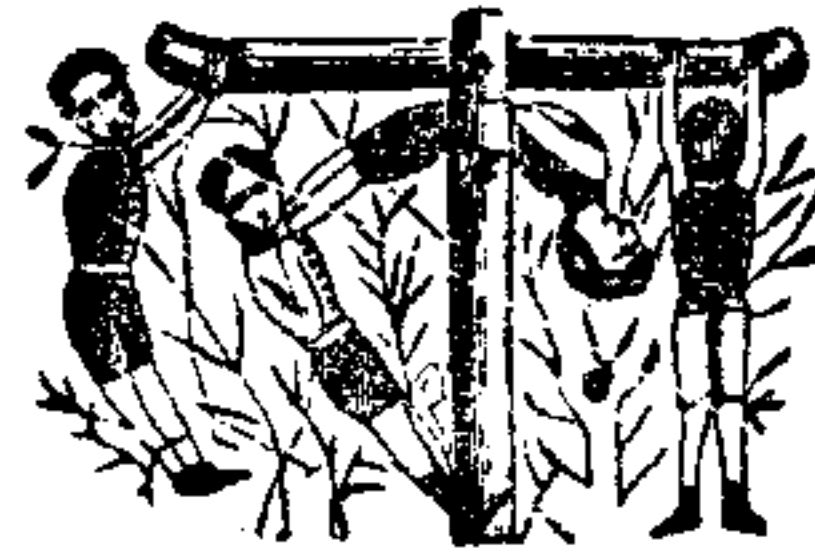
না স্কুল কিম্বা কলেজে রীতিমত শিক্ষালাভ না করিয়া, আপনার চেষ্টায় ও যত্নে লোকে কিরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারে, জেম্‌স্‌ ওয়াটের জীবনী পাঠ করিলে, তাহা আমরা অবগত হইতে পারি।

১৭৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৯এ জানুয়ারি তারিখে স্কট্‌লণ্ডের অন্তর্গত গ্রীন্‌উইচ্‌ নামক স্থানে জেম্‌স্‌ ওয়াট্‌ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবধিই তিনি অত্যন্ত কৃশ ছিলেন; শরীরে তাদৃশ বল ছিল না। কিন্তু বল তত না থাকিলেও, তাঁহার বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল, এবং এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভাবেই বাষ্পীয় কলের আবিষ্কার করিয়া তিনি জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

শরীর কৃশ ছিল বলিয়া ওয়াটের পিতা মাতা তাঁহাকে কোন স্কুলে না পাঠাইয়া বাড়ীতেই তাঁহার শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এই স্থলে জেম্‌সের বাল্যশিক্ষা সম্বন্ধে একটি গল্প বলিতেছি। এক দিবস কোন ভদ্রলোক জেম্‌সের পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন যে, জেম্‌স্ একখণ্ড খড়ি হাতে করিয়া গৃহের ভিতর বসিয়া মেজের উপর কি আঁকিতেছে। উপস্থিত ভদ্রলোকটি মনে করিলেন যে, জেম্‌স্ বুঝি এইরূপে আঁক জোক কাটিয়াই বৃথা সময় নষ্ট করে। তিনি ইহাতে একটু অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পিতাকে বলিলেন যে, জেম্‌স্‌কে এরূপে বৃথা সময় নষ্ট করিতে দেওয়া তাঁহার উচিত নহে। এই কথা শুনিয়া জেম্‌সের পিতা বলিলেন,—"মহাশয়! আপনার বুঝিবার ভুল হইয়াছে, জেম্‌স্ সময় নষ্ট করিতেছে না—সে ইউক্লিডের জ্যামিতি সম্বন্ধীয় কোন প্রতিজ্ঞা সাধনে নিযুক্ত আছে।" ভদ্রলোকটি কিছু অপ্রস্তুত হইয়া দেখিলেন যে, বাস্তবিক জেম্‌স্ তাহাই করিতেছে। তখন তিনি জেম্‌স্‌কে কয়েকটি কঠিন প্রশ্ন করিলেন এবং জেম্‌সের আশাতীত সুন্দর উত্তর পাইয়া তাঁহার বুদ্ধির অত্যন্ত প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

জেমস্ বৃথা সময় নষ্ট করিবার ছেলে ছিলেন না। তিনি সর্ব্বদাই কোন না কোন একটী গুরুতর বিষয়ের চিন্তায় নিযুক্ত থাকিতেন। বাল্যাবধিই তাঁহার চিন্তাশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। যখন বাড়ীতে আহারীয় সামগ্রী প্রস্তুত, তখন তিনি পাকশালায় যাইয়া বাষ্পের গতিবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিতেন। জেম্‌স্ বুঝি এইরূপে বৃথা সময় নষ্ট করে, এই মনে করিয়া একদা তাঁহার কোন আত্মীয় তাহাকে ধমকাইয়াছিলেন, কিন্তু তখন তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, জগতে এক অতুল কীর্ত্তি রাখিবার জন্যই জেম্‌স্ পাকশালায় যাইয়া গভীর চিন্তায় নিযুক্ত থাকিত। আজ জগতের সমস্ত লোকই তাঁহার সেই চিন্তার শুভফল ভোগ করিতেছে। জেম্‌স্ ওয়াট্ যদি বাষ্পীয় কলের সৃষ্টি করিয়া না যাইতেন, তবে আজ আমরা যে কাজকে সামান্য মনে করিতেছি, তাহা সমাধা করিতেও কত লোকের আবশ্যক হইত। সামান্য কয়লা, কাঠ, জল, আগুনের সাহায্যে আজ জগতের কত কাজ সাধিত হইতেছে! কেবল লোক খাটাইয়াই কাজ লইতে হইলে, কিছু সময় পরে শ্রমজীবীরা ক্লান্ত হয়; সুতরাং পুনরায় নূতন লোক নিযুক্ত করিবার আবশ্যক হয়। কিন্তু বাষ্পীয় কলকে কেহ কখন ক্লান্ত হইতে দেখিয়াছ কি? ইহার এক একটি, অনবরত হাজার হাজার লোকের কাজ সমাধা করিতেছে। এঞ্জিন্ না থাকিলে রেলের গাড়ী টানিতে কতগুলা ঘোড়া অথবা কতগুলি মানুষের দরকার হইত বল দেখি? এমন গড়্ গড়্ করিয়া গাড়ী ছুটিত কি? তার পর শুধু স্থলে নহে, জলেও ইহার কার্য্য! কি অদ্ভুত ব্যাপার!! বাষ্পীয় কল ব্যতীত জলে এই কার্য্য সমাধা করিতে কত লোকের দরকার হইত, আর কেমন করিয়াই কি হইত, বল ত?

১৮ বৎসর বয়সের সময় বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে শিক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি লণ্ডন নগরে যাত্রা করেন। শরীরের অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি তথায় এক বৎসরের বেশি থাকিতে পারেন নাই। তথাপি এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে তিনি বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রায় সমস্ত যন্ত্রাদিই প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক বৎসর পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বীয় যত্নে ও চেষ্টায় এই বিষয়ে এত দূর পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন যে, কিছুদিন পরে তিনি গ্লাস্‌গো কলেজের বিজ্ঞান

সম্বন্ধীয় যন্ত্রনির্ম্মাতার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই পদ লাভ করা তখন কম গৌরবের বিষয় ছিল না। বিশেষতঃ এত অল্প বয়সে ও এত অল্প কালের যত্ন ও চেষ্টায় এই পদ লাভ করা কোন কালেই সামান্য প্রশংসার কথা নহে। এই সময়ে জেম্‌সের বয়স সবে ১৯ বৎসর মাত্র ছিল।

জেম্‌স্ যখন বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে সম্পূর্ণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, তখন নিউকোমেন্ এক বাষ্পীয় কল প্রস্তুত করিয়া তাহা সংশোধনের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। ওয়াট্ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহার দোষ বাহির করেন এবং পরে স্বীয় যত্ন ও অধ্যবসায়ে নিজে এক উত্তম বাষ্পীয় কল প্রস্তুত করেন। নিউকোম্যানের কল অপেক্ষা ইহার কার্য্যশক্তি বেশি এবং ব্যয় অতি কম। ওয়াটের বাষ্পীয় কল প্রস্তুত হইলে চতুর্দ্দিকে তাহার নাম বাহির হইয়া পড়িল। শত শত কোম্পানি তাহাদের কার্য্যের সুবিধার জন্য ঐ কল ক্রয় করিতে লাগিল।

ওয়াট্ কোন সময়ে বার্ম্মিংহামে গমন করেন। তথায় অবস্থিতি কালে তিনি বেলেটন নামক জনৈক লৌহব্যবসায়ীর কারবার দেখিবার নিমিত্ত তাহার দোকানে গমন করেন। বেলেটন ওয়াটের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন যে, তিনি ওয়াট্‌কে ঐ কারবারের একজন অংশীদার করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তদনুসারে ওয়াট্ ঐ কারবারের অংশীদার হইয়াছিলেন। এবং এই ব্যবসায়ের দ্বারা তিনি পরে বিলক্ষণ অর্থলাভ করিয়াছিলেন।

এই সময়েই জেম্‌সের কীর্ত্তি দেশের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহার কলের বিস্তর কাট্‌তি হইতে লাগিল। সুতরাং এক্ষণে প্রচুর অর্থের সাহায্যে তিনি তাঁহার কলের বিবিধ উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে অর্থের অভাবে তিনি তাঁহার কলের কোনরূপ উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই; এখন তাহাও হইয়া গেল।

যন্ত্রাদিনির্ম্মাণবিদ্যা ব্যতীত রসায়নশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, অস্ত্রবিদ্যা প্রভৃতিতেও ওয়াট্ সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। এ সমস্তই তিনি কেবল নিজের যত্ন ও চেষ্টায় সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন।

জেম্‌স্ ওয়াটের জীবনে আমরা দেখিতে পাই, যত্ন, চেষ্টা ও অধ্যবসায় থাকিলেই লোকে জগতে মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে। আমরা মনে করি, স্কুলে কলেজে না পড়িলে, বুঝি কেহ কিছু শিখিতে পারে না। কিন্তু জেমস্ ওয়াটের জীবনী পড়িলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, কেবল নিজের চেষ্টা দ্বারাও লোকে উন্নতি লাভ করিতে পারে। আপনার যত্ন ও অধ্যবসায়ে জেম্‌স্ ওয়াট্ যাহা করিয়া গিয়াছেন, স্কুলে কলেজে পড়িয়াও কয় জনে তাহা করিতে পারিতেছেন? এই রূপে জগতে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া খৃঃ ১৮১৯ অব্দে ৮৪ বৎসর বয়সে জেম্‌স্ ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

রাজসিংহের পুত্র ভীমের পিতৃভক্তি।

পিতার প্রীতি সাধনের নিমিত্ত রামচন্দ্র ও ভীষ্মদেব যে অসামান্য স্বার্থত্যাগ ও মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয়, তোমরা সকলেই জান। রাজপুতানার ইতিহাসেও

পিতার প্রীতি সাধনার্থ স্বার্থত্যাগের কতকগুলি সুন্দর বিবরণ আছে। তাহার মধ্য হইতে ক্ষুদ্র একটি কাহিনী আজ তোমাদিগকে বলিতেছি।

মিবারের রাণা জগৎসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজসিংহ খ্রিঃ ১৬৫৪ অব্দে রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইঁহার পর, ইঁহার পুত্র জয়সিংহ মিবারের সিংহাসন লাভ করেন। এই জয়সিংহের রাজা হইবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। কেন না, রাজসিংহের অপর একটি পত্নীর গর্ভজাত আর একটি পুত্র ছিল; সে জয়সিংহের অপেক্ষা বয়সে একটু বড়। জয়সিংহের এই বৈমাত্রেয় ভাইটির নাম ভীম।

ভীমের অপেক্ষা জয়সিংহ যে বেশি ছোট, তাহা নয়। ভীমের ভূমিষ্ঠ হইবার কয়েক ঘণ্টা পরেই জয়সিংহের জন্ম হয়। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, ভীম ত বড় বটে। রাজসিংহাসনে ভীমেরই অধিকার।

রাজার কিন্তু ভালবাসাটুকু জয়সিংহের উপরই বেশি বেশি ছিল। জয়সিংহের মাতাকেই রাজা বেশি ভালবাসিতেন। তাঁহার এই বেশি ভালবাসার উদাহরণ স্বরূপ তোমাদিগকে একটা কথা শুনাইতেছি। রাজপুতদিগের নিয়ম এই, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, তাহার বল ও আয়ুর্ব্বৃদ্ধির জন্য, পিতাকে সেই শিশুর বাহুতে এক প্রকার তৃণের তাগা বাঁধিয়া দিতে হয়। ভীম ও জয়সিংহ ভূমিষ্ঠ হইলে, রাজসিংহকেও তাগা বাঁধিতে যাইতে হইল। হিসাব মত আগে বড়টির হাতেই তাগা বাঁধিতে হয়। কিন্তু কোন্ শিশুটি বড় এবং কোন্‌টি ছোট ইহা জানিলেও, রাণা, ছোট জয়সিংহের হাতেই আগে তাগা বাঁধিয়া দিলেন। তিনি এমন ভাবটি দেখাইলেন, যেন কোন্‌টি কোন্ রাণীর ছেলে, এবং কোন্‌টি বড়, কোন্‌টি ছোট,—ইহার কিছুই তিনি বুঝিতে পারেন নাই। লোকের কিন্তু তাঁহার মনের কথা বুঝিতে বাকি রহিল না। সকলেই বুঝিল, ছোট শিশুটির মাতাকে তিনি বেশি ভালবাসেন বলিয়াই, একটু ফিকির করিয়া ছোট ছেলেটির হাতেই আগে তাগা পরাইয়া দিলেন।

শিশু দুইটির বাল্যকাল কাটিয়া গেল। তাগা বাঁধার কথা কিন্তু অনেকে ভুলিল না। রাজার ঘরের কথা; রাজার ভালবাসায় অনেক আসে যায়; সুতরাং তোমরা সহজেই বুঝিতে পারিতেছ, ভীমও যে বড় হইয়া, সে কথাটা একবারেই কাহারও মুখে না শুনিয়াছিলেন, এমনও বোধ হয় না। বুদ্ধিমান্ রাণা রাজসিংহও এ দিকে মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এইরূপে ও অন্যরূপে গৃহমধ্যে তাঁহা দ্বারা যে অসন্তোষের বীজ রোপিত হইয়াছে, কালে তাহাই শাখা-পল্লব-বিশিষ্ট প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইয়া সমস্ত মিবার রাজ্যকে অশান্তিময় করিয়া তুলিবে। এজন্য, পুত্র দুইটি যৌবন প্রাপ্ত হইলে, এক দিন রাণার মনোমধ্যে কি এক প্রকার ভাবের উদয় হইল, তিনি জ্যেষ্ঠ তনয় ভীমকে নিকটে আহ্বান করিয়া, তাহার হাতে একখানি শাণিত তরবারি দিয়া কহিলেন,—"রাজ্যে অশান্তি ঘটিতে দেওয়া অপেক্ষা, সময় থাকিতে তাহার প্রতীকারের চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। অতএব যাও, এই তরবারি দ্বারা এখনই তোমার ভ্রাতার প্রাণসংহার কর।"

পিতা কিরূপ সঙ্কটে পড়িয়া, কি প্রকার মানসিক যন্ত্রণার আবেগে এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন, মনস্বী ভীম তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। এবং পিতাকে এইরূপ অসীম মানসিক যন্ত্রণার হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,—"পিতঃ! আপনি নিশ্চিন্ত হউন; আমি আপনার রাজসিংহাসন স্পর্শ করিয়া বলি-

তেছি, ইহাতে আমার যে কিছু স্বত্ব আছে, তাহা আজি হইতে জয়সিংহকে অর্পণ করিলাম। আজি হইতে, যদি আমি এই দোবারি গিরিবর্ত্মের মধ্যে বিন্দুমাত্রও জলপান করি, তাহা হইলে, আর আমি রাণা রাজসিংহের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে অধিকারী নহি।" এই বলিয়া, পিতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, অনুযাত্রী রক্ষকগণ সমভিব্যাহারে ভীম চিরকালের জন্য উদয়পুর পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন।

মধ্যাহ্নকাল অতীত-প্রায়। সূর্য্য মস্তকের উপর প্রখর কিরণ বর্ষণ করিতেছেন। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। বৃক্ষের, পত্রটিও কম্পিত হইতেছে না। ভীম ক্লান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া একটি বটবৃক্ষের শীতল ছায়ায় বিশ্রামলাভার্থ উপবেশন করিলেন। তথা হইতে উদয়পুরের প্রতি শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, আপনার অদৃষ্টের পরিণাম চিন্তা করিতে করিতে অন্যমনস্ক হইয়া, অনুচরগণের প্রতি পান করিবার জন্য একটু জল আনিবার আদেশ প্রদান করিলেন। অবিলম্বে পাত্রবাহক নিকটস্থ প্রস্রবণ হইতে রৌপ্যপাত্র পূর্ণ করিয়া শীতল জল লইয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিল। ভীম সেই জলপূর্ণ পাত্র হস্তে লইয়া ওষ্ঠসংলগ্ন করিতে যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার স্মরণ হইল, তিনি পিতার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, দোবারি গিরিবর্ত্মের মধ্যে বিন্দুমাত্র জলপানও করিবেন না। অমনি ওষ্ঠসন্নিহিত পানপাত্র নামাইলেন। সমস্ত জলটুকু ভূতলে ঢালিয়া দিয়া পানপাত্র ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন, এবং স্বীয় অনুযাত্রী সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া দোবারি গিরিবর্ত্মের লৌহকপাট অবরুদ্ধ হইল। তাহার পর ভীম বাহাদুর শাহের আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অধীনে কতকগুলি সৈন্যের কর্তৃত্বভার পাইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

যিনি রাজছত্রতলে বিরাজিত হইয়া কতই সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিতেন, তাঁহার বিদায়কালীন কষ্ট দেখিয়া সহস্র হৃদয় দুঃখে শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু ভীম আপনার দুঃখকে দুঃখ বলিয়া গণনাই করিলেন না। পিতার তুষ্টি সাধনার্থ আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করাই তিনি জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন, এবং সেই পবিত্র ব্রত পালনে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতে পারিয়াছিলেন।

বসন্ত।

মধুর বসন্তে ধরা
মরি কি মাধুরীময়,
ধরণীর দেহে যেন
যৌবন-পুলকোদয়।
ফল-ভারে কেহ ঝুঁকে,
ফুল-হার কারো বুকে,
তরু লতা মন-সুখে
শতমুখে কথা কয়।
মলয়ের মৃদু শ্বাসে,
কোকিল ললিত ভাষে;
মধুর গুঞ্জরি আসে
নিকুঞ্জে মধুপচয়।
কি বুঝিব, নাথ, আমি,
এ নিখিল সুখভূমি—
অনন্তসুন্দর তুমি—
গাইছে তোমারি জয়।

বিলাতের গল্প।

স্কুল ও স্কুলের ছেলে।

তোমরা বোধ হয় অনেকের কাছে শুনিয়াছ ও এত দিনে নিজেরাও বুঝিতে পারিয়াছ যে, সব দেশেই, বড় লোক ও গণ্যমান্য মানুষ হতে হলে, লেখা পড়া শিখার খুব দরকার। বিশেষ বিলাতে ইংরেজ বালকদের পক্ষে উহা আরও বেশি আবশ্যক। কেন না, সে দেশে বাপের বিষয় কেবল বড় ছেলেতেই পায়। আমাদের দেশের মত, সব ভাইদের পৈতৃক সম্পত্তির সমান ভাগ পাবার নিয়ম নাই। আর সেখানকার পুত্রেরা উপযুক্ত হ'লেই, কোন কাজ না কোরে বোসে থাকৃতে লজ্জা বোধ করে। কাজেই তাদের রোজগার কোরে খেতে হয়। তা ছাড়া, সে দেশে সকল বড় কর্ম্মে ও একজামিনে খুব আড়াআড়ি আছে; লোকের গুণ না থাকৃলে কেবল খোসামোদ কোরে কাজ কর্ম্ম পাবার যো নাই। এই সব কারণে ইংরেজ বালকেরা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া লেখাপড়া না করিলে উপায় নাই। সে দেশে প্রাইজ, স্কলারশিপ্ ও উপাধিগুলায় ছেলেদের বড় মান, আর বিদ্বান লোকদের জন্য সেথা যেমন নানা কাজের পথ খোলা আছে, এমন আর কোন দেশে নাই।

পূর্ব্বে আমাদের দেশের যুবকেরা হাজার লেখা পড়া শিখিলেও কেবল এক উকিলগিরি কাজ ছাড়া আর তাঁদের গতি ছিল না, কিন্তু সুখের বিষয় এখন সে কাল চ'লে গেছে। আজ কাল কোন ছেলে খুব মন দিয়া লেখা পড়া শিখিলে ক্রমে প্রফেসর, এঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, কি সিবিলিয়ান, ও চাই কি জজের পদেও উঠিতে পারে। বিলাতে কিন্তু ছেলেদের আবার আরও বেশি সুবিধা। খুব ভাল রকমে শিক্ষিত একটি কুড়ি বছরের ছেলের সমুখে অনেক রকম কাজের দরজা খোলা থাকে। সে সবগুলিই অতি সম্মানের ও বড় বড় বেতনের কাজ। যুবক ইচ্ছা করিলে, কোন গির্জ্জায় পুরোহিতের কাজও করতে পারে। অবশ্য, তোমরা মনে কোরো না যে আমাদের দেশের এখনকার অনেক বামুনের মত সে দেশের পুরুতেরা নানা রকমে যজমানদের কাছ থেকে পয়সা আদায় করে। সে দেশে কোন বালকের পুরোহিত হওয়া মঞ্জুর হলে, এক জন ক্লার্জিম্যানের (পাদ্রি) অধীনে থেকে, তাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান শিখিতে হয় ও একজামিন দিয়া তবে গির্জ্জার কাজে ভর্ত্তি হতে হয়। আবার, বালকের যদি ধর্ম্মের কাজে মন না যায়, তবে সে ডিগ্রী ল'য়ে শিক্ষক ও প্রফেসরের কাজ ক'রতে পারে। তা ছাড়া, বিলাতের কি ভারতবর্ষের সিবিলিয়ানের একজামিন দিলে তার এঞ্জিনিয়ার বা মাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হ'বারও উপায় আছে। আর সেনাদলে (Army) সৈনাধ্যক্ষ, বা বারে (Bar) বারিষ্টার কি এটর্নি হয়ে ক্রমে ক্রমে সে জজ হবারও আশা করিতে পারে। অনেকে আবার দেশে বা বিদেশে নানা রকমে কল কারখানায় ও কারবারে নিযুক্ত হয়।

এই রকমে সে দেশের সব ছেলেরা পৈতৃক সম্পত্তি না পেলেও, ইচ্ছা করিলে, নিজের যত্নে এক এক জন বড় লোক হ'তে পারে। আর ও রকম বড় লোকেরও সে দেশে অভাব নাই। মিষ্টার গ্লাড্ষ্টোন, ফ্রেড্রিক হারিসন, হর্বর্ট স্পেন্সর, মৃত রবার্ট ব্রাউনিং, ব্র্যাড্‌ল ও টেনিসন্ প্রভৃতি তোমরা যত বড় বড় লোকের নাম শুনেছ, তাঁরা সকলেই নিজ নিজ চেষ্টা ও যত্নে লেখাপড়া শিখে ঐ রকম বিখ্যাত হয়েছেন।

বিলাতে অনেক বড় পব্‌লিক স্কুল আছে। তাদের মধ্যে ইটন, রাগ্‌বি ও হ্যারো প্রধান। সমস্ত বিদ্যালয়গুলিই অতি উৎকৃষ্ট নিয়ম মতে চালিত হয় এবং উহাতে লেখা পড়ার ন্যায় বোর্ডের অর্থাৎ খাওয়া ও থাকারও ব্যবস্থা আছে। ঐ সকল সাধারণ পাঠশালায় বেশীর ভাগ ধনী ও মধ্যবিত্ত লোকের ছেলেরাই পড়িয়া থাকে। ঐ স্কুলের ছাত্রেরা বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার রকম খেলা ও ব্যায়াম শিখে। ক্রিকেট্, ফুট্‌বল, টেনিস্,দাঁড়বাহা ইত্যাদি সব রকম ক্রীড়াতেই তারা দক্ষ হয়। হ্যারো ও ইটন স্কুলের মধ্যে বড় আড়াআড়ি চলে। এক স্কুলের ছাত্রেরা ভাল হ'লে অন্যটীর অপমান হবে বোলে দুই দলেই প্রাণপণ শক্তিতে প্রধান হতে চেষ্টা করে। উভয় পাঠশালার ছেলেরাই নিজেদের মধ্যে সমাজ কোরে নানা বিষয় ল'য়ে পরস্পর তর্ক করে; আর কি বিদ্যাশিক্ষা, কি ব্যায়ামশিক্ষা সকল বিষয়েই আড়াআড়ি কোরে সাধ্যমত ভাল রূপ শিখে। আবার দুই স্কুলের মধ্যে ঐরূপ আড়াআড়ি থাকাতে প্রত্যেকটীরই খুব উন্নতি হয়। ঐ দুইয়ের ছাত্রদের মধ্যে ফি বছর নৌকাচালন, ও ক্রিকেট ইত্যাদি নানা প্রকার খেলা হয়ে থাকে। ঐ সকল খেলায় যে স্কুলের জিত্ হয়, সেইটী কোন রকম পুরস্কার পায়। এই জন্য উভয় স্কুলের শিক্ষকেরাই ছাত্রদিগকে লেখাপড়ার সঙ্গে ঐ সকল বিষয়ও শিক্ষা দিতে অত্যন্ত যত্ন লন।

হ্যারো, ইটন ও রাগ্‌বি স্কুলের মধ্যে ঐ রকম খুব আড়াআড়ি থাকিলেও, রাগ্‌বি স্কুলের ছেলেরাই সকলের চেয়ে ভাল। ইটন ও তার দেখাদেখি হ্যারোতেও খুব বড় মানুষদের ছেলেরা যায়। আর তোমরা জানই ত বেশী ধনী লোকদের ছেলেরা প্রায়ই বিদ্যায় গোবর্দ্ধন হয়। কাজেই ঐ দুই স্কুলের ছেলেরা লেখাপড়ার চেয়ে সাজগোজ ও আমোদ আহ্লাদে অধিক পটু হয়। আর অনেক পিতাও কেবল নামের জন্য ছেলেদের ঐ স্কুলে পাঠায়ে থাকেন।

রাগ্‌বি কিন্তু উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কি বিদ্যা, কি জ্ঞান, কি ব্যায়াম—সকল বিষয়ই ঐখানে উত্তমরূপে শিখান হয়। আর ঐ স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খুব ভাল শিক্ষক বোলে তিনি ছেলেদের লেখাপড়ার বড় যত্ন লন। তাঁর যত্ন ও আয়াসেই রাগ্‌বি স্কুল উত্তম নীতি ও নিয়মাদিতে সকলের প্রধান হয়ে উঠেছে। ঐখানে বালকেরা শিক্ষকদের সদাচরণের দ্বারা যথার্থ নীতি, ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বিদ্যা শিক্ষা পায়। তারা অতি সুন্দর নিয়মের অধীনে থাকে, সে জন্য ইংরেজ ভদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকেরা সকলেই প্রায় তাঁদের পুত্রদিগকে ঐ স্কুলে পাঠান। ঐ বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছেলেরাই বয়স হলে খুব বড় লোক হয়। আমাদের কলিকাতায়ও এখন সুনিয়মে চালিত দুই একটি স্কুল স্থাপিত হয়েছে ও আমাদের দেশের পিতা মাতারা যে ঐরূপ ভাল বিদ্যালয়ের আদর করিতে শিখিতেছেন এ বড় শুভ চিহ্ন বলিতে হইবে। কেন না, দেশের স্কুল ও স্কুলের ছাত্রদের শিক্ষা দেখেই দেশের উন্নতির কথা জানা যায়।

বিলাতের ইটন স্কুলের ছেলেরা যদিও বড় একটা লেখাপড়ার ভক্ত নয়, কিন্তু তাদের একটী বিশেষ গুণ এই যে, তারা পরস্পরের কাছে কখন মিথ্যা কথা বলে না ও পরস্পরকে ঠকান কি পরের দ্রব্যে হাত দেওয়াকে অতি ঘৃণার কাজ মনে করে। বালকদের মধ্যে কেহ কোন অভদ্র কাজ বা আচরণ করিলে সমস্ত ছেলেরা তাকে ঘৃণার চোকে দেখে। এই রূপে, অতি অল্প বয়স হ'তেই বালকেরা ভদ্র আচরণ ও ভদ্র আলাপে অভ্যস্ত

হয়; আর তারা অতি অল্প দিনেই নিজেদের দেখিতে শিখে। স্কুল ছেড়ে তারা যখন কলেজে যায়, তখন অন্যান্য পাঠশালার ছেলেদের চেয়ে তারা অধিক পরিমাণে আত্মনির্ভর করিতে পারে। ছেলেবেলায় স্কুলের স্বাধীনতায় অভ্যস্ত হওয়াতে কলেজের আরো বেশী স্বাধীনতা পেয়ে তাদের মাথা টলে যায় না।

আগেই বলেছি, রাগ্‌বি স্কুল ইটনের একেবারে উল্টা; ঐ পাঠশালার ছেলেরা বিদ্যাতেও যেমন পটু, খেলাতেও তেমনি মজবুদ। প্রাইজ্ বল, জলপানি বল—রাগ্‌বির ছাত্রেরাই সকলের উপর টেক্কা দেয়। আবার ক্রীড়াতেও তাহাদিগকে কেউ হারাতে পারে না। ক্রিকেট্, ফুট্‌বল, টেনিস্ ত তাদের পায়ের নীচে। তা ছাড়া, এমন দুই একটী খেলা আছে, যার নাম শুনলে তোমরা হেসে খুন হবে। একটা খেলার নাম—বাড়ী চুপান; ইংরেজ-বাচ্চা ছাড়া আর কোন লোকের ছেলেরা যে সে খেলায় আমোদ পায়, এমন ত বোধ হয় না। অনেক ছেলে মিলে একটা নালা কি ডোবায় গিয়ে, তিন চার দল হ'য়ে পাঁচ ছয় জন কোরে এক এক বারে তাতে ঝাঁপ দেয়। আবার উপরে লাফিয়ে ওঠে, আবার ঝাঁপ দিয়ে পড়ে—এই রকমে যত ক্ষণ না ছেলেদের কাপড় চোপড় কাদা জলে ভিজে জব্‌জবে হয়, ততক্ষণ তাদের খেলা সাঙ্গ হয় না। কেমন, ও খেলা তোমাদের পছন্দ হয়? ওদের মধ্যে আরও দুই একটা ঐ রকম আজ-গুবি খেলা আছে, আর এক দিন তোমাদিগকে সে কথা বল্‌বো।

ঠাকুরদাদার গল্প।

কয়েক দিন পরে আজ নবীন বাবু আপনার পাঠাগারে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার বালক শিষ্যগণ আসিয়া সে দিনকার গুড়গুড়ির প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিতে অনুরোধ করিল। তিনি আনন্দিত হইয়া বলিলেন "বেশ হইয়াছে, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে এই ঘরেই সুবিধা হইবে। কথাটি কিন্তু কঠিন, খুব মন দিয়া শুনিলে তবে বুঝিতে পারিবে।"
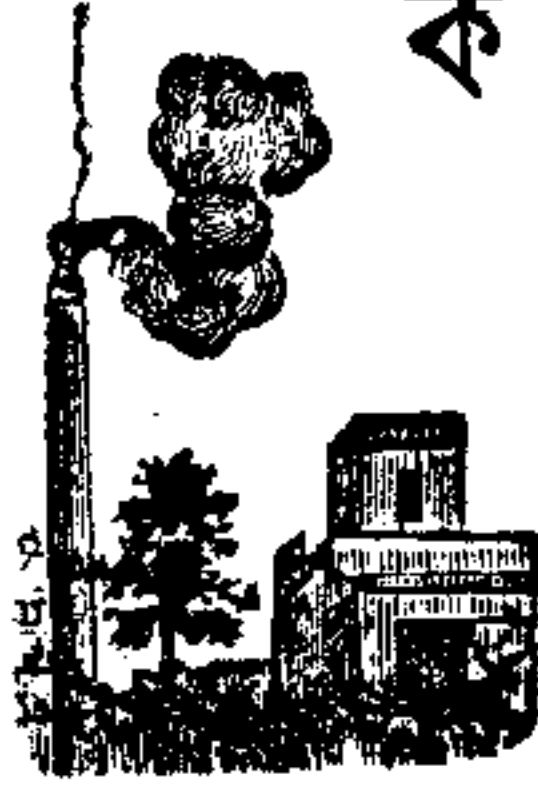
এই বলিয়া তিনি টেবিলের চারিদিকে বালক-দিগকে বসাইলেন। পরে একটী কাচের গেলাসে সরবৎ ঢালিয়া তাহাতে একটী কাচের নল রাখিলেন। "এখন এই সরবৎ কেমন করিয়া পান করিবে?" সকলেই বলিয়া উঠিল—"কেন নল দিয়া টানিলেই মুখে সরবৎ আসিবে।" নলিন বাবু তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া সেই নলটীতে মুখ লাগাইয়া টানিতে লাগিলেন ও বলিলেন,—"এই দেখ সরবৎ মুখে আসিতেছে।" এই রূপে আরও দুই একটী ছেলে

নল দিয়া সরবৎ পান করিল। তখন নবীন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "কেহ বুঝিতে পারিতেছ যে নলে টান দিলে গেলাসের সরবৎ কেন মুখে আসিতেছে? নলের ভিতর ত বায়ু আছে। টানে ঐ বায়ু মুখে যাইতেছে, কিন্তু নীচের জল কেন নলের মধ্যে উঠিতেছে?"

কেহই উত্তর দিতে পারিল না।

তখন নবীন বাবু বুঝাইতে লাগিলেন।—

"তোমরা জান যে বায়ুর ভার আছে। সাধারণতঃ এক বর্গ ইঞ্চ স্থানের উপর বায়ুর ভার ৭॥ সের।"

অমূল্য।—আজ্ঞা হাঁ, ইহা আমরা অনেক দিন শিখিয়াছি।

নবীন বাবু।—তাহার পর দ্বিতীয় কথা এই যে জল তরল পদার্থ। এ কারণ কোন পাত্রে রাখিলে ইহার উপরিভাগ সমান দেখা যায়—যেন এক খানি কাচ পড়িয়া আছে।

মাখন।—কিন্তু দাদা মহাশয়, বাতাস লাগিলে অমন সমান থাকে না। হাওয়াতে নদীতে ঢেউ হয় দেখিয়াছি।

নবীন বাবু।—ঠিক বলিয়াছ। জল তরল পদার্থ বলিয়াই তাহার উপরে চাপের কমী বেশী হইলে তাহার উপরিভাগ আর সেই রূপ সমতল থাকে না। যেখানে বেশী চাপ পড়ে, সেই থানটা নিচু হইয়া যায়। এই দেখ, সরবতের গেলাসের নলটী দিয়া ফুঁ দিয়া দেখ গেলাসের ভিতরের জল আর সমান থাকিবে না। যেখানে ফুঁ দিবে, সেখানে জল নীচু হইয়া যাইবে। যত জোরে বায়ুর চাপ দিবে, ততই জল নীচু হইয়া যাইবে।" এই বলিয়া (গ) গেলাস জলে পূর্ণ করিয়া (ক) কাচের নলটী তাহাতে রাখিলেন। তখন সকলকে দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ নলের ভিতরেও (খ) পর্য্যন্ত জল রহিয়াছে; অর্থাৎ গেলাসের ভিতরের জল ও নলের ভিতরের জল—দুইয়েরই উপরিভাগ সমতল ঐ এক (খ ঘ) রেখাতে। কারণ, নলের ভিতরের জলে বায়ুর যে পরিমাণ চাপ, বাহিরে গেলাসের জলের উপরিভাগেও
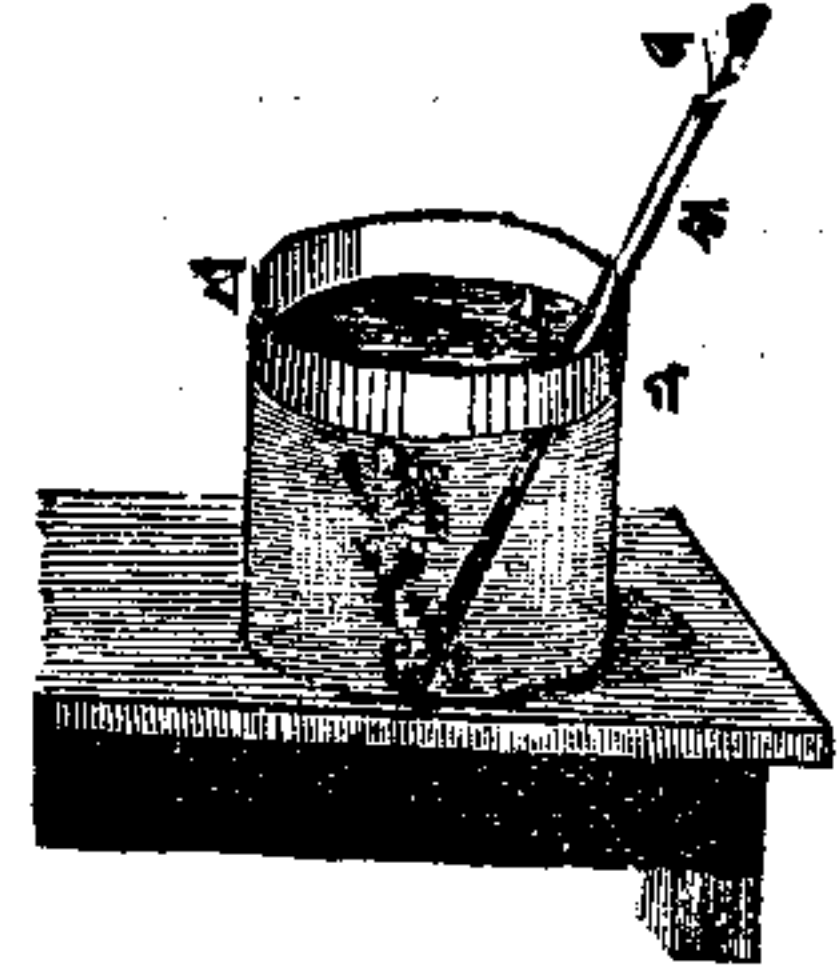
ঠিক সেই পরিমাণ বায়ুর চাপ। কোন প্রভেদ নাই; অর্থাৎ প্রতি ইঞ্চিতে ৭॥ সের।

কিন্তু তার পর যখন নলে ফুঁ দিতে লাগিলাম, তখন (ত) তীর চিহ্নিত পথে বায়ুর গতি হওয়াতে, নলের ভিতরকার (খ) চিহ্নিত স্থানের জল বেশী চাপ পাইয়া ক্রমে নীচু হইতে লাগিল এবং অবশেষে (ঙ) অর্থাৎ নলের মুখ পর্য্যন্ত পঁহুছিল। তখন কাজেই নলের মুখ দিয়া বায়ু বাহির হইয়া গেলাসের জলে প্রবেশ করিল ও বুড়্ বুড়্ বুড়্ বুড়্ করিয়া জলের উপর উঠিতে লাগিল। বুঝিতে পারিলে?

মন্মথ।—আজ্ঞা হাঁ—বেশ বুঝিয়াছি। এত দিন জানিতাম না যে, পুকুরের জল অমন সমান কাচের মত থাকে কেন। লোকে কথায় বলে,—জল উঁচু নীচু নয়, খোসামুদে মো সাহেবেরাই বলে, "জল উঁচু জল নীচু।" কিন্তু বাস্তবিক তাহার কারণ যে বায়ুর চাপ, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না।

নবীন বাবু।—এখন বেশ বুঝিতে পারিবে যে বায়ুর চাপ সমান বলিয়া জলের উপরিভাগ সমান

দেখায়। এ যে কেবল পুকুর, বা বাল্‌টী গেলা-সেই হয় এমন নহে। যে ভাবেই থাকুক না কেন, এক অবিভক্ত জলরাশির যে যে অংশ বায়ুর সমান চাপ পাইবে, সে সব স্থানই সমতল হইবে। এই দেখ (ক খ) একটী কাচের খালি বাক্স, তাহার উপরের ঢাকনীতে ১, ২, ৩, ৪, চারিটী ভিন্ন ভিন্ন রকমের কাচের নল লাগান আছে। এখন আমি ১নং নল দিয়া জল ছাড়িতেছি।
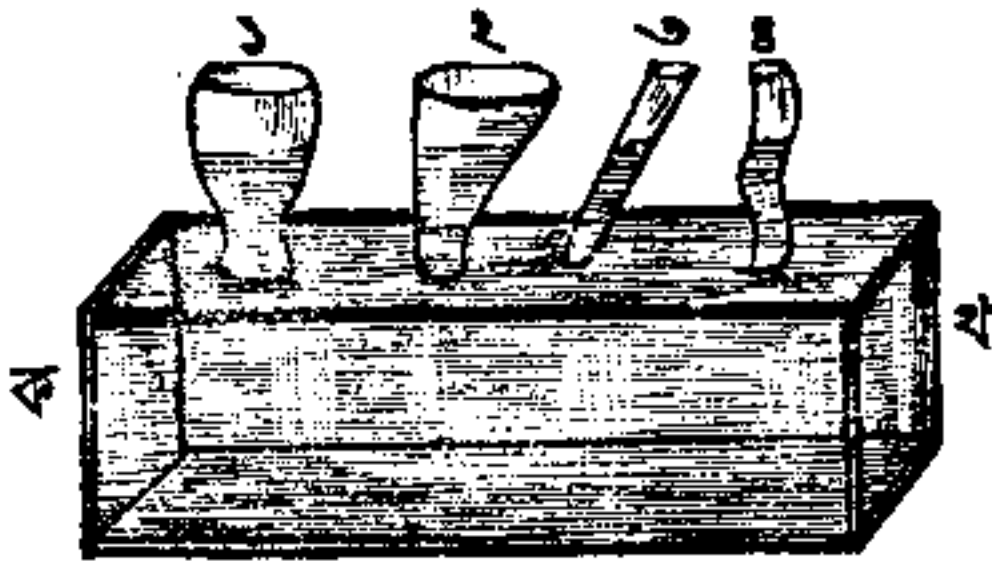
এই দেখ ক্রমে (ক খ) বাক্স পূর্ণ হইল। আরও ঢালিতেছি, ক্রমে জল নল চারিটাতে উঠিতেছে। কিন্তু দেখ চারিটী নলের মধ্যেই জলের উচ্চতা ঠিক সমান। ইহার কারণ কি?

দেবন।—আমি বলিতে পারি, দাদা বাবু।—নল চারিটী যতই কেন মোটা বা সরু বা ভিন্ন ভিন্ন আকারের হউক না, উহাদের উপরের মুখ খোলা থাকাতে তাহাদের ভিতর বাহিরের বায়ু আছে। এবং সেই জন্য তাহাদের ভিতরের জলের উপর ফি ইঞ্চে ৭॥ সেরের হিসাবে বায়ুর ভার রহিয়াছে। কাযেই সকল গুলির মধ্যে ঐ চাপ সমপরিমাণে থাকাতে তাহাদের ভিতরের জলের উচ্চতাও ঠিক সমান হইবে।"

নবীন বাবু।—বাঃ! ঠিক বলিয়াছ। আমি আজ বড় সন্তুষ্ট হইলাম। তোমরা বেশ যত্ন করিয়া শুনিতেছ। আমারও তাই খুব বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। আচ্ছা! এ পর্য্যন্ত তোমরা দুটী কথা শিখিলে। (১ম) বায়ুর চাপ (Atmospheric pressure) সমপরিমাণ হইলে, জলও সমভাবে অবস্থিতি করে। (২য়) বায়ুর চাপ কোন স্থানে বেশী হইলে, সেখানকার জল নীচু হইয়া পড়ে।

"এই বার তোমাদের আর একটি কথা বুঝিতে হইবে।" এই বলিয়া নবীন বাবু (ব) চিহ্নিত একটী কাচের চৌকোণা বাক্সে জল পুরিলেন, ও (ক খ গ ঘ) চারিকোণা এক খানি কাচ ঐ জলের উপরিভাগে রাখিলেন। ঐ কাচখানির মধ্যস্থলে একটী ছোট ছিদ্র (ছ) আছে। তাহাতে একটী নল (ন) লাগান।
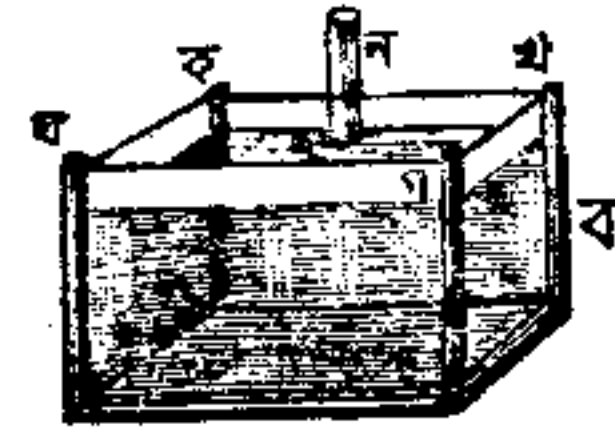
নবীন বাবু।—এই দেখ কাচখানি জলে কেমন ভাসিতেছে। কিন্তু যেমন উহাতে হাতের ঝোঁক দিয়া চাপিলাম, অমনি দেখ এই ছিদ্রটী দিয়া কেমন বেগে জল (ন) নলের মধ্যে উঠিতেছে। যেন ফোয়ারা! ইহার কারণ কি বলিতে পার?

মাখন।—বোধ হয় পারি। ঐ ছিদ্রের জলে সাধারণ বায়ুর চাপই ছিল, কিন্তু কাচখানির উপর জোরে ভর দেওয়াতে তাহার নিম্নস্থিত জলের উপর কাচখানির চাপ সাধারণ বায়ুভার (air-pressure) অধিক হইল। সুতরাং একই জলভাগের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চাপের কম বেশী হওয়াতে জল স্থির থাকিতে পারিল না। চারি দিকে কাচের চাপের আধিক্য বশতঃ ঐ অল্প চাপের পথ ছিদ্র দিয়া জল নলের ভিতর উঠিতে লাগিল।

নবীন বাবু।—বেশ মাখন, ঠিক বুঝিয়াছ। আশা করি, সকলেই বুঝিতে পারিয়াছ।

সকলে।—হাঁ পারিয়াছি।

নবীন বাবু।—আচ্ছা এখন তোমরা সকলেই বুঝিতে পারিবে—নলে মুখ দিয়া টানিলে গেলাসের সরবৎ কেন মুখে আসে। যখন সরবতের গেলাসে নলটী রাখিলাম, দেখ নলের ভিতরেও (গ) পর্য্যন্ত সরবৎ রহিয়াছে। অর্থাৎ গেলাস ও নল উভয়ের মধ্যস্থ তরল পদার্থ সরবৎ একই সমতল রেখা (গ ঘ)তে অবস্থিত রহিয়াছে। বল দেখি, চন্দ্রনাথ, কেন ?
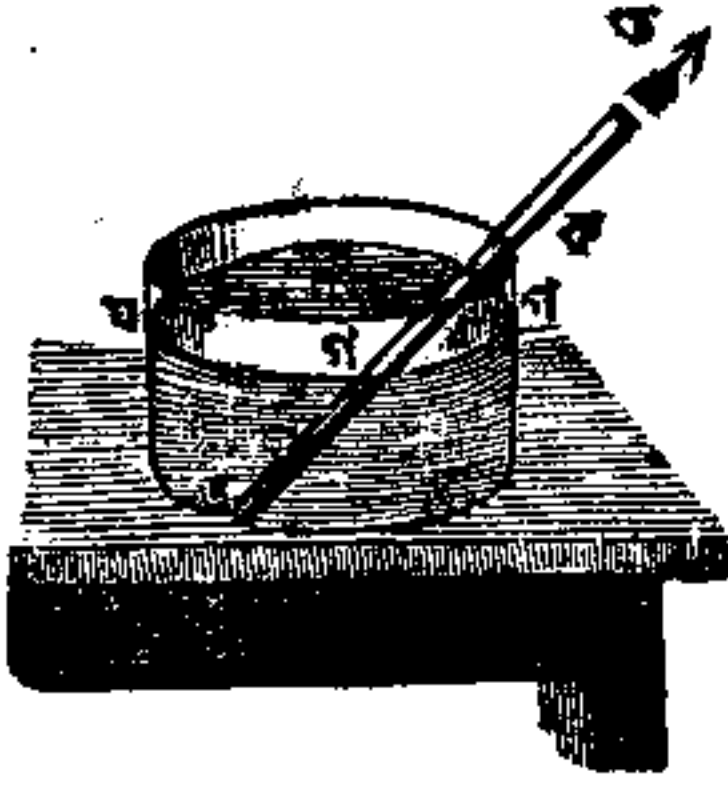
চন্দ্র।—কারণ, এখন গেলাসের জলে বায়ুর যে পরিমাণ চাপ রহিয়াছে, নলের ভিতরেও সেই বায়ু, অতএব তাহার ভিতরের জলেতেও সেই পরিমাণ চাপ।

নবীন বাবু।—হাঁ ঠিক বলিয়াছ, এতক্ষণ পর্য্যন্ত চাপের কিছু মাত্র তারতম্য হয় নাই। আচ্ছা, এখন যাহা বলিতেছি শুন। তার পর যখন জলে মুখ দিয়া টানিতে আরম্ভ করিলাম, তখন নলের মধ্যে (গ) পর্য্যন্ত যে বায়ু ছিল, তাহা টানের জন্য (ত) চিহ্নিত তীর-রেখার দিকে উঠিয়া আসিল। সুতরাং ঐ নলের মধ্যে বায়ুর যে পরিমাণ চাপ ছিল, তাহা কমিয়া গেল। কিন্তু নলের বাহিরে গেলাসের সরবতের উপরিভাগে বায়ুর সাধারণ চাপই রহিয়াছে। এখন দেখ, গেলাসের সরবতের অবস্থা কি হইল?—না, উহার উপরিভাগে সর্ব্বত্র ঠিক ৭॥ সেরের হিসাবে চাপ রহিয়াছে, কেবল একটী মাত্র স্থানে অর্থাৎ নলটীর মধ্যে চাপ তদপেক্ষা কম। সুতরাং অবিকল উপরি উক্ত ফোয়ারার মত ঘটিল। চারিদিকের চাপের আধিক্য বশতঃ, সরবৎ তরল বলিয়া ঐ নলের মধ্যে উঠিতে লাগিল, এবং ক্রমে মুখে গিয়া পঁহুছিল। তখন যতই টান, ততই যায়। আরও টান, আরও যাইবে। অবশেষে গেলাস খালি হইয়া যাইবে ও পেট ভরিয়া যাইবে।

দেবন।—দাদাবাবু, আমাদের সরবৎ খাওয়ার কথা ত বুঝিলাম। আপনার তামাক খাওয়ার কথা ত বুঝিলাম না ?

নবীন বাবু।—আজ এই পর্য্যন্ত থাকুক, বেশ মন দিয়া ইহা আরও বুঝিতে চেষ্টা কর। আর এক দিন গুড়গুড়ির কথা বুঝাইয়া দিব। আজ মোটামুটি এই কয়টী কথা স্মরণ রাখিও যে—

(১) চাপের তারতম্য না হইলে, জল সমতল থাকে।

(২) চাপ কোন স্থানে বেশী হইলে, জল নীচু হয়।

(৩) চাপ কোন স্থানে কম হইলে, জল উঠে।

এখন গুড়গুড়ীর কথা হয় ত আপনারাই বলিতে পারিবে।

পর্ব্বতারোহণ।

কোন উচ্চ স্থানে উঠিতে হইলে বিলক্ষণ কষ্ট বোধ হয়। পর্ব্বত কত উচ্চ! সুতরাং উহাতে আরোহণ করাও কিরূপ শ্রমসাধ্য, তাহা তোমরা সহজেই অনুভব করিতে পার। পর্ব্বতারোহণে অভ্যস্ত পার্ব্বতীয় লোকেরা সহজেই বড় বড় মোট মাথায় করিয়া পর্ব্বতের উপর উঠিয়া যায়। এ সম্বন্ধে "সখায়" তোমরা "বালিকার হিমালয় ভ্রমণ" শীর্ষক প্রবন্ধে অনেক কথা পড়িয়াছ। সমতলপ্রদেশ বাসিগণ পর্ব্বতভ্রমণে যাইয়া প্রায়ই ঝুলির মধ্যে বসিয়া উপরে উঠেন। উপরের চিত্র দেখিলে বেশ বুঝিতে পারিবে যে ব্যাপারটী কিরূপ ভয়ানক। চতুর্দ্দিকে ছোট ও বড় বড় গাছের ভয়ানক জঙ্গল, তাহার মধ্য দিয়া পথ, সেই পথে ডাণ্ডিদের ঘাড়ে ঝুলির মধ্যে বসিয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে হয়। এত কষ্ট করিয়া উপরে একবার উঠিতে পারিলে, তবে পর্ব্বতের শোভা দেখিয়া সমস্ত শ্রম সার্থক মনে হয়।

একটি চন্দনা পাখি।

একদিন কলিকাতার গোল দিঘির নিকট দিয়া যাইতেছিলাম, দেখিলাম পুষ্করিণীর পাশে অনেকগুলি লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছে, আর দুই জন লোক সেই ভিড়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কি একটা বিষয় লইয়া পরস্পর আস্ফালন করিয়া বিবাদ করিতেছে। কলিকাতার রাস্তায় অতি সামান্য কারণেও—এমন কি, বিনা কারণে বলিলেও চলে—এরূপ ভিড় প্রায়ই হইয়া থাকে, সুতরাং প্রথমে সে দিকে ততটা মনোযোগ না করিয়াই চলিয়া যাইতেছিলাম। কিন্তু এমন সময় শুনিতে পাইলাম, কলহকারীদের মধ্যে এক জন গলাবাজি করিয়া স্পর্দ্ধার সহিত বলিতেছে,—"পাখি তোর? পাখির গায়ে তোর নাম লেখা আছে—নয়?" বুঝিলাম, একটি নিরীহ পাখি লইয়া বিবাদ উপস্থিত। কলহকারীদের দিকে একটু অগ্রসর হইলাম। বিবাদের কারণ জানিতে ইচ্ছা করায়, সেখানে দণ্ডায়মান একটি ভদ্রলোক বলিলেন,—"দিঘির পাশে ঐ গাছটায় পাখিটি এসে ব'সেছিল। ভাল উড়্‌তে পারে না। এই লোকটা পাখিটি ধ'রেছে।" বলিয়া, পাশে আর একটি লোকের দিকে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া বলিলেন,—"এই লোকটি বলিতেছে,—'পাখিটি আমার; উড়িয়া আসিয়াছে।' দুজনেরই সমান জিদ, কেহ পাখিটি ছড়িতে চাহে না।" তাঁহার এই কথা শেষ হইতে না হইতেই চাহিয়া দেখি, তাহারা দুই জনে পাখিটি লইয়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিয়াছে। টানাটানিতে পাখিটি এখনই মরিয়া যাইবে ভাবিয়া আমরা তাড়াতাড়ি তাহাদিগকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পাইলাম। আমাদের অনুনয় বিনয়ে তাহারা একটু থামিল। তখন, যাহার হাতে পাখিটি ছিল, তাহাকে মিনতি করিয়া বলিলাম,—"সুখী প্রাণী—ম'রে যাবে, পাখিটিকে একটু আল্‌গা ক'রে ধর, বাবু! ততক্ষণ না-হয় আমাদের হাতেই পাখিটী দাও।" কিন্তু আমাদের হাতে কি দিবে? বাহির করিতেই দেখি,—আ হা হা! একটি সুন্দর চন্দনা পাখি—টানাটানিতে পাখিটি মরিয়া গিয়াছে!—চোকের পাতাটি পড়িয়া গিয়াছে, ঘাড়টি লট্‌কিয়া পড়িয়াছে!—হায়, নির্ব্বোধ! নিষ্ঠুর! তোমরা এ কি করিলে! অকারণ একটি ক্ষুদ্র জীবের প্রাণনাশ করিয়া তোমাদের কি লাভ হইল!

আহা! ইহাদের যে কোন একজন একটু ধীরতা অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলেই ত পাখিটি আর মরিত না। যে, পাখিটি ধরিয়াছিল, পাখিটিকে মারিয়া তাহার কি লাভ হইল? আর পাখিটি নিজের বলিয়া যে দাওয়া করিতেছিল, একটু স্থির হইয়া বিবেচনার সহিত কাজ করিলে পাখিটি সে ফিরিয়া পাইতেও ত পারিত। না পাইলেও, তাহার ভালবাসার পাখিটি ত যাহার কাছে হউক, এক জনের কাছে গিয়া বাঁচিয়া থাকিত। বালক বালিকাগণ! ছোট পাখিটির কথা কি তোমাদের মনে থাকিবে? তোমরা যেন কখন এমন নির্ব্বোধ ও নিষ্ঠুরের মত কাজ করিয়া অনুতাপগ্রস্ত হইও না।

দুই বোন।

বিমলা, নলিনী—দুটি বোন,
দুটি বোন দেখিতে সুন্দর,
ব'সেছিল সন্ধ্যায় দুজন
উঠানেতে ঘাসের উপর।

অস্তগামী রবির কিরণ
প'ড়েছিল দুজনার গায়,
দুজনার মনোহর রূপ
দশ গুণ হ'য়ে শোভে তায়।

আলতায় হাত খানি রাঙা,
তায় রাঙা রবির কিরণ,
বিমলা হাতের পানে চায়,
গরবেতে ফুলে উঠে মন।

নলিনীরে কহে,—"দেখ, বোন!
কি সুন্দর হাতটি আমার;
তোমার হাতের চেয়ে মোর
ঢের বেশী হাতের বাহার।"

হেন কালে আসিল তথায়
শীর্ণকায় অন্ধ এক জন,
দুইটি মেয়ের সাড়া পেয়ে
ডেকে বলে কাতর বচন।—

"কাল হতে আছি উপবাসী,
ট'লে পড়ি চলিয়া যাইতে,
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ফাটে ছাতি,
এক মুঠা দাও মা খাইতে।"

বিমলা বেজার হ'য়ে বলে,—
"মিছে গোল করিও না আর,
যাও চ'লে, আমরা বসি নে
হাতে ক'রে তোমার খাবার।"

নলিনী পাইল ব্যথা শুনি'
তাড়াতাড়ি ছুটে গেল ঘরে,
মার কাছে চাহিয়া খাবার
এনে দিল ভিখারির করে।

বালক বালিকা, চিনিলে ত
হাত দুটি বালিকা দুটির,
বল ত সুন্দর হাত কার—
বিমলার কিম্বা নলিনীর?

ধাঁধা।

১। বনতরু, মধুবন, দেবব্রত—এই তিনটি শব্দের সহিত কোন্ শব্দটি যোগ করিয়া, কোন্টির নীচে ক্রমান্বয়ে কোন্টি লিখিয়া যাইলে, ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ পংক্তি পড়িলেও যাহা পাইব, প্রত্যেক পংক্তির ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বর্ণগুলি পর পর পড়িয়া গেলেও তাহাই পাইব?

২। ভারতেরই—সে কালের একটি মুনির নাম, এ কালের একটি জেলার নাম, আর একটি প্রসিদ্ধ নদীর নাম—তিনটিই তিন তিন অক্ষরের—কোন্ তিনটি নামকে, কোন্টির পর কোন্টি লিখিয়া সাজাইলে, ১ম, ২য়, ৩য় পংক্তি পড়িতেও যাহা হইবে, প্রতি পংক্তির ১ম, ২য়, ৩য় অক্ষরগুলি পর পর পড়িয়া গেলেও তাহাই হইবে?

৩। তিন বর্ণে নাম তার স্থান মধ্যে গণি,
আদ্য বর্ণ ছেড়ে দিলে ফল অনুমানি।
মধ্য ত্যাগে পশুদের সমষ্টি বুঝায়,
শেষ বর্ণ ত্যাগে তাহা পত্র মধ্যে যায়।
পুরাণে বর্ণিত আছে দুর্গম সে স্থান,
কি নাম তাহার, শিশু, কর অনুমান।

সখা
একাদশ ভাগ। ৪র্থ সংখ্যা।
এপ্রিল, ১৮৯৩।
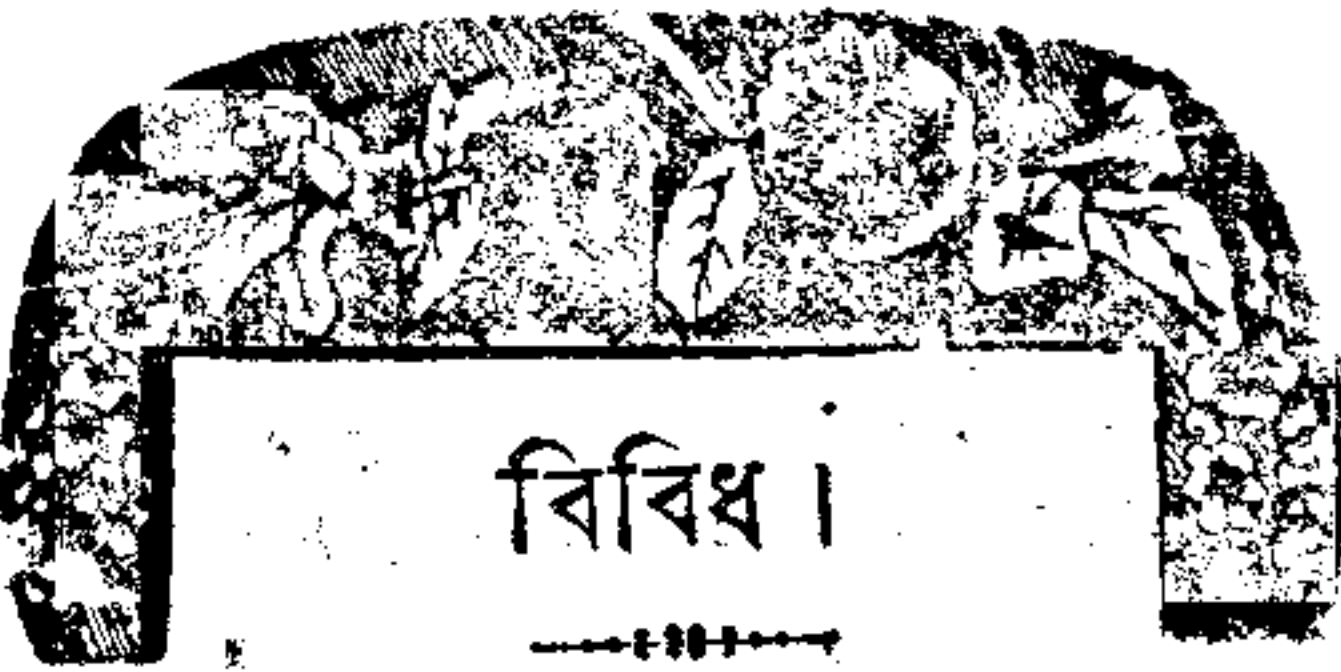
বিবিধ।

১৩০০ সাল।—তোমাদের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় বোধোদয়ে পড়িয়াছ,—"মুসলমানেরা মহম্মদের মক্কা হইতে পলায়নের দিবস অবধি, এক শাকের গণনা করেন, উহার নাম হিজিরা। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ মোগল সম্রাট আকবর, হিজিরা নামের পরিবর্ত্তে, ঐ শাককে ইলাহী নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। উহাই বাঙ্গালাদেশে সাল নামে প্রচলিত হইয়াছে।"—এ বৎসর আরম্ভেই এই শাকের একটি শতাব্দী পূর্ণ হইয়া গেল। আজ একশত বৎসর সালের সহিত "বার শ" কথাটা জড়াইয়াছিল, এ বৎসর সেই "বার শ" কথাটা বিদায় লইল। আজ যাঁহারা তের শ সাল পূর্ণ হইতে দেখিলেন, তাঁহাদের কয় জন চৌদ্দ শ সাল পূর্ণ হইতে দেখিবেন বল দেখি? কিন্তু শিশুকাল হইতে সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে শিখিলে, পরিণামে তোমরা সুখী ও কীর্ত্তিশালী হইয়া জীবন কাটাইতে পারিবে; এমন কত শতাব্দী চলিয়া গেলেও তোমাদের নাম লোকে ভুলিবে না।

অনাথশিক্ষায় দান।—কলিকাতা সিন্দুরিয়াপটি নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মণিলাল মল্লিক গবর্ণমেণ্টের হস্তে বত্রিশ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। এই টাকার সুদ হইতে অনাথ বালকদিগের শিক্ষার বন্দোবস্ত হইবে। দাতার উদ্দেশ্য অতি মহৎ।

* * *

কিনেটোগ্রাফ্।—ফটোগ্রাফে যে কোন বস্তুরই কেমন সুন্দর প্রতিকৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা তোমরা জান। আবার, ফনোগ্রাফে কথাবার্ত্তা, গীতবাদ্য প্রভৃতির শব্দগুলি যে অবিকল মুদ্রিত হইয়া যায়, এবং মানুষ ইচ্ছামত যে কোন সময়ে সেগুলি পুনরায় শুনিতে পারে, তাহাও তোমরা সখায় পড়িয়াছ। আমেরিকানিবাসী সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এডিসন্ সাহেব এই শেষোক্ত ফনোগ্রাফ্ যন্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা। কিছুদিন হইল আবার ইনি এক অদ্ভুত যন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। এই যন্ত্রের নাম কিনেটোগ্রাফ্। কিনেটোগ্রাফে, ফটোগ্রাফ্ ও ফনোগ্রাফ্ এ দুয়েরই কাজ একত্রে অতি অল্প সময়ের মধ্যে হইয়া যায়। এক জায়গায় বক্তৃতা কি যাত্রা হইতেছে, একটা কল সেথা লইয়া গেলে, ঘরে ফিরিয়া আসিয়া তুমি সভার অবিকল দৃশ্য সকলকে দেখাইতে এবং বক্তৃতা বা গীতবাদ্যাদি সকলকে শুনাইতে পারিবে। সকলে দেখিবেন যে, চক্ষের সম্মুখেই সেই বক্তৃতা বা নৃত্যগীতাদি হইতেছে।

তোমরা মনে করিতেছ ফটোগ্রাফে ত সমস্ত বস্তুর প্রতিরূপগুলি ছোট ছোট হইয়া উঠে, সুতরাং মনুষ্যাদির মূর্ত্তিগুলি সুস্পষ্ট ও বড় বড় না দেখাইলে ইহাকে প্রকৃত বক্তৃতার স্থল কি যাত্রার আসর বলিয়া বোধ হইবে কেন? কিন্তু সে সন্দেহটি তোমাদের আদৌ করিবার প্রয়োজন নাই। এডিসন্ সাহেব বৈজ্ঞানিক কৌশলে প্রস্তুত আলোকের সাহায্যে এই সকল কৌতুক দেখান। তাহাতে ছোট ছোট অস্পষ্ট ফটোগ্রাফের ছবিগুলিও স্পষ্ট ও বড় বড় হইয়া ঠিক আসলেরই মত হইয়া প্রকাশ পায়। এক প্রকার পরকোলার সাহায্যেও এ কার্য্য হইয়া থাকে কিন্তু এডিসন্ সাহেব পরকোলার পরিবর্ত্তে এই আলোকেরই ব্যবহার করেন। বিজ্ঞানবলে জগতে কি অদ্ভুত কার্য্যই না সম্পন্ন হইতেছে!

ঠাকুরদাদার গল্প।

[ভ্রম-সংশোধন:—গত বারের সখার ৪৪ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভে ১৯শ পংক্তিতে "বায়ুভার (air-pressure)" স্থলে "বায়ুভার (air-pressure) অপেক্ষা" পড়িতে হইবে।]

কয়েক দিন অবধি অতিশয় গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। রৌদ্রের তেজে সারাদিন পৃথিবী যেন ফাটিয়া যাইতেছে। আজ সন্ধ্যাবেলা নবীন বাবু ছাতে বসিয়া স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিতেছেন। এমন সময় তাঁহার শিষ্যদল আসিয়া উপস্থিত। সকলে প্রণাম করিয়া নিকটে উপবেশন করিলে পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন হে! এখন কেহ কি বলিতে পার আমরা তামাক খাই কেমন ক'রে? কলকের তামাক, গুড়গুড়ীর জল ফুঁড়িয়া তাহার ধুঁয়া মুখে আসে কেন বলিতে পার?"
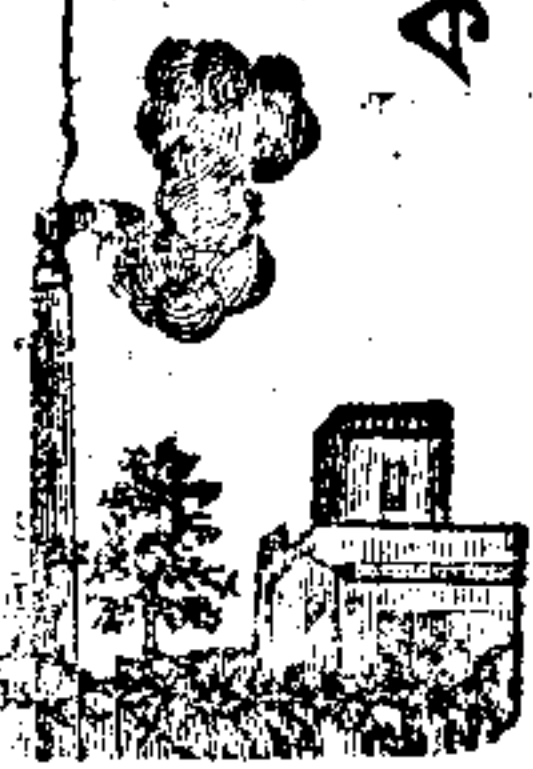
মাখন।—আজ্ঞা হাঁ, আমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছি। আমি বলিয়া যাই, আপনি দেখুন ঠিক হয় কি না?—(এই বলিয়া নিম্নস্থ ছবিটির মত আঁকিল)। মনে করুন (গ) গুড়গুড়ী; তাহাতে (জ) পর্য্যন্ত জল আছে। (ক) হইতে আরম্ভ করিয়া গুড়গুড়ীর খোলের ভিতরেও (খ) পর্য্যন্ত নলচে আছে। ইহার উপরিভাগে (ক) কলিকে ও নিম্নের মুখ (খ) জলে কিছু দূর অবধি ডুবিয়া আছে। গুড়গুড়ীর (প) ছিদ্রে (ন) নল লাগান আছে। তাহার অগ্রভাগে (ম) মুখ দিয়া টানিতে হয়।
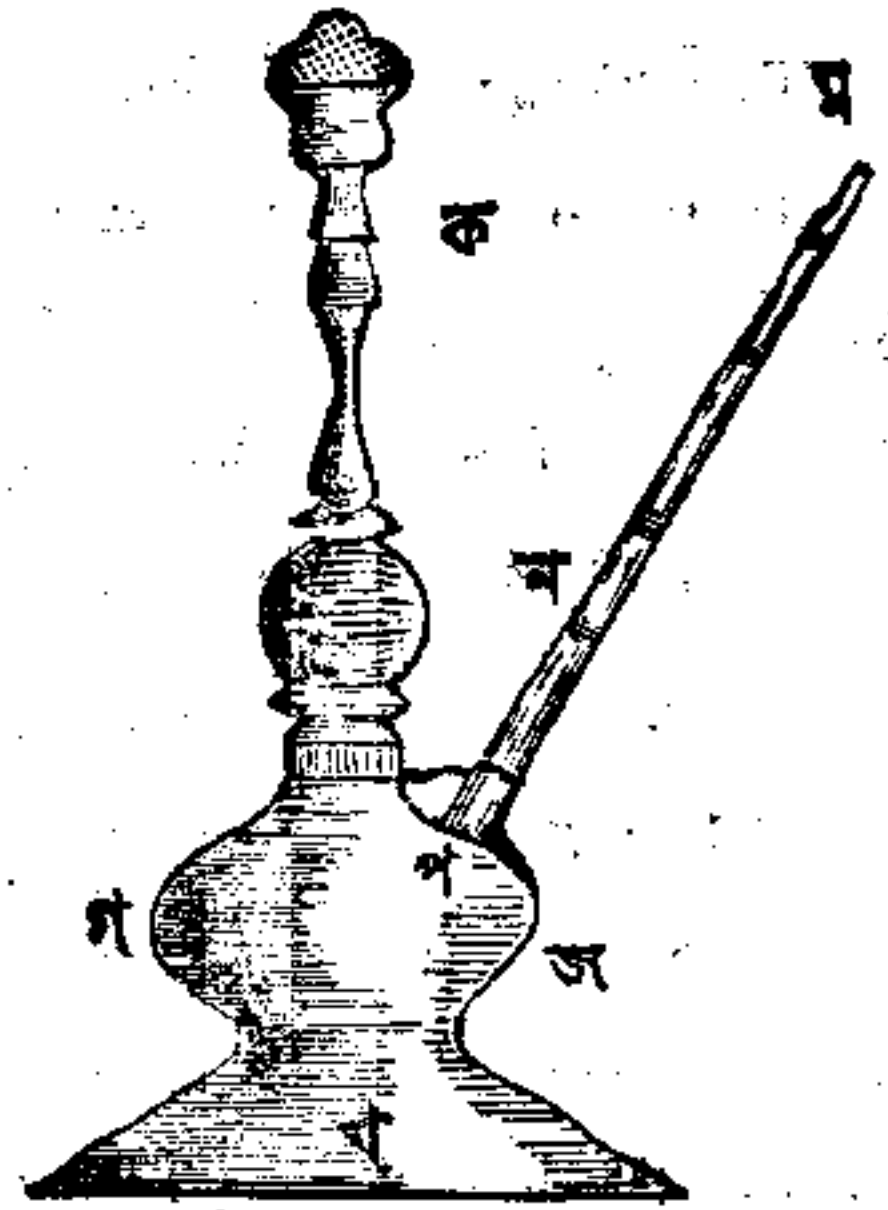
আচ্ছা, এখন এই কলটির অবস্থা কিরূপ আগে দেখা যা'ক। (ম) মুখ খোলা থাকাতে (ন) নলের মধ্যে (প) পর্য্যন্ত সাধারণ বায়ুতে পূর্ণ। গুড়গুড়ীর ভিতরেও (জ) পর্য্যন্ত সাধারণ বায়ু রহিয়াছে। আবার (ক খ) নলিচাটিও সাধারণ বায়ুতে পরিপূর্ণ। কেবল উহার নীচের

যতটুকু অংশ (জ) পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া আছে, ততটুকু অবধি জল আছে। অর্থাৎ (থ) হইতে (জ) রেখা পর্য্যন্ত নল্‌চের ভিতর জল আছে।

নবীন বাবু।—ঠিক বলিয়াছ। বল দেখি অমূল্য, কেন নলিচার (থ জ) অংশের ভিতরটাও জলে পূর্ণ থাকিবে?

অমূল্য।—সে দিন ইহার কারণ শিখিয়াছি। সমস্ত (জ) রেখার উপর সাধারণ বায়ুর ভার থাকাতে এবং নল্‌চের ভিতরেও সাধারণ বায়ু আছে বলিয়া, উহার ভিতরকার জলের উচ্চতাও ঐ (জ) রেখা পর্য্যন্ত হইবে। অর্থাৎ—

(১) নলিচার ভিতরে বায়ুর চাপ	=	সাধারণ বায়ুভার— প্রতি ইঞ্চ ৭॥ সের।
(২) নলিচার বাহিরে (জ) রেখাস্থ জলের উপর বায়ুর চাপ	=	ঐ ঐ

সুতরাং নলিচার ভিতরেও জলের উচ্চতা (জ) রেখা পর্য্যন্ত। কারণ চাপের সমতা থাকিলে জলও সমান উচ্চ হয়।

মাখন।—ঠিক ঠিক! এইটুকু বুঝিলেই সব বুঝা যাইবেক। এইটুকু ইহার আসল কথা। আচ্ছা, তার পর যখন (ন) নলের (ম)তে মুখ দিয়া টানা যায়, তখন নলের ভিতরের বায়ু আকৃষ্ট হইয়া মুখে যায়। সুতরাং (ম) হইতে (জ) অবধি যে বায়ুভাগ, তাহা লঘু হইয়া যাওয়াতে (জ) রেখাস্থিত জলের উপর তাহার ভার হ্রাস হইয়া যায়।

কিন্তু অপর দিকে (ক থ) নল্‌চের মধ্যস্থ বায়ুর চাপ সাধারণ বায়ুভারের সমানই আছে। অতএব কি হইল?—না—

(১) নলিচার ভিতরের বায়ুর চাপ	=	সাধারণ বায়ুভার— প্রতি ইঞ্চ ৭॥ সের।
(২) নলিচার বাহিরে (জ) রেখাস্থ জলের উপর বায়ুর ভার	=	সাধারণ বায়ুভার অপেক্ষা কম।

অতএব নলিচার ভিতরে বায়ুর চাপ অপেক্ষাকৃত অধিক হওয়াতে তন্মধ্যে যে জলটুকু ছিল, তাহা নীচু হইয়া নামিয়া আসিল। যেন ঐ নলিচার ভিতরের ভারি বায়ু ঐ জলটুকুকে ঠেলিয়া নামাইয়া দিল ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নামিতে লাগিল। যেই নলিচার মুখ (থ) পার হইল, অমনি নলিচার ভিতরের কিয়ৎ পরিমাণ বায়ু গুড়গুড়ীর জলের মধ্যে প্রবেশ করিল ও বুড়্ বুড়্ বুড়্ বুড়্ করিয়া (জ) রেখার উপরে উঠিয়া আসিয়া তথাকার বায়ুতে মিশিয়া গেল। আবার নলের টান থামিবামাত্র (প জ) স্থানের বায়ুর চাপ সাধারণ বায়ুভারের (Atmospheric pressure) সমান হইয়া যায় এবং গুড়গুড়ীর ও নলিচার বায়ু ও জলের অবস্থা আবার পূর্ব্ববৎ হয়।

নবীন বাবু।—ও রে মধু! তামাক দে বা।

মাখন।—এইরূপে প্রতি টানেই হইতে থাকে। প্রতি টানেই গুড়গুড়ীর ভিতরের (প জ) স্থানের বায়ু নল দিয়া আকৃষ্ট হইয়া মুখ দিয়া বাহির হইয়া আইসে ও তৎপরিমাণ বায়ু নলিচার মধ্য হইতে জলটুকুকে তাড়া করিয়া গুড়গুড়ীর জল ভেদ করিয়া নলের ভিতর আসে।

এমন সময় মধু চাকর বাবুর গুড়গুড়ীতে তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল। নবীন বাবু ছটি চক্ষু মুদিয়া নল টানিতে লাগিলেন। মাখনকে বলিলেন,—"এ ত হ'ল, তবে ধুঁয়া আসে কি রূপে?

মন্মথ।—এ আর আশ্চর্য্য কি দাদাবাবু!—মাখন দাদা যেরূপ বলিলেন, ঐরূপে ক্রমে নলিচার ভিতরের বায়ু নল দিয়া মুখে আসিতে থাকে। কিন্তু নলিচার মুখে কলিকা ও তাহার ভিতর তামাক ও তদুপরি আগুন থাকাতে, নলিচার ভিতর

যে বায়ু যাইতেছে, তাহা কলিকার মধ্যস্থ তামাকের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। ঐ তামাকের উপর আগুন থাকায় উহার তেজে তামাকের রস ধূঁয়া হইতেছে ও সেই ধূঁয়া বায়ুর আকারে নলিচা হইতে জলের ভিতর দিয়া নলে, ও তথা হইতে মুখে পঁহুছিতেছে।

নলিন।—এ বিষয়টা ত বেশ শিখিলাম। কিন্তু একটা কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, দাদাবাবু বলিয়া দিন-না?

নবীন বাবু।—কি কথা?

নলিন।—আমার জানিতে ইচ্ছা হয় যে, তামাক খাওয়ায় উপকার কি? লোকে কি জন্য তামাক খায়? আমার তো তামাকের গন্ধ সহ্য হয় না, কাশি আসে, গা বমি বমি করে। আমি বুঝিতে পারি না কেন লোকে তামাক খায়।

নবীন বাবু।—এ কথা যদি জিজ্ঞাসা কর ত আমাকে লজ্জা পাইতে হইবে। কেন না, তামাক একটা নেশা বৈ আর কিছুই নয়। তামাকের উপকার কিছুই নাই বলিলেও হয়, অপকারিতা বিস্তর। তামাকে "নিকোটিন" নামে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ আছে, তাহাতে শরীরের অনিষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন, তামাক খাইতে নানা আড়ম্বর, বৃথা সময় ও অর্থ ব্যয় হয়। তামাকের কারণে নানাবিধ রোগেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। তামাক ভাল জিনিস নহে।

চন্দ্রনাথ।—তবে, দাদা বাবু, আপনি কেন তামাক খান? ইহার "নিকোটিন" বিষে ত আপনারও শরীর খারাপ করতে পারে?

নবীন বাবু।—আমরা বুড়া মানুষ, অনেক দিন অবধি অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছে, কষ্ট বা পরিশ্রমের পর এক ছিলিম তামাক খাইলে অনেকটা আরাম বোধ হয়, এই মাত্র।

নগেন।—না দাদা মশাই, তা হবে না। যা মন্দ তা আপনি কেন কর্‌বেন। তামাক খেলে যদি শরীর খারাপ হয়, ইহাতে যদি এত দোষ, তা হ'লে কেবল একটু আরাম বোধ হয়—কেবল অনেক দিনের অভ্যাস—বলিয়া আপনি খাইবেন, তাহা হইতে পারে না। আপনাকে তামাক খাওয়া ছাড়িতে হইবে।

সকলের অনুরোধে শেষে নবীন বাবু পরাস্ত হইলেন। এই ন্যায্য অনুরোধ তাঁহাকে শুনিতে হইল। সেই দিন অবধি তিনি তামাকু সেবন করা পরিত্যাগ করিলেন। বালকগণ পরমাহ্লাদিত হইয়া দাদাবাবুর প্রশংসা করিতে করিতে বাড়ী গেল।

নেকড়ে বাঘ ও মেষপালক।

এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতের পার্শ্বে কোন বনে একটা নেকড়ে বাঘ বাস করিত। বয়স বেশি হওয়ায় বড়ই দুর্ব্বল ও অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া, শিকার দ্বারা আপনার প্রাণধারণ করা সে এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াই বুঝিয়াছিল। ক্রমাগত অনাহারে ক্লিষ্ট হইয়া, একদিন সে মনে মনে স্থির করিল, নিজের শক্তিতে ত আর কিছু হয় না। এখন মেষপালকদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া যদি তাহাদের নিকট হইতে দুই একটা করিয়া মেষ সংগ্রহ করিতে পারি,

তবেই প্রাণরক্ষা হয়। মেষপালকগণ এক সময় আমার অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এখন আমাকে তাহারা বৃদ্ধ ও অক্ষম বলিয়া না বুঝিতেও পারে। সুতরাং আমি স্বয়ং গিয়া যদি এখন তাহাদের নিকট এই প্রস্তাব করি, তাহা হইলে তাহারা, বোধ হয়, সহজেই ইহাতে সম্মত হইবে। অতএব মেষপালকদের সহিত সাক্ষাৎ করাই এখন আমার শ্রেয়ঃ বোধ হইতেছে। নেকড়ে মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, বন হইতে ধীরে ধীরে বহির্গত হইল।

কিয়দ্দূর গিয়া, একটি মেষপালকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে, সে মেষপালককে বলিল,—"ভাই মেষপালক, তুমি মনে করিতেছ, আমি অতি দুর্বৃত্ত ও হিংস্র; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। তুমি নিশ্চয় জানিও, আমি কেবল ক্ষুধার্ত্ত হইলেই মেষবধ করিয়া থাকি; ক্ষুধার জ্বালা কে সহ্য করিতে পারে? কিন্তু, তুমি আমাকে এই ক্ষুধার যন্ত্রণা হইতে রক্ষা কর—পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাইতে দাও, দেখিবে, আমার বিষয়ে নিন্দা করিবার আর তুমি কিছুই খুঁজিয়া পাইবে না। সত্যই বলিতেছি ভাই, আমাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, আমার ন্যায় সৎ ও নিরীহ জন্তু অতি অল্পই আছে।"

মেষপালক বলিল,—"কি বলিলে, 'পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার দিয়া' পরীক্ষা করিব? ভাল কথা বটে, কিন্তু পালের সমস্ত মেষগুলি দিলেও ত তোমার পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে না! আমার পরীক্ষার প্রয়োজন নাই, তুমি অবিলম্বে এ স্থান হইতে প্রস্থান কর।'

ইহা শুনিয়া, নেকড়ে হতাশ হইয়া অপর এক জন মেষপালকের নিকট উপস্থিত হইল। এবং তাহাকে কহিল,—"ভাই মেষপালক! তুমি জান, আমি সংবৎসরের ভিতর তোমার অনেকগুলি মেষ সংহার করিতে পারি। এক্ষণে, তুমি যদি আমাকে বার মাসে বারটি মাত্র মেষ দাও, তাহা হইলে, আমি তোমার মেষগণকে যে আর কখনও আক্রমণ করিব না, তোমার সহিত এরূপ বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত আছি। বিবেচনা করিয়া দেখ, এরূপ করিলে, আমা হইতে তোমার আর কিছুই অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকিবেনা; তুমি নির্ভাবনায় মেষচারণ করিতে পারিবে।"

মেষপালক কহিল,—"কি! বারটি মেষ?—তাহা হইলে, আমার মেষগুলি যে সমস্তই

প্রায় তোমাকে দিয়া যাইতে হয় দেখিতেছি!"

নেকড়ে কহিল,—"আচ্ছা ভাই, তোমার সহিত স্বতন্ত্র কথা—তুমি না হয় ছয়টি দিও।"

মেষপালক উত্তর করিল,—"তুমি কৌতুক করিতেছ না কি? আমি যে আমার ঠাকুরকেও বৎসরে ছয়টি দিই না।"

নেকড়ে বলিল,—"ভাল, চারিটি দিতে স্বীকৃত আছ? দেখ, তাহা হইলেও না হয় বন্দোবস্ত করিয়া ফেলি।"

মেষপালক ঘাড় নাড়িয়া আপনার অসম্মতি জানাইল। তখন নেকড়ে পুনরায় বলিল,—"ভাল, তিনটা দাও?—দুইটা?—তাও নয়?"

মেষপালক উত্তর করিল,—"না, একটিও দিতে পারি না। তুমি আমার মেষগণের চিরশত্রু; সুতরাং আমারও শত্রু। তোমার সহিত আবার বন্দোবস্ত কিসের? আমি অলস নহি, স্বচ্ছন্দে আপনার মেষ রক্ষা করিতে পারিব।"

নেকড়ে নিষ্ফল হইয়া মনে মনে ভাবিল,—কোন কাজই একবারে সুসিদ্ধ হয় না। আরও দুই একবার চেষ্টা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এইরূপ ভাবিয়া সে অপর এক মেষপালকের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল,—"ভাই মেষপালক, আমাকে অতি হিংস্র ও দুরন্ত জন্তু বলিয়া তোমাদের বিশ্বাস আছে। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ, তোমরা আমার প্রতি কিরূপ অবিচার করিয়া থাক। বৎসরে আমাকে একটি করিয়া মেষ দিলেই আর তোমাদের উদ্বেগের কোনও কারণ থাকে না। দেখ, একটিমাত্র মেষ—কি তুচ্ছ বস্তু! ভাবিয়া দেখিলে, ইহা অপেক্ষা সুবিধার প্রস্তাব আর কি হইতে পারে?"

মেষপালককে নীরব থাকিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে দেখিয়া বাঘ পুনরায় বলিতে লাগিল,—"মেষপালক, তুমি হাসিতেছ দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু ইহাতে হাসিবার কথা কি আছে?"

মেষপালক বলিল,—"না, তা কিছুই নাই; কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার বয়স কত হইয়াছে?"

চতুর ব্যাঘ্র বলিল,—"বয়সের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ আছে? বয়স আমার যতই হউক না কেন, তোমার মেষশাবকগুলির ঘাড় ভাঙ্গিবার ক্ষমতা আমার শরীরে যথেষ্টই আছে।"

মেষপালক হাসিয়া বলিল,—"ব্যাঘ্র মহাশয়, অপরাধ গ্রহণ করিও না, আমাকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, তোমার এ প্রস্তাবটি বড় বিলম্বে উপস্থিত হইয়াছে। বৎসর কয়েক পূর্ব্বে প্রস্তাবটি উত্থাপন করিলে কিছু ভাল দেখাইত। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তোমার দন্তের শিথিলতাই তোমাকে এরূপ লজ্জাহীন ও কাণ্ডজ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিয়াছে। শরীরে বল নাই, কৌশলেই এখন তুমি উদর পরিপূরণের চেষ্টায় আছ।"

বাঘ শুনিয়া নিরাশ হইল। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়াই স্থির করিল, যখন শরীরে বল নাই, তখন এরূপ চেষ্টা না করিয়াই বা কি করিব? বিশেষতঃ সম্প্রতি যে মেষপালকের কুকুরটা মরিয়া গিয়াছে, সেখানে এখনও যাওয়া হয় নাই। তাহার কাছে একবার গিয়া এই প্রস্তাব করিলে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব তাহার কাছেই একবার যাই।

এইরূপ চিন্তা করিয়া নেকড়ে অবিলম্বে সেই মেষপালকের নিকট উপস্থিত হইল। এবং তাহাকে বলিল,—"ভাই মেষপালক! আমার স্বজাতীয়

ভ্রাতৃগণের সহিত আমি বড়ই বিরোধ করিয়া আসিয়াছি। তাহাদের সহিত আবার কখনও যে মনের মিল হইবে, সে আশা আমার নাই, এবং সে ইচ্ছাও আমি করি না। এক্ষণে, তোমার মেষরক্ষক কুকুরটি মরিয়া গিয়াছে দেখিতেছি। যদি তুমি আমাকে তাহার কার্য্যে নিযুক্ত কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আমার স্বজাতীয় কেহ তোমার মেষ আক্রমণ করিতে আসিলে, আমি তাহাকে এরূপ শিক্ষা দিব যে, সে আর কখনও এ দিকে আসিতে সাহস করিবে না।"

মেষপালক বলিল,—"তবে, তোমার স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের হস্ত হইতে আমার মেষগুলি রক্ষা করিবার ভার লওয়াই তোমার অভিপ্রায়?"

নেকড়ে বলিল,—"বাস্তবিক ভাই, আমার তাহাই একান্ত ইচ্ছা।"

মেষপালক হাসিয়া বলিল,—"সে বড় মন্দ কথা নয়। কিন্তু তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার স্বজাতীয়গণের হস্ত হইতে মেষরক্ষার জন্য তোমাকে প্রহরী নিযুক্ত করিলে, তোমার হস্ত হইতে মেষরক্ষার জন্য আবার আমি কাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইব? বাহিরের চোরের হস্ত হইতে নিজের বস্তু রক্ষার জন্য যদি ঘরেই চোর পুষি, তাহা হইলে—

নেকড়ে বিরক্ত হইয়া, তাহাকে বাধা দিয়া কহিল,—"মহাশয়, নিরস্ত হউন, আর আপনার বক্তৃতায় প্রয়োজন নাই; আমি ঐ প্রকার বক্তৃতা অনেক শুনিয়াছি।" এই বলিয়া, অসন্তুষ্টমনে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে যাইতে নেকড়ে মনে ভাবিল,—"হায়, যদি আমি বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল না হইতাম, তাহা হইলে আর আজ আমাকে এত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত না। যাহা হউক, হতাশ হইয়া আমার নিরস্ত হওয়া উচিত নয়। সময়ে অবশ্যই সুফল ফলিতে পারে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া সে অন্য এক মেষপালকের নিকট গমন করিল।

মেষপালকের নিকট উপস্থিত হইয়া সে তাহাকে বলিল,—"কি ভাই মেষপালক! আমাকে তুমি চেন কি?"

মেষপালক বলিল,—তোমাকে যদিও না চিনি, অন্ততঃ, তোমার মত অনেকগুলিকে অনেকবার দেখিয়াছি, ইহাতে সন্দেহ নাই।"

নেকড়ে বিস্ময় ভাব প্রকাশ করিয়া বলিল,—"কি, আমার মত! ইহা আমি কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না। কেন না, আমার ন্যায় সদ্গুণ-বিশিষ্ট বাঘ এ বনেই নাই। আমার পরিচয় পাইলে, তোমরা কোন মতেই আমার সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপন না করিয়া থাকিতে পারিবে না।"

মেষপালক বলিল,—"কেন, তোমার এমন বিশেষ কি গুণ আছে?"

নেকড়ে বলিল,—"আমার বিশেষ গুণ এই, আমি কখনও জীবিত মেষ সংহার করিয়া ভক্ষণ করি না। কখনও—কোন মতেই—এ নিয়ম আমি ভঙ্গ করি না। আমি কিরূপ উচ্চ ও মহৎ ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, বুঝিলে ত? কেমন, ইহা প্রশংসার যোগ্য নয় কি? এক্ষণে, যদি আমি মধ্যে মধ্যে তোমার মেষগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসি, এবং তোমার সহিত দেখা শুনা করিয়া যাই, তাহাতে তোমার কিছু আপত্তি আছে কি? মনে কর"—

মেষপালক ব্যস্ত হইয়া কহিল,—"আর মনে করিতে হইবে না। তুমি মৃত মেষই খাও, আর মেষ খাওয়া একেবারে ছাড়িয়াই দাও, আমি কিছুতেই তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারিব না। যে এখন কেবল মৃত মেষটিই খায়, ক্ষুধার যন্ত্রণা বেশি হইলে, দুই দিন পরে সে যে পীড়িতটিকেও মৃত-

এবং সুস্থটিকেও পীড়িত মনে করিতে শিখিবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। অতএব তোমার সহিত সাক্ষাৎ এই পর্য্যন্তই ভাল; ভবিষ্যতে আর কখনও এ দিকে আসিও না।”

মেষপালকের কথা শুনিয়া নেকড়ে দুঃখিত হইল, এবং ভাবিল, এইবার একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখি। তাহাতে হয়, হইল; না হয়, না হইল। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে আর একটি মেষপালকের নিকট উপস্থিত হইল, এবং তাহাকে কহিল,—“ভাই মেষপালক! আমার গায়ের এই চামড়াটার দাম কত হইবে অনুমান করিতে পার?”

মেষপালক বলিল,—“তোমার চামড়াটার দাম?—কই দেখি?” বলিয়া তাহার গাত্র ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতে বলিল,—“বড় মন্দ নয়—কৈ, কোন স্থানে ত ক্ষত দৃষ্ট হইতেছে না। ক্ষত থাকিলে মূল্য কম হইত, এবং—

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই নেকড়ে বলিল,—“তা ভাই মেষপালক! আমি ত বৃদ্ধ হইয়াছি; আর বেশি দিন বাঁচিব না। যে কয় দিন বাঁচি, তুমি আমাকে আহার দাও। মরিবার সময় আমি তোমাকে আমার চামড়াটি দিয়া যাইব।”

মেষপালক শুনিয়া হাসিয়া বলিল,—“বেশ বলিয়াছ। আমি দেখিতেছি, কৃপণতায় তোমার যোড়া মিলে না। কিন্তু তুমি যে কৃপণ বলিয়াই এরূপ প্রস্তাব করিতেছ, তাহা নয়। ভিতরে আরও কথা আছে। আমি তোমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলে, আমাকে আর লাভের প্রত্যাশা করিতে হইবে না। চামড়াটুকুর যে দাম, তুমি খাইয়া তাহার দশগুণ দাম আদায় করিয়া লইবে। অতএব তোমার চামড়াটুকু যদি আমাকে দান করিতেই তোমার এত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে উহা এখনই দাও না কেন? বিলম্বের প্রয়োজন কি?”

এই বলিয়া মেষপালক আপনার লগুড়টি হস্তে করিয়া তুলিবামাত্রই নেকড়ে দৌড়িয়া পালায়ন করিল। কিয়দ্দূর গিয়া রাগে বাঘের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, বাঘ বলিতে লাগিল,—মেষপালকদিগের ন্যায় নিষ্ঠুর ও দুষ্ট জীব পৃথিবীতে আর নাই। আমি দুর্ব্বল ও অক্ষম হইলেও, ইহারা আমার যেরূপ অপমান ও দুর্দ্দশা করিল, তাহার সমুচিত প্রতিফল দেওয়া উচিত। তাহাতে মৃত্যু হইলেও, তাহা অনাহারে মৃত্যু অপেক্ষা সহস্রগুণে ভাল।”

এইরূপ চিন্তা করিয়া নেকড়ে অবিলম্বে মেষপালকদের কুটীরের অভিমুখে ধাবমান হইল। এবং অবিলম্বে কুটীরের নিকট উপস্থিত হইয়া, গর্জ্জন ও আস্ফালন পূর্ব্বক কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মেষপালকদের বালকবালিকাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। মেষপালকগণও তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল এবং সকলে মিলিয়া লগুড়াঘাতে তাহার প্রাণবিনাশ করিল।

মাতৃভক্তি।

জর্জ বাসিংটন, অতি অল্প বয়সে, এক সাংগ্রামিক অর্ণবযানে মধ্য শ্রেণীর অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ অর্ণবযান স্থানান্তরে যাইবার নিমিত্ত আদিষ্ট হইলে, বাসিংটন অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, এবং প্রস্থানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

প্রস্থানদিবস উপস্থিত হইল। অর্ণবযান তাঁহাদের বাটীর সন্নিকটে আসিয়া নঙ্গর ফেলিল, এবং তাঁহাকে অর্ণবযানে লইয়া যাইবার নিমিত্ত, একখানি ছোট নৌকা তীরে প্রেরিত হইল। পরিচ্ছদ প্রভৃতি আবশ্যক দ্রব্য সকল এক তোরঙ্গে রক্ষিত হইয়াছিল; তিনি ভৃত্য দ্বারা ঐ তোরঙ্গটি নৌকায় পাঠাইয়া দিলেন।

প্রস্থান বিষয়ে জননীর অনুমতি গ্রহণের নিমিত্ত, বাসিংটন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, জননী, নিরতিশয় বিষণ্ণ বদনে উপবিষ্ট হইয়া, প্রভূত বাষ্পবারি বিমোচন করিতেছেন। জননীর ভাবদর্শনে তিনি অতিশয় চকিত হইয়া উঠিলেন, এবং বুঝিতে পারিলেন, কিয়ত্ কালের নিমিত্ত, তিনি জননীর দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইতেছেন, এজন্য জননী সাতিশয় শোকাভিভূত হইয়া, বিষণ্ণ বদনে রোদন করিতেছেন।

বাসিংটন, অর্ণবযানে যাইবার নিমিত্ত, যত্পরোনাস্তি ব্যগ্র হইয়াছিলেন, কিন্তু জননীর ভাবদর্শনে নিতান্ত হতোত্সাহ হইয়া, কিয়ত্ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনন্তর, জননীর মনে ক্লেশ দিয়া, কোনও কারণে কোনও কর্ম্ম করা কোনও ক্রমে উচিত নহে, এই বিবেচনা করিয়া, ভৃত্যকে বলিলেন, তুমি নৌকা হইতে আমার তোরঙ্গ লইয়া আইস; এবং নৌকার লোকদিগকে বলিয়া দেও, আমার যাওয়া হইবেক না; আমি গেলে, জননীর মনে অতিশয় ক্লেশ জন্মিবেক; জননীর মনে ক্লেশ দিয়া, আমি কখনও কোনও কর্ম্ম করিতে পারিব না।

এই বাক্য কর্ণগোচর হইবামাত্র, বাসিংটনের জননী বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইলেন, এবং আহ্লাদে পুলকিতকলেবরা হইয়া বলিতে লাগিলেন, বত্স, তুমি চিরজীবী হও; যাহারা পিতামাতার যথোচিত সম্মান করে, ঈশ্বর তাহাদের অশেষবিধ মঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন; তুমি মাতৃভক্তির যেরূপ উদাহরণ প্রদর্শিত করিলে, তাহাতে ঈশ্বর তোমার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলবিধান করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। *

অধ্যবসায়।

ন বিষয়ে একবার অকৃতকার্য্য হইলে হতাশ না হইয়া, তাহা সুসম্পন্ন করিবার জন্য পুনঃপুনঃ যত্ন করার নামই অধ্যবসায়। অধ্যবসায় সৌভাগ্যের প্রসূতি। ইহা দ্বারা ধন, মান, খ্যাতি সকলই লাভ করা যায়। সুতরাং অধ্যবসায়শীল হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। তোমরা সর্ব্বদাই শুনিতেছ ইউরোপ ও আমেরিকার লোকেরা প্রতিনিয়ত কতই

* স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বহস্তলিখিত এই প্রবন্ধটি তাঁহার দৌহিত্র "সাহিত্য" পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় সখার পাঠকগণকে উপহার দিয়াছেন। এজন্য তাঁহার নিকট আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতের লেখা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য আমরা তাঁহার হাতের লেখাটিরও অবিকল নকল ইহার সহিত প্রকাশ করিলাম। সঃ সঃ

অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিতেছে! অধ্যবসায়ই এই উন্নতিলাভের মূল কারণ। যদি কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে, কায়মনোবাক্যে তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা কর। প্রথম উদ্যমেই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে না বলিয়া তাহা ছাড়িয়া দিও না। যত্ন ও মনোযোগ সহকারে কার্য্য করিলে একদিন না একদিন অবশ্য তাহার ফল পাওয়া যায়। অধ্যবসায়বলে লোকে কিরূপে উন্নত ও কৃতকার্য্য হয়, তদ্বিষয়ে তোমাদিগকে আজ একটি ক্ষুদ্র গল্প বলিব। অন্য কিছু না হউক ইহা হইতে অধ্যবসায়ের একটি উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

তোমরা ইতিহাস পাঠে বোধ হয় তৈমুরলঙ্গের (Timerlane) বিষয় কিছু না কিছু অবগত আছ। সমরকন্দের নিকটবর্ত্তী কোন এক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃপিতামহাদিক্রমে সকলেই সমরকন্দে জঙ্গিস্‌খাঁর বংশীয়দিগের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিতেন। তৈমুরও ক্রমে যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষরূপ পারদর্শী হইয়া তথায় একজন প্রধান সেনাপতির পদগ্রহণ করেন।

অতঃপর সমরকন্দের রাজ্য ক্রমশঃ হীনবীর্য্য হওয়ায়, উহার অধিপতিকে পরাজিত করিয়া উক্ত রাজ্যের অধীশ্বর হইবার বাসনা তাঁহার মনোমধ্যে বলবতী হইয়া উঠিল। তখন তিনি আপন অধীনস্থ সেনাদিগকে উত্তেজিত করিয়া নগর আক্রমণ করিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তথাপি ভগ্নমনোরথ না হইয়া সৈন্যসংখ্যা দ্বিগুণতর বৃদ্ধি করিয়া নবোৎসাহের সহিত পুনরায় নগরাক্রমণ করিলেন। কিন্তু তাহাও বিফল হইল। এইরূপে একবিংশ বার পর্য্যন্ত যখন পরাস্ত হইলেন, তখন একেবারে ভগ্নোদ্যম হইলেন। মনে ভাবিলেন, এমন গুরুতর কার্য্য বুঝি আমা দ্বারা হইল না। বাল্যকাল হইতে যে সিংহাসনলাভ আশা করিয়া আসিতেছি তাহা যখন ঘটিল না, তখন আর এ সংসারে থাকা উচিত নহে। এইরূপ স্থির করিয়া, আত্মহত্যা অভিলাষে তিনি একখানি ছুরিকা লইয়া কোন পর্ব্বতগুহায় গিয়া বসিলেন। কিন্তু সেই সময় পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে মনে পড়াতে তিনি কথঞ্চিৎ বিচলিত হইলেন ও ছুরিকা লইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে একটী পিপীলিকার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। দেখিলেন, পিপীলিকাটি শস্যের একটী দানা লইয়া একখানি পর্ব্বতপ্রস্তরের নীচে হইতে উপরে উঠিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পড়িয়া যাইতেছে। তিনি নিবিষ্ট মনে গণিয়া দেখিলেন যে, পিপীলিকাটি একাদিক্রমে একুশ বার বিফল হইয়া দ্বাবিংশ বারে পর্ব্বতপ্রস্তরের উপরে উঠিতে সমর্থ হইল। ইহা দেখিয়াই তিনি ভাবিলেন হয় ত আমার শিক্ষার নিমিত্তই আমি আজ এই দৃশ্যটি দেখিতে পাইলাম। এখন তাঁহার আত্মহত্যার বাসনা দূর হইল, এবং বলিয়া উঠিলেন, আমিও একুশবার পরাজিত হইয়াছি, এইবার আমার দ্বাবিংশ বার; সুতরাং অবশ্যই জয়লাভ করিব। এই দৃঢ় বিশ্বাসে ভর করিয়া তিনি বহুসংখ্যক সেনা লইয়া অতুল সাহসের সহিত নগর আক্রমণ করিলেন এবং কয়দিন পর্য্যন্ত অধ্যবসায় সহকারে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়া সমরকন্দ নগরে আপন রাজধানী স্থাপন করিলেন।

শিশুগণ! তোমাদেরও এইরূপ সকল বিষয়ে অধ্যবসায়শীল হওয়া উচিত। কোন কাজে একবার নিষ্ফল হইলেও বিরক্ত হইয়া সে কাজ ত্যাগ করিবে না, বরং দ্বিগুণতর উৎসাহ ও পরিশ্রম সহকারে তাহা সম্পন্ন করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ থাকিবে।

আমার খুকু।

আ মরি কি পুতুল আমার
দেখ্‌বি সবাই আয়,
টুক্‌টুকে ঠোঁট ফুট্‌ফুটে চোক
মিটির মিটির চায়!
মাথায় কেমন টুপি পরা,
ঘাগ্‌রা দিয়ে গা-টি ঘেরা,
জুতো পরা খুর্‌খুরে পা
চ'ল্‌তে যেন চায়।

খুকু!
নাম রেখেছি কেমন তোমার খুঁজে পাড়া পাড়া,
'টুনু' ব'লে ডাক্‌লে পরেই অম্‌নি দিও সাড়া।
অম্‌নি ডেকে মধুর বোলে, হাত বাড়িয়ে এসো কোলে;
এক দণ্ড পারি নে যে থাক্‌তে তোমা ছাড়া।

ঝুম্‌রো! তুমি হিংসা ক'রে যেও না ধন, চ'লে,
বুকে থাকুক টুনু আমার, তুমি থাক কোলে;
ভালবাসার টুনু আমার, তুমি আমার ভালবাসার,
দুই জনকেই খেল্‌বো নিয়ে নিত্যি সকাল হ'লে।

ও ঝুম্‌রো, লক্ষ্মীছাড়া,
এ কি করিস্‌ বল্‌—
ছাড়্‌ ঘাগ্‌রা টুনুর আমার
ও হিংসুক খল!
সোণার টুনু গেল যে রে,
দিলি যে তার দফা সেরে,
ভালবাসে তোরে টুনু,
এই কি তাহার ফল?

ও নিবারণ, মনো, মতি, আয়-না সবাই ভাই,
ঝুম্‌রো পালায় টুনু নিয়ে জানি নে কোন্ ঠাঁই।
ছুটেছে যে কাম্‌ড়ে ধ'রে, খুকু বুঝি গেলো ম'রে,
এমন কুকুর আমি যে রে জন্মে দেখি নাই।

ছোট্-না রে ভাই পিছু পিছু, ধর্-না কাছে গিয়ে,
লোভ দেখিয়ে ডাক্-না না হয় খাবার টাবার দিয়ে।
ঝুম্‌রো ছোটে ঝড়ের মত, আমরা কি ভাই পারি তত,
মুস্কিলেতে প'ড়্‌লেম য়ে টুনুটিকে নিয়ে।

লক্ষ্মীবাই।

পর পৃষ্ঠায় যে চিত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা ঝাঁসির রাণী বীর্য্যশালিনী লক্ষ্মীবাইয়ের প্রতিমূর্ত্তি। স্ত্রীজাতির হৃদয় স্বভাবতঃ দয়াদাক্ষিণ্যাদি যে সকল কোমল গুণে শোভিত থাকে, ইঁহার হৃদয়ে সে সকল গুণ যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। আবার, উৎসাহ, সাহস ও অধ্যবসায় প্রভৃতি যে সকল গুণ বীরপুরুষেরও বাসনার সামগ্রী, সে সকল গুণও ইঁহার হৃদয়ে এত অধিক পরিমাণে ছিল যে, শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে বুন্দেলখণ্ড বলিয়া একটি পর্ব্বতাকীর্ণ স্থান আছে। এই বুন্দেলখণ্ডের পশ্চিমভাগেই ঝাঁসি রাজ্য। স্থানটি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। রাজ্যটির পরিমাণফল দেড় হাজার বর্গ মাইলেরও কিছু বেশি। আগে এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি মহারাষ্ট্রবংশীয়দের দ্বারা শাসিত হইত। তাহার পর খ্রিষ্টীয় ১৮১৭ অব্দে ইহার সহিত ইংরাজদের প্রথম সংশ্রব ঘটে।

ঝাঁসির মহারাষ্ট্রবংশের শেষ রাজা গঙ্গাধর রাও খ্রিষ্টীয় ১৮৩৮ অব্দে ঝাঁসির রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। তেজস্বিনী লক্ষ্মীবাই এই গঙ্গাধর রাওরই পত্নী।

রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবার ষোড়শ বর্ষ মধ্যেই তরুণ বয়সে গঙ্গাধরের মৃত্যু হয়। গঙ্গাধর নিঃসন্তান ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি শাস্ত্রানুযায়ী ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের একটি পুত্রকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত ঝাঁসির রাজবংশের ইতিপূর্ব্বে যে সন্ধি হয়, তাহার মর্ম্মানুসারে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করা উচিত বোধ করিয়া, গঙ্গাধর তথনকার ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট্‌কে এই সংবাদ দেন। এবং তাঁহার বিধবা পত্নী, দত্তক পুত্র এবং ঐ দত্তকপুত্রটির মাতা যাহাতে তাঁহার মৃত্যুর পরও ইংরাজগবর্ণমেণ্টের নিকট অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে রাজ্যপালন ও বিষয় সম্পত্তি সম্ভোগ করিতে পারে, অনুনয় জানাইয়া, পত্র দ্বারা গবর্ণমেণ্টের নিকট এ প্রার্থনাও করে।

লর্ড ডাল্‌হৌসি তখন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল। দেশীয় রাজা দ্বারা প্রজাদের সুপালন হইবে না, তিনি ইহাই স্থির করিলেন; এবং গঙ্গাধরের অন্তিম অনুনয়ে কর্ণপাত না করিয়াই ঝাঁসিকে ইংরাজরাজ্যের মধ্যে পরিগণিত করিয়া লইলেন।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যে লক্ষ্মীবাইয়ের হৃদয়ে কিন্তু দারুণ আঘাত লাগিল। তাঁহার পূজনীয় স্বামী যাহাকে দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ করিলেন, সে বালক রাজ্যপালনের ক্ষমতায় বঞ্চিত হইল এবং মহারাষ্ট্রবংশের পূর্ব্বগৌরব নষ্ট হইল, ইহাতে তিনি যেন হৃদয়ে তুষানল পোষণ করিয়া দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার স্বামী চিরকাল ইংরাজের বিশ্বস্ত মিত্রের ন্যায় থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, এবং ইংরাজের সহিত সন্ধিপত্রেও তাঁহার দত্তক গ্রহণের অধিকার স্পষ্টই নির্দ্দিষ্ট ছিল। তিনি এখন এই সকল হেতু দেখাইয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের নিকট বিচারপ্রার্থিণী হইলেন। গবর্ণমেণ্ট বিচার করিয়া তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন।

লক্ষ্মীবাইয়ের হৃদয়ে যে তুষানল পুড়িতেছিল, তাহা এক্ষণে দ্বিগুণতর উগ্রভাব ধারণ করিল। ইহা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যারপর নাই অসঙ্গত অত্যাচার বলিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। যে হৃদয়ে আত্মসম্মানবোধ আছে; অদম্য উৎসাহ, অমিত শক্তি ও অজেয় অধ্যবসায় আছে, তাহা কখনই অবমাননার পদাঘাতে নিঃশব্দে বিলীন হইয়া যাইবার বস্তু নহে। রমণী হইলেও, লক্ষ্মীবাইয়ের হৃদয় প্রতিশোধগ্রহণের প্রবল উৎসাহে প্রমত্ত হইয়া উঠিল। লক্ষ্মীবাই প্রতিনিয়ত ইংরাজের কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ দিবার জন্য সুবিধার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময়, এরূপ এক ঘটনা উপস্থিত হইল, যাহা তিনি আপনার অভীষ্টসিদ্ধির সম্পূর্ণ সুযোগ বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরেই, ইংরাজের সহিত সিপাহীদের ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। অন্যান্য স্থানের ন্যায় বুন্দেলখণ্ডও সেই বিদ্রোহবাত্যার আবির্ভাবে আন্দোলিত হইয়া উঠে। লক্ষ্মীবাই, এই সময়ই, ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনাদের প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি আপনার জীবনের মায়া না রাখিয়াই, আত্মীয় স্বজনের করুণ ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়াই, আপনার কোমল দেহে বীরোচিত সমরসজ্জা পরিধান করিলেন। এবং বীরপুরুষের বেশে, অসিহস্তে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক জ্বলন্ত সাহসবাক্যে সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়া সমরক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। সৈন্যগণ তাঁহার জ্বালাময়ী শত্রুসংহারিণী মূর্ত্তি অবলোকনে অতুল সাহসে, অদম্য উৎসাহে, বিপক্ষ পক্ষের সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের আক্রমণে ইংরাজ সেনাপতি সার হিউরোজের সৈন্যগণ কিয়ৎকালের জন্য বিত্রস্ত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। হিউরোজ্‌, বীর্য্যশালিনী রমণীর রণ-নৈপুণ্যে বিস্মিত ও বিমোহিত হইলেন। কিন্তু লক্ষ্মীবাইয়ের সামান্য সৈন্য কত কাল ইংরাজের সুশিক্ষিত বিপুল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে? সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কয়েক মাস যুদ্ধের পরই বিজয়লক্ষ্মী ইংরাজের অঙ্কগত হইলেন। কিন্তু লক্ষ্মীবাই স্বয়ং কখনই কোন যুদ্ধে কিছুমাত্রও উদ্বেগ বা নিরুৎসাহের ভাব প্রকাশ করেন নাই।

প্রথমবারের যুদ্ধে পরাজিতা হইয়া লক্ষ্মীবাই আবার সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে কাল্পী নগরে যুদ্ধার্থ ইংরাজের সম্মুখীন হন। এবারও কিন্তু তিনি পরাজিতা হইলেন। কাল্পী ইংরাজের হস্তগত হইল। লক্ষ্মীবাইয়ের হৃদয়ে কিন্তু এখনও উৎসাহের ন্যূনতা

বা অধ্যবসায়ের অভাব লক্ষিত হয় নাই। গোয়ালিয়রের নিকট আবার তিনি ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এই যুদ্ধেই তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হইল। যুদ্ধের পর পরিশ্রান্ত হইয়া যখন তিনি শিবিরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন বিপক্ষীয় তুরুক্‌সওয়ারের অস্ত্রাঘাতে নিহত ও ভূপতিত হইলেন। তাঁহার শরীররক্ষকগণ তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। নিমেষমধ্যে চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহারা সেই বীরাঙ্গনার পবিত্র দেহের সৎকার সাধন করিল। বীরাঙ্গনা বীরকার্য্যে দেহপাত করিয়া পবিত্র অমরধামে গমন করিলেন।

মূর্খ শিষ্য।

মূর্খেরা আপনাদের অজ্ঞতার হেতু যে কেবল আপনাদেরই অনিষ্ট ও দুঃখ উৎপাদন করে—অপরের করে না, তাহা নহে। মূর্খের মূর্খতার নিমিত্ত সাধুদিগেরও ক্ষতি হয়, এবং সাধুদিগকেও যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হয়।

কোন অধ্যাপক দুইটি ছাত্রকে স্বগৃহে রাখিয়া শাস্ত্রশিক্ষা দিতেন। ছাত্র দুইটি কিন্তু মন দিয়া কিছুই শিখিত না। কাজেই বিদ্যাও তাহাদের তেমনই হইয়াছিল। তথাপি শিষ্য দুইটির একটি গুণ ছিল, তাহারা প্রতিদিন গুরুর পদসেবা করিত। কিন্তু তাহাদের এমনই অদ্ভুত বুদ্ধি যে, তাহারা এই পদসেবার মধ্যেও একটা বিভ্রাট আনিয়া ফেলিয়াছিল। গুরুর পা দুখানিও তাহারা ভাগ করিয়া লইয়াছিল। যে দক্ষিণপদ সেবা করিত, সে কখনও বাম পদ, এবং যে বামপদ সেবা করিত সে কখনও দক্ষিণপদ সেবা করিত না। একদিন একজন অনুপস্থিত থাকায় গুরু উপস্থিত শিষ্যকেই দুইটি পদ সেবা করিতে বলিলেন। শিষ্য বিরক্ত হইল এবং তাহার সহাধ্যায়ীর উপর যে পদটি সেবার ভার ছিল, সেটি এমন জোরে টিপিয়া দিল যে, গুরু তাহাতে বড়ই ব্যথা পাইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে অপর শিষ্য উপস্থিত হইল। সে আসিয়া শুনিল যে, সহাধ্যায়ী তাহার ভাগের চরণটির বড়ই দুর্দ্দশা করিয়াছে। তখন সে ক্রোধে অন্ধ হইয়া পড়িল এবং বলিয়া উঠিল, "সে যেমন আমার পায়ে আঘাত করিয়াছে আমি তেমনই তাহার পা ভাঙ্গিয়া দিব।" এই বলিয়া গুরুর পায়ে যষ্টি দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। গুরু অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করিলেন। অপর সকল লোকে ইহা দেখিয়া শিষ্য দুইটিকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া তথা হইতে দূর করিয়া দিল।

নব-বর্ষ।

আমি এসেছি আবার
নবীন উষায়
অরুণ-কিরণ মাখি',
মনের দুয়ার
খুলিয়া আমার
ডেকেছে বনের পাখি।
আমার বিটপী ডেকেছে
বিষাদ সহিয়া,
মলয় ডেকেছে
মধুরে বহিয়া,
আবার ডেকেছে লতিকা
আদর করিয়া
ফুটায়ে কুসুম-আঁখি।

মধুর গুঞ্জরি
এসেছে ভ্রমর
খুঁজিতে আমারে
কানন ভিতর,
আবার খুঁজিয়া আমারে
নলিনী কাতর
সলিল উপরে থাকি'।
মানস আমার
করিতে তোষণ
কোকিলা ভাষিছে
মধুর ভাষণ,
আবার ধরণী পেতেছে
হরিত আসন,
আমি দেখিতে পাই নে তা কি!

ধাঁধা।

গত বারের ধাঁধার উত্তর।

১। বা ম দে ব
ম ধু ব ন
দে ব ব্র ত
ব ন ত রু

"বামদেব" শব্দের পরিবর্ত্তে কেহ কেহ কামদেবও লিখিয়া উত্তর দিয়াছেন। তাহাও হয়।

২। য মু না
মু ঙ্গে র
না র দ

৩। পাতাল

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মার্চ্চ্ মাসের তিনটি ধাঁধারই ঠিক উত্তর দিয়াছেন:—

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাঁকিপুর। শ্রীশরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত, রামনগর। শ্রীসত্যভূষণ সিংহ, বরিশাল। শ্রীশরচ্চন্দ্র সেন, বাসন্দা। শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস, টিকারি। শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস, করিমগঞ্জ স্কুল। শ্রীকৈলাসচন্দ্র দাস, টেপা মধুপুর। শ্রীকালীমাধব চক্রবর্ত্তী, আমলাগাছি। শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন দাস, নওগাঁ। শ্রীরমণমণি দে, বালাগঞ্জ স্কুল। শ্রীযোগেশচন্দ্র খাসনবিস, কুমারুলি।—২য় ও ৩য় ধাঁধার ঠিক উত্তর দিয়াছেন—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন, গৌহাটি।—১ম ও ৩য় ধাঁধার ঠিক উত্তর দিয়াছেন—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, গৌহাটি।—২য় ধাঁধার ঠিক উত্তর দিয়াছেন—শ্রীসরোজিনী গুপ্তা, রাণীগঞ্জ।—৩য় ধাঁধার ঠিক উত্তর দিয়াছেন—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু, বহরমপুর।

নূতন ধাঁধা।

১। চলিয়া যে যায়, সে আমারে যদি পায়।
অমনি দাঁড়ায়, আর চলিতে না চায়॥
দাঁড়ায়ে যে আছে, যদি যাই তার কাছে।
অমনি দেখিবে সেও ব'সে পড়িয়াছে॥
বসিয়া যে, ভাই, যদি তার কাছে যাই।
খুঁজিবে সে ঠাঁই, মুখে তুলে ঘন হাই॥
কত ছেলে প্রাণে মোরে সখা ব'লে জানে।
পড়িতে বসিয়া চায় মোর মুখ পানে॥
কাছে যাই যার আমি মাথা খাই তার।
বল ত হে শিশু তুমি কি নাম আমার?

২। এমন একটি জেলার নাম কর, যাহার একটি অক্ষর হসন্ত উচ্চারিত হয়। কিন্তু তুমি যদি তাহার হসন্ত চিহ্নটি খুলিতে যাও, সে অমনি তোমাকে খুলিতে বারণ করিবে।

৩। কদম্ব ও নারদ এই দুইটি কথার সহিত আর কোন্ কথাটি যোগ করিয়া কোন্টির পর কোন্টি বসাইলে, ১ম, ২য়, ৩য় পংক্তি ক্রমান্বয়ে পড়িয়া গেলেও যাহা হইবে, প্রতি পংক্তির ১ম, ২য়, ৩য় অক্ষরগুলি ক্রমান্বয়ে পড়িয়া গেলেও তাহাই হইবে।

সখা
একাদশ ভাগ। ৫ম সংখ্যা।

মে, ১৮৯৩।

বিবিধ।

উচ্চ পরীক্ষায় রমণী।—এবার ৩টি রমণী বি,এ, এবং ১০টি এল্, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বহুমূল্য পুস্তক।—রোমে পোপের নিকট এক খানি হিব্রু বাইবেল আছে। তাহার মূল্য না কি ৪,১২,০০০ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

গ্রীষ্মনিবারক যন্ত্র।—আমেরিকাতে একটি অদ্ভুত যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই যন্ত্রটি অতি ক্ষুদ্র, এমন কি পকেটে রাখা যায়। আবশ্যকমত শরীরে প্রয়োগ করিলে সমস্ত শরীর শীতল এবং স্নিগ্ধ হয়।

পৃথিবীপর্য্যটক।—কলিকাতায় মিঃ নরম্যান্ নামক জনৈক ইংরেজ তিন-বার পৃথিবী ঘুরিয়া আসিয়াছেন। শুনা যায় তিনি না কি আবার পৃথিবীর প্রধান প্রধান নগরগুলি দেখিতে বহির্গত হইবেন।

কর্ত্তব্যপরায়ণতা।—সম্প্রতি নিজাম শিকার করিতে বাহির হইলে, তাঁহার তাঁবুতে যাহারা পাহারা দিতেছিল, তাহাদের একজনকে সাপে কামড়ায়। তাঁবুর লোকেরা তাহাকে তখনই হাসপাতালে যাইতে বলে। সে কিন্তু বলে,—"আমার জায়গায় আর এক জন না আসিলে আমি কেমন করিয়া যাইব?" কর্ম্মচারীরা তখন নিজামকে খবর দেয়। নিজাম নিজে পাহারাওয়ালার কাছে আসিয়া, তাহাকে তখনই হাসপাতালে যাইতে বলেন। পাহারাওয়ালার কিন্তু তখনও সেই একই উত্তর—"পাহারায় লোক না আসিলে কেমন করিয়া কাজ ছাড়িয়া যাইব?" নিজাম তাহার কর্ত্তব্য-পরায়ণতা দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি তাহাকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দিবার অনুমতি করিলেন ও তাহার পদবৃদ্ধি করিয়া দিলেন। গুণের উপযুক্ত পুরস্কারই হইয়াছে।

কুম্ভীর।
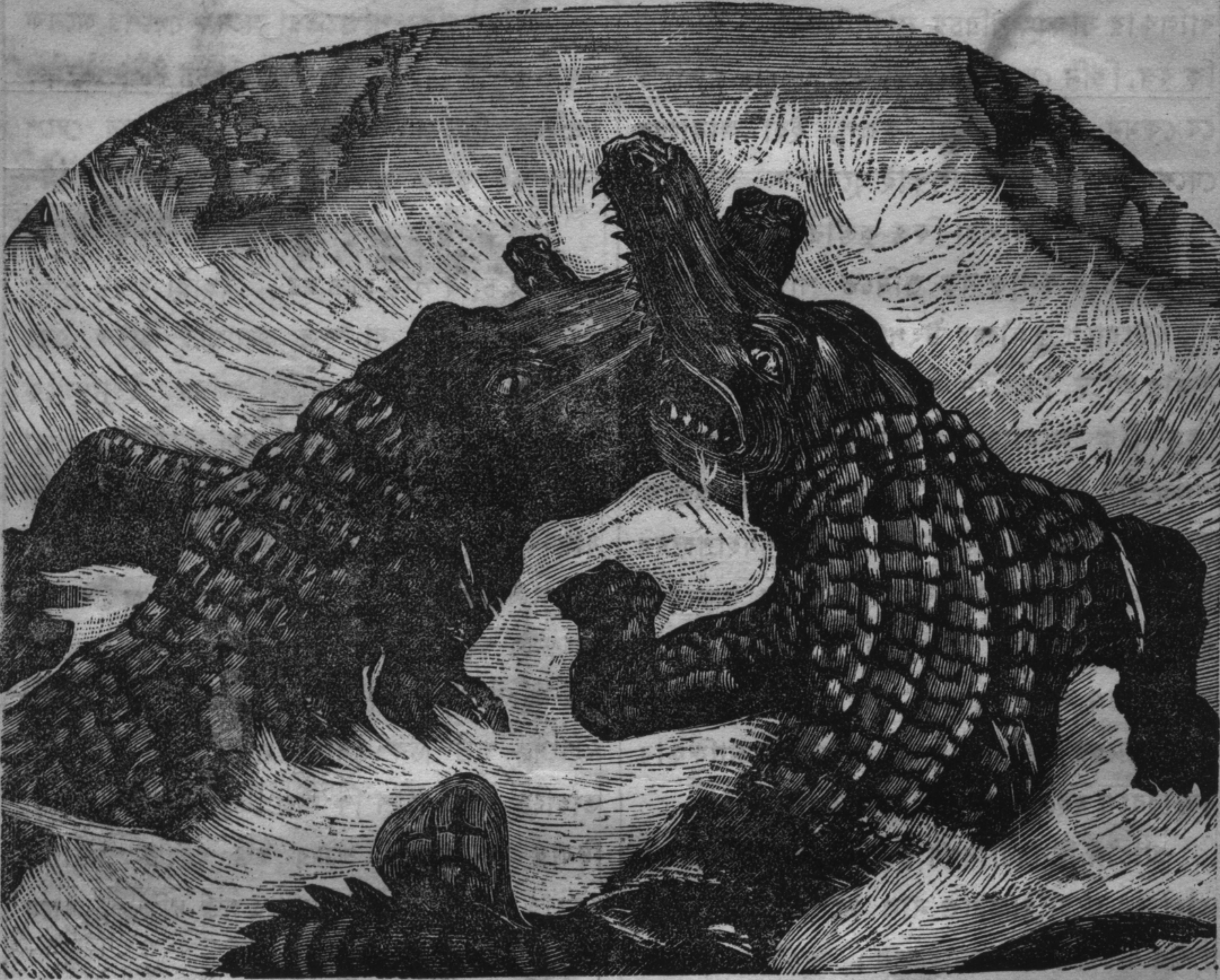
"ঢেঁকি বড় কি কুমীর বড়।
যে বড় সে ভেসে পড়॥"

ইহা আমাদের দেশের ছেলেদেরই কথা। 'পুকুরে কুমীর আসিয়াছে' বলিলে, ছেলেরাও তাড়াতাড়ি জল হইতে উঠিয়া পলায়। আবার তাহার পরই, হয় ত, ঠাকুর-মা কি ঠাকুর-দাদার কাছে গিয়া বসিলে শুনিতে পায়, একবার অমুক জায়গায় অমুক পুকুরে বড় একটা কুমীর আসিয়াছিল, যাই একটি লোক স্নান করিতে নামিল; অমনই কুম্ভীর তাহাকে ডুবাইয়া লইয়া গেল। আবার, অমুক খালে সে বছর একটা প্রকাণ্ড কুম্ভীর আসিয়াছিল, যাই একটা গোরু জল খাইতে জলের নিকট গিয়াছে, আর অমনি কুম্ভীর লেজের ঝাপ্‌টা মারিয়া জলে ফেলিয়া, তাহাকে লইয়া পলাইল।

এই ত গেল, কুমীরের কীর্ত্তি। আবার নদীর মানুষ-খেগো বড় বড় কুম্ভীর মারা পড়িলে,তাহাদের

পেটের ভিতর হইতে যে অনেক সময় মানুষের অলঙ্কারাদিও পাওয়া যায়, এ কথাও শুনা গিয়া থাকে। সুতরাং কুম্ভীরের সহিত সকল বালক-বালিকার সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকিলেও, কুম্ভীর যে কি বস্তু, তিনি যে কোথায় থাকেন, তাঁহার স্বভাবটি যে কেমন, বলবিক্রমই বা কিরূপ, ইহা আমাদের দেশের সকল বালকবালিকাই বুঝে।

সাহেবদের ছেলেরা কিন্তু কুম্ভীর দেখিতে পায় না, কুম্ভীরের কথাও বড় শুনিতে পায় না; কেন না, ইউরোপে কুম্ভীরের উৎপাত নাই। আফ্রিকায় কুম্ভীর আছে, কিন্তু সে সকল কুম্ভীরের আকৃতিই কিছু ঠিক আমাদের দেশের কুম্ভীরের মত নয়। আফ্রিকার নীল নদের প্রাচীন কুম্ভীরবংশই কুম্ভীর-কুলের শিরোমণি। এই ভয়ঙ্কর শিরোমণিমহাশয়দের সহিত এ দেশের কুম্ভীরকুলতিলকগণের অনেকটা সাদৃশ্য আছে বটে। ইহা ভিন্ন আমেরিকার নদী প্রভৃতিতেও অনেক বড় বড় কুম্ভীর আছে, তাহাদের শরীরের গঠনাদি কিন্তু এসিয়া বা আফ্রিকার কুম্ভীরবংশ হইতে অনেকটা ভিন্ন রকমের।

প্রাচীন মিসরবাসিগণ কুম্ভীরের পূজা করিত। তাহাদের পুরোহিতেরাও নীল নদের ছোট ছোট কুমীর ধরিয়া পোষ মানাইতেন। কুম্ভীরের কর্ণের উপরিস্থ মাংস বিদ্ধ করিয়া তাহাতে সোণার দুল ঝুলাইতেন এবং সম্মুখের পা দুইটিও বলয় দিয়া সাজাইতেন। এইরূপ সাজাইয়া গুছাইয়া ঐ কুম্ভীর সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতেন। তাহারাও দেবতা জ্ঞানে ঐ কুম্ভীরের পূজা করিত। শুধু মিসরেই বা কেন, সিন্ধু প্রদেশে করাচির উত্তরে ৩।৪ ক্রোশের মধ্যেই কতকগুলি উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। এই উষ্ণপ্রস্রবণগুলিতে অনেক কুম্ভীর বাস করে। সেখানকার এক সম্প্রদায়ের লোক ইহাদের পূজা করে। সেই স্থানের ফকিরেরা এই কুম্ভীরগুলিকে আদর করিয়া ডাকিয়া খাইতে দেন ও তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, এজন্য কুম্ভীরগুলিও তাঁহাদের পোষ মানিয়াছে।

প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনেক দেশের অনেক রকম কুম্ভীর দেখিয়া ইহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। আমাদের দেশে কিন্তু দুই রকম কুম্ভীরের কথাই সকলে জানেন।

এক প্রকার কুম্ভীরের আকার কিছু ছোট; সচরাচর চারি পাঁচ হাত হয়। ইহারা বাদা, পুকুর প্রভৃতি অগভীর বা ক্ষুদ্র জলাশয়ে থাকে এবং মৎস্যাদি জলচর জন্তু ধরিয়া খায়। ইহাদিগকে ঘড়িয়াল বা মেছো কুমীর বলে। চরিতে গিয়া গৃহস্থের হাঁসটি ছাগলটি যে মাঝে মাঝে হারাইয়া যায়—কিসে খাইয়া ফেলে, সে প্রায় ইহাদের কর্ম্ম। ইহারা সাধারণতঃ মনুষ্য গবাদি বৃহৎ জন্তুদিগকে আক্রমণ করিতে সাহসী হয় না। পুষ্করিণীর গাত্রে গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যেও ইহারা সুখে বাস করে। ইহাদের গর্ত্ত ঠিক সোজা নয়; মনে করিলেই, তাহাতে একটা বাঁশ কি অন্য কিছু প্রবেশ করাইয়া দিবার যো নাই। শত্রুর হস্ত হইতে নিরাপদ হইবার জন্য ইহারা আপনাদের গর্ত্ত দক্ষিণে, বামে বক্র করিয়া প্রস্তুত করে।

অন্য প্রকার কুমীরও প্রথমে মাছ প্রভৃতি খাইয়াই উদর পূরণ করে। কিন্তু যতই বয়স বেশি হয়, আকারটিও যেমন বাড়ে, উদরের গহ্বরটিও তেমনই জাঁকাল রকম হইতে থাকে। তখনই আর শুধু মাছে কুলায় না; কাজেই মানুষটা, গোরুটা, ছাগলটাকেও টানিতে হয়। কুমীর নদীর চরে বালির উপর রোদে পিঠ দিয়া শুইয়া থাকে। তখন গোরু, ছাগল প্রভৃতি যে কোন পশু নিকটে আসিলেই তাহাকে জলে টানিয়া লইয়া যায়। সময় সময় জল হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিয়া ডাঙ্গার জন্তু

লইয়াও পলায়ন করে। মুখে করিয়া আছাড় দিয়া কুম্ভীর মাংস ছিঁড়িয়া খায়। শিকারের জন্তুটা বড় ও মাংসটা শক্ত হইলে, কুম্ভীর উহাকে জলের ভিতর রাখিয়া দেয়। যতক্ষণ না পচিয়া নরম হয়, ততক্ষণ খায় না। এই সময় কুম্ভীর খাবার আগুলিয়া বসিয়া থাকে। যদি অন্য কুম্ভীর তাহার খাবার খাইতে আসে, তবে উভয়ের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। জলের মধ্যে সে আস্ফালন দেখে কে! কুম্ভীর অনেক খায়, কিন্তু না খাইয়াও অনেক দিন বাঁচে।

এই সকল কুম্ভীর সচরাচর নদীর লোণা জলে বাস করে। নদীর মোহানা দিয়া সমুদ্রেও যাতায়াত করে। এই সকল কুম্ভীরের আকার দীর্ঘে সচরাচর আট, নয়, কি দশ হাত হয়। কিন্তু ইহার দ্বিগুণ আকারের কুম্ভীরও দেখা গিয়া থাকে। ইহারা সাধারণতঃ মৎস্যাদি জলজন্তু এবং নদীতে যে সকল শবদেহাদি ভাসিয়া যায় তাহাই খাইয়া জীবনধারণ করে বটে, কিন্তু সুবিধা পাইলে, জীবন্ত মানুষটা, গোরুটা, ছাগলটাকেও ছাড়িয়া কথা কয় না। মানুষ স্নান করিতে জলে নামিয়াছে, কুমীর দূর হইতে দেখিয়া ডুবিল। একটু পরেই দেখা গেল কুম্ভীর মানুষটিকে ডুবাইয়া লইয়া চলিল। মাঝি নৌকা বাঁধিয়া, নৌকার পাশে বসিয়া নদীর জলে মুখ হাত ধুইতেছে। আর একবার যাই ঘাড় নীচু করিয়া জলে হাত বাড়াইতে গেল, অমনই কুমীর জলের ভিতর হইতে লেজের ঝাপ্‌টা মারিয়া মাঝিকে লইয়া পলাইল। নদীর ধারে গোরু বাছুরগুলি চরিতেছে, কুম্ভীর মহাশয় জলের উপর ভাসিয়া ভাসিয়া একমনে তাহাই দেখিতেছেন ও তাঁহার জিহ্বায় লাল সরিতেছে। তৃষ্ণায় কাতর হইয়া গোরুটি জল খাইতে নদীর দিকে আসিতে লাগিল, কুম্ভীর মহাশয়ও আশান্বিত হইতে লাগিলেন এবং কতক্ষণে আর দু চার পা এগিয়ে আসে এইটি ভাবিয়া তাঁহার মনটা আন্‌চান্ করিতে লাগিল। গোরুটি তাঁহাকে দেখিল না বা তাঁহার মনের কথা বুঝিল না, গিয়া জলে মুখ দিল। এ দিকে গোরু জলে মুখটি দিবার আগেই কুম্ভীর মহাশয় এমন একটি ডুব মারিয়াছেন যে, সেই এক ডুবেই গোরুর কোলের নিকট আসিয়া হাজির। জলের ভিতর হইতে তখন সপাং করিয়া গোরুর সম্মুখের পা দুইটিতে এমন জোরে লেজের আঘাত করিলেন যে, গোরু মুখ থুবড়িয়া জলে পড়িয়া গেল। গোরুর যাই জলে পড়া, কুম্ভীর মহাশয়েরও অমনি কাঁধে চড়া। কাঁধে চড়িয়াই ঘাড়ে কামড় দিয়াই হুটপাট্ করিয়া তাহাকে জলের মধ্যে টানিয়া লইয়া চলিলেন।

তোমরা হয় ত মনে করিতেছ জলের ভিতর এত হুটোপাটি, কুমীরের নাকে মুখে জল ঢুকিয়া যায় না? তা যায় না। তা গেলে যে, জল খেয়ে খেয়ে আর বিষম লেগে লেগেই কুমীরের প্রাণ বিয়োগ হইত! কুম্ভীরের নাকের ছিদ্র কোথায় আছে জান ত? কুমীরের ওষ্ঠভাগকে চলিত কথায় কুমীরের থুত্‌নী বলে। এই থুত্‌নীর উপরেই কুম্ভীরের নাসিকার ছিদ্র। কুম্ভীর মধ্যে মধ্যে এই থুত্‌নী ভাসাইয়াই বায়ু গ্রহণ করে। আমরা জলের ভিতর অতি অল্পক্ষণ ডুবিয়া থাকিতে গেলেও হাঁপাইয়া উঠি এবং জলের ভিতর যদি হুটোপাটি করিতে যাই, তবে নিশ্চয়ই নাকে মুখে জল ঢুকিয়া খুন হই। কুম্ভীরদের কিন্তু তেমন হয় না। তাহার কারণ কুম্ভীরেরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্তও নিশ্বাস গ্রহণ না করিয়া বাঁচিতে পারে। এই জন্য কোন জন্তুকে আক্রমণ করিলেই কুম্ভীর মাংসপেশী প্রসারিত করিয়া নাসিকার ছিদ্র বন্ধ করিয়া ফেলে। আমরা যেমন চাহিয়া আছি, আবার সহজেই চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারি, কুম্ভীরও তেমনই সহজে

নাসিকার ছিদ্র বন্ধ করিয়া ফেলিতে পারে। সুতরাং নাসিকা দিয়া জল প্রবেশ করিয়া কুম্ভীরকে কষ্ট দিতে পারে না। আবার, আমাদের গলার ভিতর সম্মুখেই অন্ননালী এবং তাহার পশ্চাতেই বায়ুনলী আছে। নাসিকার ছিদ্রে বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া বায়ুনলী দিয়া যেমন বাতাস ফুসফুসে গিয়া উপস্থিত হয়, খাবার জিনিসও তেমনি মুখ হইতে অন্ননালী দিয়া উদরে গিয়া পড়ে। কুম্ভীর কোনও জন্তুকে ধরিলে পেশী প্রসারিত করিয়া এই অন্ন-নালীর পথটাও বন্ধ করিয়া দেয়। অন্ননালীর পথে কপাট পড়িয়া গেল, সুতরাং জলও আর কুমীরের পেটের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিল না। কুম্ভীরের কাণেও জল যাইতে পারে না। পেশী প্রসারিত করিয়া কুম্ভীর কাণের ছিদ্রও বন্ধ করিতে পারে। এখন যে জন্তুটিকে কুম্ভীর ধরিয়াছে, সেটি একটু জখম হইলেই, চাই কি সে নিজে থুত্‌নীটি ভাসাইয়া নাসিকার ছিদ্র খুলিয়া বায়ু গ্রহণ করিতে করিতে ভাসিয়া যাইতে পারে। অন্ননালীর পথ বন্ধ রহিল, সুতরাং উদরের মধ্যে জল প্রবেশ করিতে পারিল না, অথচ উপরের বায়ুনলী দিয়া স্বচ্ছন্দে শ্বাস-প্রশ্বাসও চলিতে লাগিল।

তোমরা দেখিয়াছ, মানুষের দাঁত যেরূপ নিয়মে সাজান, কুকুর বিড়ালের দাঁত সেরূপ নিয়মে সাজান নয়—তাহাদের দাঁত ফাঁক ফাঁক। কুম্ভীরেরও তেমনই। কুম্ভীরের দাঁতের গোড়াগুলা ফাঁপা, সেখানে আর এক পাটি দাঁতের অঙ্কুর থাকে। দাঁত এক দফা ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইলেই নীচে দিয়া আর এক দফা দাঁত উঠিতে থাকে। এমন করিয়া অনেকবার তাহাদের দাঁত বদল হয়। আমাদের দেশের লোকেরা বলিয়া থাকেন, কুমীরের জিভ নাই। দেখিলেও তাহাই বোধ হয় বটে। অভি-ধানে কুম্ভীরের একটি নাম তালুজিহ্ব। তালু দ্বারা ইহার জিহ্বার কার্য্য সম্পন্ন হয় বিশ্বাস করিয়াই পণ্ডিতগণ ইহার এইরূপ নামকরণ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। বাস্তবিকও জিহ্বার মত জিহ্বা কুম্ভীরের নাই। কুম্ভীরের যে জিহ্বা, তাহার দুইটা পাশ দুই দিকের নীচের চোয়ালের সঙ্গে আঁটা। কুম্ভীরের মুখে জিহ্বার স্থানে সেটা দেখিতেও কেমন একটা অদ্ভুত রকম। মানুষ প্রভৃতির জিহ্বা নীচের দুই চোয়ালের সঙ্গে আঁটা নয় বলিয়া তাহার জিহ্বা অক্লেশে বাহির করিতে পারে; ডাহিনে বামে, উপরে নীচে, চারিদিকে অনেকটা ফিরা-ইতে ঘুরাইতেও পারে। কুম্ভীরের কিন্তু তা নয়। কুম্ভীরের জিহ্বা যেখানে শুইয়াছেন, চিরকাল সেই খানেই শুইয়া আছেন—নড়ন চড়নের বড় একটা ধার ধারেন না।

কুম্ভীরের সম্মুখের পায়ে পাঁচটি করিয়া দশটি, এবং পশ্চাতের পায়ে চারিটি করিয়া আটটি, মোট আঠারটি অঙ্গুলি। নখ কিন্তু, কি সম্মুখের, কি পশ্চাতের, কোনও পায়েই তিনটির বেশি নয়। কুম্ভীরের পিছনের পায়ের অঙ্গুলিগুলি হাঁসের পায়ের পাতার মত চামড়া দিয়া জোড়া। কুমীরের পিঠের চামড়া বিলক্ষণ কঠিন; পেটের চামড়া অনেকটা নরম।

এ দিকে সে দিকে বাঁকিয়া চুরিয়া চলিলে, ডাঙ্গায় কুম্ভীরের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। কুম্ভীরের ঘাড়ে পাঁজরা হয়। পাঁজরা এমন ভাবে থাকে যে, কুম্ভীরের এ দিক সে দিক ঘাড় ফিরাইয়া ছুটিবার সুবিধা হয় না। আমাদের দেশে সকলেই শুনিয়াছেন, জলে কুম্ভীরের চোকে আঙ্গুল দিতে পারিলে কুম্ভীর তখনই মানুষকে ছাড়িয়া দিয়া পলায়। আফ্রিকা ও আমেরিকার লোকেরাও এ কৌশলটি জানে।

কুম্ভীর বালির ভিতর ডিম পাড়ে। ইহারা

একবারে পঁচিশটি পর্য্যন্ত ডিম পাড়িতে পারে। ডিমগুলি রাজহাঁসের ডিমেরই মত। ডিম পাড়িবার পর কুম্ভীর আর তার কোন খবরই লয় না। শিকারি পশু পক্ষীতে এই ডিমের অনেক নষ্ট করিয়া ফেলে। বেজীই কিন্তু এই কর্ম্মে বিশেষ পটু। ডিম ফুটিয়া ছানা হইবার পর, সম্মুখে পাইলে কুম্ভীর নিজেও যে তাহার দুই চারিটা ভক্ষণ না করিয়া ছাড়ে, এমনও নয়।

প্রস্তাবটি দীর্ঘ হইল। আবশ্যক হইলে, কুম্ভীর-শিকার সম্বন্ধেও দুই একটা কথা আমরা অপর এক সময়ে "সখার" পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিব।

তোতাপাখী।
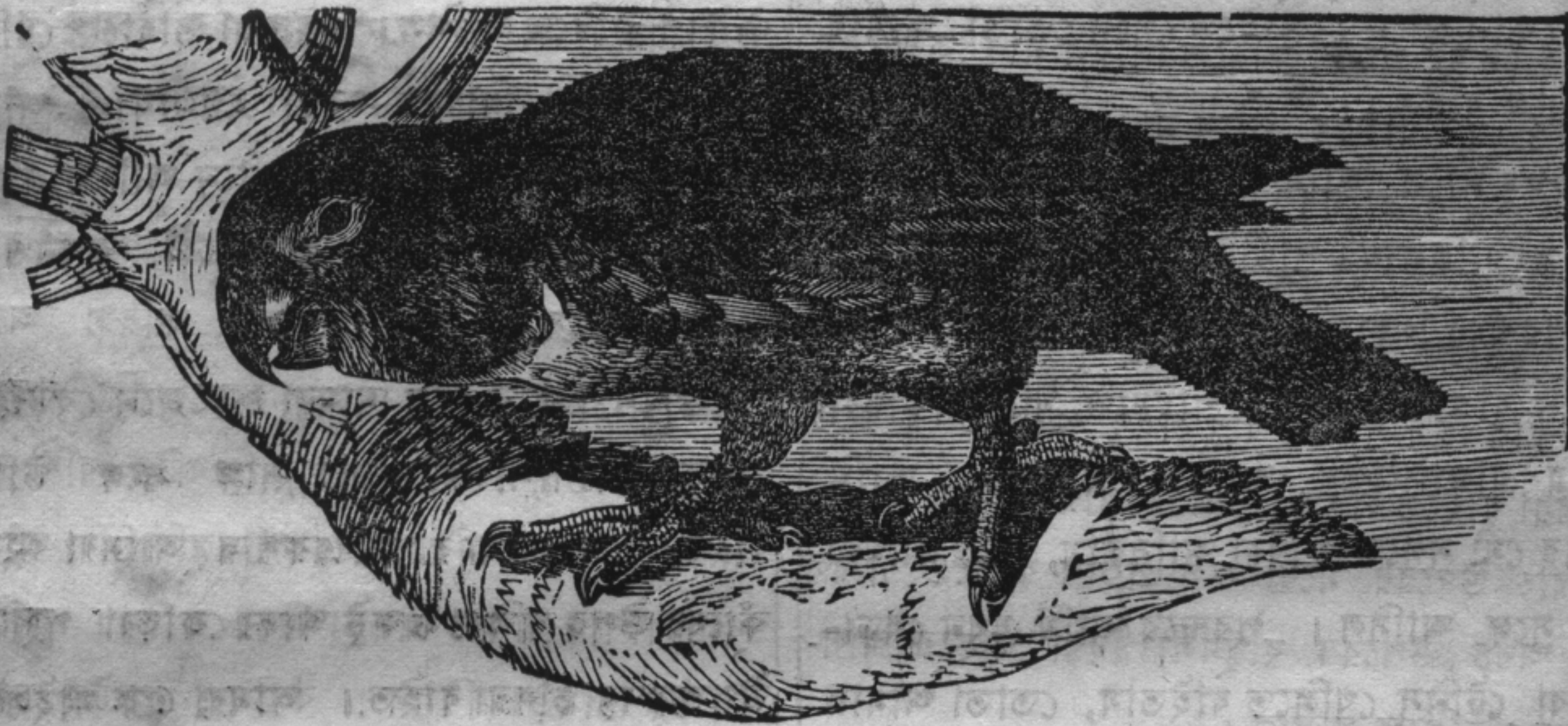
সংপ্রতি জনৈক সৈনিক কর্ম্মচারী পাইয়োনিয়র পত্রিকায় একটী তোতা পাখীর (Parrot) কথা লিখিয়াছেন। "সখার" পাঠকপাঠিকাদিগের জন্য আমরা প্রবন্ধটির অনুবাদ করিয়া দিলাম।

"১৮৮১ সালের শেষভাগে মধ্য ভারতে মৌ নগরে আমি তিনটী তোতা পাখীর ছানা ক্রয় করিয়াছিলাম, তখনও তাহাদের পালক উঠে নাই। কয়েক মাস পরে তাহাদের শরীর অত্যন্ত অপরিষ্কার দেখিয়া আমি উহাদিগকে ছাড়িয়া দিলাম। দুইটী উড়িয়া কোথায় চলিয়া গেল, একটী মাত্র ফিরিয়া আসিল। আমার শয়নগৃহে একটী পুরাতন সোলার টুপির মধ্যে তাহার বাসা বানাইয়া দিলাম এবং খানসামাকে উহার মধ্যে প্রত্যহ ভিজা রুটি রাখিতে বলিয়া দিলাম। পাখী তাহার আহারের এ বন্দোবস্তটী বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। সে সমস্ত দিন আমাদের সেনা-নিবাসের চতুর্দ্দিকে উড়িয়া বেড়াইত, এবং ক্ষুধা পাইলে আসিয়া ভিজা রুটির সদ্ব্যবহার করিত।

১৮৮২ সালের মে মাসে আমি কিছু দিনের জন্য স্থানান্তরে শিকার করিতে গিয়াছিলাম। ৬ সপ্তা-

হের পর ষ্টেশন হইতে থাকিবার বাঙ্গালায় ফিরিয়া যাইবার সময় দেখিলাম, আমার নিকট দিয়া একটী তোতা বারম্বার উড়িয়া যাইতেছে। আমি তখনও কিছু বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু একটু পরেই পাখীটী আমার কাঁধের উপর উড়িয়া বসিল। তৎক্ষণাৎ তাহাকে চিনিতে পারিলাম। অনেক দিনের পর তোতা আমাকে দেখিয়া সস্নেহে আমার গালের উপর উহার মাথা ঘসিতে লাগিল। দেখিয়া বোধ হইল, তাহার ক্ষুদ্র শরীর দিয়া যেন আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। এই সময় হইতে আমার প্রতি উহার ভালবাসা যেন ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। আমি কোন স্থানে বেড়াইতে গেলে তোতা আমার সঙ্গে সঙ্গে যাইত।

১৮৮৪ সালে আমি কিছু দিনের জন্য পুরন্দরে বদ্‌লি হইয়াছিলাম। পাখীটীকে আমার সঙ্গে নিলাম এবং পুরন্দরে গিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু সে বনে যাওয়ার সুবিধা পাইয়াও, ঘুরিয়া ফিরিয়া আমার বাঙ্গালাতেই আসিয়া থাকিত। আমি পুনরায় মৌ নগরে ফিরিয়া আসিলাম, সেও আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিল। পুরন্দরে আমি যখন বেড়াইতে বা টেনিস্ খেলিতে যাইতাম, তোতা আমার সঙ্গে সঙ্গে যাইত। কখনও আমার পূর্ব্বে কখনও আমার পরে বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিত। আমার খাওয়ার সময় সে কোথাও থাকিত না। কখনও আমার টেবিলের উপর, কখনও আমার কাঁধের উপর বসিত; হাবভাবে স্পষ্টই বুঝা যাইত সে কিছু চায়। তাহার সাহস ও স্পর্দ্ধাটুকু এতই বাড়িয়াছিল যে, আমার মুখ হইতেও সে সময় সময় খাদ্য দ্রব্য লইয়া খাইতে কুণ্ঠিত হইত না।

আমি একদিন নিকটেই জনৈক উচ্চপদস্থ সৈনিক পুরুষের বাড়ী জলযোগের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। পোলী (তোতাকে এখন হইতে এই নামেই আমি ডাকিতাম) তখন বাড়ীতে ছিল না এবং আমার নিমন্ত্রণে যাওয়ার বিষয় কিছুই জানিতও না। আমি আমার নিমন্ত্রণকারীর সহিত বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময় বাহিরে পোলীর গলার শব্দ শুনিতে পাইলাম। সে যেন কিছু খুঁজিতেছে এবং একবার এ দিকে একবার ও দিকে উড়িয়া যাইতেছে ও ডাকিতেছে। বারান্দা চালের দ্বারা ঢাকা, বাহির হইতে আমাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা ভিতরে বসিয়া গল্প করিতে করিতে ধীরে ধীরে আহার করিতেছিলাম। পোলী হঠাৎ গৃহমধ্যে উড়িয়া আসিয়া আমার কাঁধের উপর বসিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। আমরা তাহাকে দেখিয়া যার-পর-নাই বিস্মিত হইয়া গেলাম। আমার অনুসন্ধানে সে কি প্রকারে এখানে আসিল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সে পূর্ব্বে কখনও এ বাড়ীতে আসে নাই।

কোন কোন দিন আমরা ৪।৫ জনে বেড়াইতে যাইতাম, পোলী আমাদের সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া যাইত, পথের মধ্যে হঠাৎ একবার আসিয়া আমার কাঁধের উপর বসিয়া একটু আদর করিয়া পর্ব্বতের উপত্যকায় চলিয়া যাইত। আমরা এক মাইল দুই মাইল গিয়াছি, দেখি পোলী কোথা হইতে আসিয়া আবার আমার কাঁধে বসিয়াছে। আমরা বেড়াইতে যাইবার সময় সে বাঙ্গালাতে না থাকিলেও আমি শিশ্ দিবা মাত্র সে কোথা হইতে উড়িয়া আমার কাছে আসিত।

১৮৮৪ সালের শেষে আমি নিমাক আসিলাম। পথিমধ্যে পোলী একটী খাঁচার মধ্যে থাকিত। কিন্তু তাহার এই অধীনতা ভাল লাগিত না; সর্ব্বদাই খাঁচার বাহির হইতে চেষ্টা করিত। এখানে আসিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম, সে তৎক্ষণাৎ আপন শ্রেণীর পাখীদের সহিত মিশিয়া

গেল। কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার অপর একটী পাখীর সহিত খুব ভাব হইল। তাহাকে সঙ্গে করিয়া পোলী আমার বারান্দায় আসিয়া বসিত। দুই বন্ধুতে সর্ব্বদা খেলা করিত। পোলী তাহার বন্ধুকে নিজের বাসায় রাখিতে খুব চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হইল না। সন্ধ্যা হইলে পোলীর বন্ধু চলিয়া যাইত এবং প্রভাত হইতে না হইতেই সে আসিয়া পুনরায় পোলীর সহিত মিলিত হইত। ইহার কিছু দিন পরে পোলী আবার সমস্ত দিন বাহিরে বাহিরেই থাকিত, কেবল রাত্রিতে আসিয়া গৃহবাস করিত এবং শেষে কয়েক মাস আমি আর তাহাকে মোটেই দেখিতে পাই নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম, পোলী বুঝি আর আমার নিকট আসিবে না, নিজের আত্মীয় অন্তরঙ্গ পাইয়া আমাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। ৪।৫ মাস যাবৎ তাহার সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নাই। একদিন প্রাতর্ভোজনের পরে আমি বেড়াইতেছিলাম, কতকগুলি তোতা আমার মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। অকস্মাৎ একটী আমার কাঁধের উপর আসিয়া বসিল। দেখিয়াই আমি আমার পুরাতন বন্ধুকে চিনিলাম। সে আশ্চর্য্য রকমে তাহার ভালবাসা দেখাইতে লাগিল।

কয়েক মাস পরে আবার সে কোথায় চলিয়া গেল। কিন্তু কিছুদিন পরে পুনরায় ফিরিয়া আসিল। বুঝিলাম ডিম পাড়িতে, ডিমে তা দিতে এবং ছানাগুলিকে উড়িতে শিখাইতে যত সময় প্রয়োজন হয়, ততদিন পোলী আমার নিকট থাকে না।

দ্বিতীয় বার পোলী বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসার পর, একদিন বাহিরে যাইবার সময় দরজায় আঘাত পাইয়া পড়িয়া গেল। আঘাত গুরুতর হইয়াছিল; পোলী বড়ই বেদনা পাইল। খানসামারা তাহার সম্মুখে গেলে, সে সকলকেই কামড়াইতে যাইতে লাগিল। তখন তাহারা তোয়ালে দিয়া তাহাকে ধরিয়া আমার শুইবার ঘরে আনিল ও আমাকে সংবাদ দিল। আমি বাহিরে ছিলাম। গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র আমাকে দেখিয়া পোলী নিজের কষ্ট ভুলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং আমার খুব কাছে আসিল। পোলীর যে স্থানে আঘাত লাগিয়াছে, সে স্থানটি বাঁধিয়া সমস্ত রাত্রি বসিয়া আমি ঔষধ দিলাম। কিন্তু কোনই ফল হইল না। আমাদিগকে কাঁদাইয়া, রাত্রি চারিটার সময় সে সমস্ত যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। তাহার পরদিন আর পোলীকে কেহই দেখিতে পাইল না।

সময় সময় ইতর প্রাণীদিগের মধ্যে আমরা এইরূপ বুদ্ধিশক্তি ও স্নেহ মমতার অনেক পরিচয় পাইয়া থাকি। কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া অবাক্ হইয়া যাই। মনে মনে তখনই বলিয়া ফেলি, "ঈশ্বর তুমিই ধন্য"!

ঠাকুরদাদার গল্প।

আজ শনিবার। সন্ধ্যাকালে নবীন বাবু বালকগণকে সঙ্গে লইয়া মাঠের দিকে বেড়াইতে যাইতেছেন, পথে নানাবিধ গল্প ও কথা-বার্ত্তা চলিতেছে। সূর্য্য অস্তগত-প্রায়, পশ্চিম দিকের আকাশ সুন্দর রক্তিমাবর্ণে কেমন শোভা পাইতেছে, গো মেষ মহিষ ও ছাগদল গোষ্ঠ-

বিহার করিয়া মনের আনন্দে কোলাহল করিতে করিতে গৃহে চলিয়াছে। নবীন বাবু ও তাঁহার বালকবৃন্দ প্রফুল্ল অন্তঃকরণে মৃদু মন্দ গতিতে গ্রামের সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন।

অনতিদূরে কিসের গোলমাল শুনা গেল। চাহিয়া দেখেন, পূর্ব্ব দিকেও যেন সূর্য্যাস্ত হইতেছে এমনি প্রকাণ্ড উজ্জ্বল আলোক। মাঝে মাঝে ঐ দূরতা ভেদ করিয়া যেন আগুনের হলকা আকাশে দৃষ্ট হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিলেন ঘরে আগুন লাগিয়াছে। সকলে দ্রুত গতিতে যে দিক হইতে অগ্নি দেখা দিতেছিল সেই দিকে ধাবিত হইলেন। অল্প দূর গিয়াই বুঝিলেন যে রামসুন্দর বাবুর বাগানের কুঠিতে আগুন লাগিয়াছে।

উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে অগ্নি খুব প্রজ্বলিত। কেরোসিন তৈলের টীনে আগুন লাগিয়া তাহাতেই এ গৃহ জ্বলিয়াছে। দেখিলেন চারিদিক হইতে বিস্তর লোক কলসী ও ঘড়া করিয়া জল দিতেছে এবং নিকটস্থ থানা হইতে দমকলও আনান হইয়াছে—সম্মুখের পুষ্করিণী হইতে জল তুলিয়া গৃহের জ্বলন্ত দরজা জানালাতে দেওয়া হইতেছে।

অল্পক্ষণ পরেই অগ্নির প্রকোপ কমিয়া আসিল। পম্পের সাহায্যে অধিক ক্ষতি হইতে পারিল না। শুদ্ধ কলসী করিয়া জল দিয়া এ অগ্নি নিবান যাইত না। পম্পের দ্বারা দূর হইতে সজোরে জ্বলন্ত স্থানে জল নিক্ষেপ করিয়া অতি সহজেই আগুন নিবান হইল। গৃহসামগ্রীও অধিক নষ্ট হইতে পাইল না।

যতক্ষণ নবীনবাবু গৃহের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন ও অগ্নি নির্ব্বাণের জন্য সচেষ্ট ছিলেন, তাঁহার সঙ্গের বালকগণ ততক্ষণ কেবল পম্পের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জল তোলা দেখিতেছিল। একচিত্তে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছিল কেমন করিয়া জল উঠে। কিন্তু ভিতরের কল্ কিরূপ জানিতে না পারায় তাহার কৌশল কিছুই বুঝিতে পারিল না।

বাটী যাইবার সময়ে নলিনী দাদাবাবুকে বলিল:—"ঐ কলটাতে কিরূপে জল উঠিতেছে জানিতে পারিলাম না। ইহার কৌশলটা শিখিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

নবীন বাবু।—বাঃ! যার যেখানে ব্যথা তার সেইখানে হাত! আমার বন্ধুর ঘর পুড়িয়া গেল, তোমরা বুঝি তাহাতেও আপনাদের শিক্ষার ফিকিরে আছ? ভাল ভাল। এইরূপ যত্ন না হইলে কোন কাযই হয় না। চল, এখন বড় ক্লান্ত হইয়াছি, বাড়ী গিয়া বুঝাইয়া দিব।

অমূল্য।—দাদাবাবু, আমার কিন্তু বোধ হইতেছে এ বিষয়টী আমাদের পক্ষে বেশী কঠিন হইবে। কল কারখানা বুঝিতে পারা এঞ্জিনীয়ার না হইলে হয় না। এখনও আমরা এত বেশি শিখি নাই যে এ কলের ব্যাপারটা বুঝিতে পারি। তাই আমি ভাবিতেছিলাম যে এখন আপনাকে কষ্ট দিব না।

নবীন বাবু।—অবশ্য এ সব কল কারখানার নিগূঢ় তত্ত্ব যে তোমরা এখন বুঝিতে পারিবে, তাহা অসম্ভব। তবে যেমন মোটামুটি রূপে গুড়গুড়ীর কল ও ধূঁয়া মুখে আসিবার কারণ বুঝিতে পারিয়াছ, তেমনি মোটামুটি ভাবে, দমকলে কেন জল উঠে তাহাও বুঝিতে পারিবে। পরে যখন কলেজে বড় বৈ পড়িবে, তখন স্পষ্টরূপে এ তত্ত্ব অবগত হইবে।

তখন সকলে ঐ অগ্নিকাণ্ডের ভয়ানক ব্যাপার সম্বন্ধে গল্প করিতে করিতে বাড়ীতে আসিয়া পহুঁছিলেন। কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিবার পর ঠাকুরদাদা মহাশয় পাঠাগারে বসিয়া দমকলের মর্ম্ম বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন।

নবীন বাবু।—পার্শ্বস্থ ছবিটীতে (জ) জল। তাহার মধ্যে দমকলের নিম্নের নল (থ গ) গিয়াছে। উপরের নলটী (চ খ) কিছু বেশি মোটা। এই দুই নলের মাঝখানে একখানি ছোট কব্জাদার কপাট লাগান (১)। উহা এমন ভাবে লাগান যে উপর দিকে উঠে, নীচের দিকে নামে না। ইহাকে "ভাল্‌ভ্‌" (valve) বলে। ইহা অতি লঘু, সুতরাং নীচের দিক হইতে অল্প বল প্রয়োগ করিলেই উপরে উঠিয় যায় কিন্তু উপরিভাগ হইতে যত বল প্রয়োগ করা যায়, ততই আরও শক্ত হইয়া বন্ধ হয়, আর খুলে না। (প) একটী "পিষ্টন্‌" * ইহা—(প-র) "পিষ্টন্‌-রডে" সংলগ্ন হইয়া উপরের নলে (ক) হইতে (খ) পর্য্যন্ত একবার নামে ও আবার উঠে। (হ) হাতল দ্বারা এই পিষ্টন্‌ নামান ও উঠান হয়। এই পিষ্টনের মধ্যস্থলে (২) নম্বর একটী কব্জা লাগান দ্বার বা "ভাল্‌ভ্‌" আছে। তাহাও (১) নম্বর ভাল্‌ভের ন্যায় নীচে হইতে উপরে খোলে, উপরে বল প্রয়োগ করিলে কসিয়া বন্ধ হইয়া যায়। (ঘ) জল বাহির হইবার পথ। যখন বার বার (হ) হাতল দ্বারা (প) পিষ্টনটীকে (ক) হইতে (খ) পর্য্যন্ত ভিতর দিয়া ক্রমে ক্রমে (ঘ) পর্য্যন্ত উঠাইয়া পরে নামান ও উঠান যায়, তখন নিম্নস্থ জল নলের বাহিরে আসে। তখন (ন) চামড়ার নলে করিয়া যত দুরে ইচ্ছা লইয়া যাওয়া যায়।
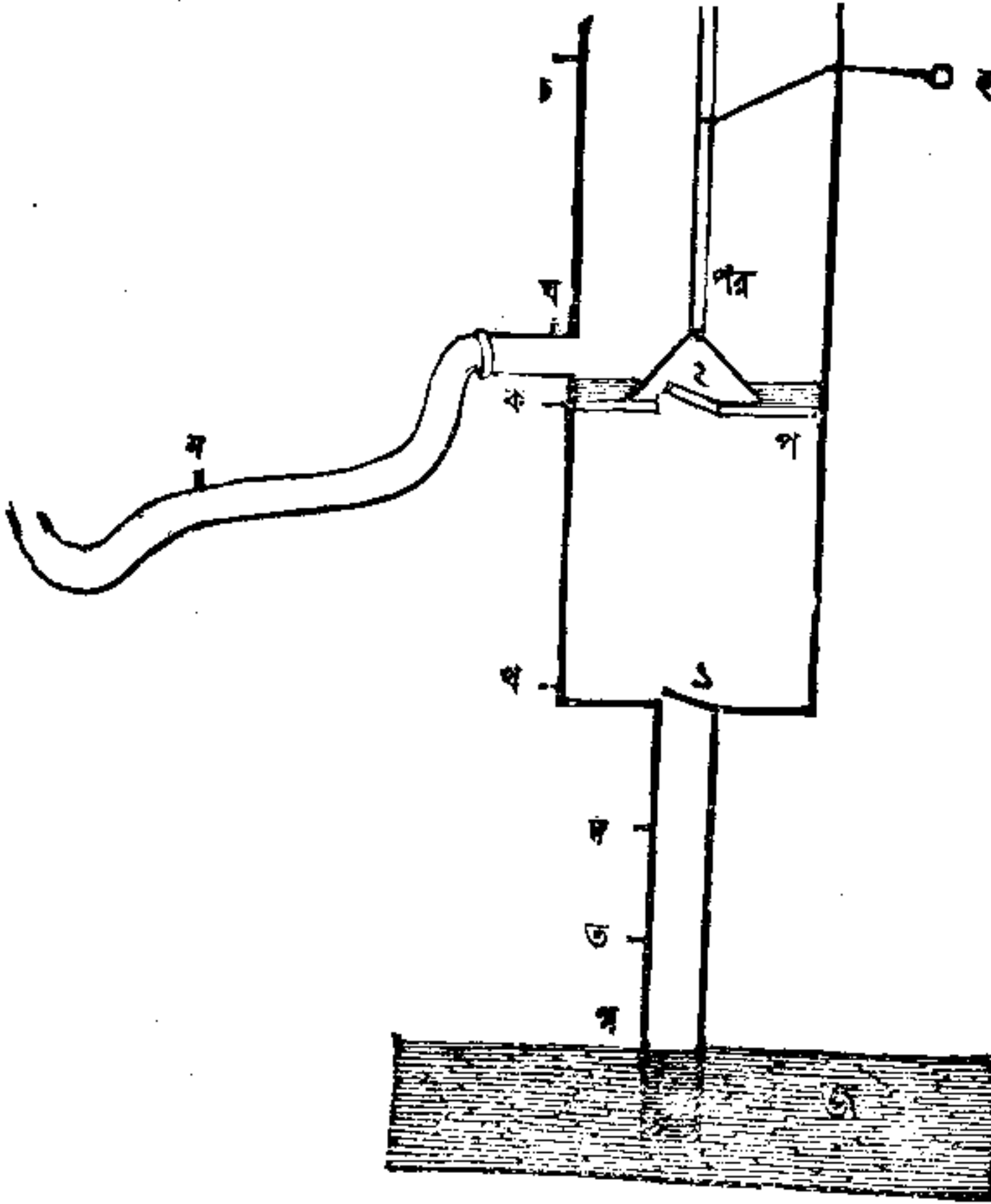
দম্‌কলের মোটামুটি কল কৌশল এই। জল উঠিবার নিয়ম ও কারণ এই :—সর্ব্বপ্রথমে মনে কর (প) পিষ্টন্‌টী (খ)তে আছে। তখন (জ) জলের উপরিভাগে সাধারণ বায়ুভার; (থ গ) নলের মধ্যেও সাধারণ বায়ু। সুতরাং ঐ নলের মধ্যেও জলের উচ্চতা বাহিরের জলের সহিত সমান; অর্থাৎ (গ) রেখাতে।

আচ্ছা, এখন (প) পিষ্টন্‌টী হাতলের দ্বারা উঠাও। যেন (ক) পর্য্যন্ত উঠিল। উঠিবার সময়ে (২) নম্বর দ্বার উপরের চাপে বন্ধই থাকে। কিন্তু নীচে কি হয় দেখা যাউক। (প) পিষ্টন্‌ উপরে উঠিবার সময়ে (ক খ) স্থানের বায়ু লঘু হইয়া যায় এবং উহার চাপ খুব কম হয়। এদিকে (খ গ) স্থানে নলের ভিতর সাধারণ বায়ু আছে বলিয়া তথাকার বায়ুর চাপ (ক খ) স্থানের অপেক্ষা বেশি। সুতরাং (১) নম্বর দ্বার নীচের বায়ুর জোরে উপরের দিকে একটু খুলিয়া যায় ও তন্মধ্য

* পিচকারির ভিতরে জল উঠিবার ও সজোরে ঐ জল ছুড়িয়া দিবার কৌশল সকলেই জান। গোড়ার দিকে একটী হাতল থাকে, তাহাতে একটী লোহার কাঠী লাগান থাকে। ঐ কাঠীতে পিচ্‌কারির নলের ভিতর একখানি টীনের চাক্তি সংলগ্ন থাকে। এই টীনের চাক্তির দ্বারাই জল ঠেলিয়া দেওয়া হয় এবং ইহা টানিলেই জল উঠে। এই চাক্তিখানি পিষ্টন্‌, ও ঐ কাঠীর নাম পিষ্টন-রড (Piston-rod); এ দৃষ্টান্তে সহজে বুঝিতে পারিবে।

দিয়া (খ গ) স্থানের বায়ু (ক খ) স্থানে প্রবেশ করে।

তাহার ফল এই হয় যে, (খ গ) অংশের বায়ু লঘু হওয়াতে তাহার চাপ হ্রাস হইয়া যায়। আবার জলাশয়ের উপরিস্থ বায়ুর সাধারণ চাপ অপেক্ষা (খ গ) অংশের বায়ুর চাপ কম হওয়াতে (গ) স্থানের জল (গ খ) নলের উপর কিছু দূর উঠিয়া গেল। মনে কর যেন (ত) রেখা অবধি উঠিল।

তার পর, হাতল ধরিয়া পিষ্টন্‌টা নামাও। (ক) হইতে ক্রমে (খ) অবধি নামিয়া আসিবার সময় কি হয় দেখা যাউক। ১ম ঃ—(ক খ) স্থানের বায়ুর চাপে (১) নম্বর দ্বার পড়িয়া বন্ধ হইয়া যাইবে ও (খ ত) স্থানের বায়ুর চাপ সমভাবে থাকাতে (খ গ) নলে (ত) পর্য্যন্ত জল পূর্ব্ববৎ থাকিবে। ২য় :—পিষ্টন্ যত নামে, স্থান সঙ্কীর্ণ হওয়াতে (ক খ) স্থানের বায়ু ঘনীভূত হইয়া উহার চাপ বৃদ্ধি হয়। কাজে কাজেই (২) নম্বর দ্বার নীচের চাপে উপর দিকে একটু খুলিয়া যায় ও তাহার ভিতর দিয়া ঐ বায়ু বাহির হইয়া যায়। অবশেষে পিষ্টন্ (প) নীচে নামিয়া আসিয়া (খ) রেখাতে মিলিত হয়।

সুতরাং তোমরা দেখিতেছ যে পিষ্টন্ (খ) হইতে উঠিবার সময়ে (খ ক) স্থানের বায়ু উপরে তাড়াইয়া দিয়া (খ গ) স্থলের বায়ু (১) নম্বর দ্বার দিয়া উপরে আকর্ষণ করিয়া লইল ও তাহার ফলে জলাশয় হইতে (ত) অবধি জল উঠিল।

আবার, পিষ্টন্ নামিবার সময়ে (ক খ) অংশের বায়ুকে (২) নম্বর দ্বার দিয়া উপরে তাড়াইয়া দিয়া পুনরায় (খ)তে আসিয়া পহুঁছিল। (ত) স্থানের জল (১) নম্বর দ্বার বন্ধ থাকাতে নামিতে পারিল না।

এইরূপে হাতল ধরিয়া আবার পিষ্টন্‌টাকে (ক) পর্য্যন্ত উপরে উঠাইয়া দাও। তাহাতে এই হইবে যে, পূর্ব্বের মত (ত) স্থানের জল (দ) পর্য্যন্ত উঠিবে। আবার পিষ্টন্ নামিবার সময় (১) নম্বর দ্বার বন্ধ হইবে ও জল ঐ (দ) পর্য্যন্ত থাকিয়া যাইবে। পিষ্টন্ আবার উঠাও, আবার নামাও। এইরূপ করিতে করিতে ক্রমে যখন জল (১) নম্বর দ্বারে পহুঁছিবে, তখন উহা খুলিয়া যাইয়া জল তাহার উপরে (খ ক) নলের মধ্যে প্রবেশ করিবে। এবার যখন পিষ্টন্ নামিয়া (খ)তে পহুঁছিবে, তখন (২) নম্বর দ্বার দিয়া (ক খ) নলের মধ্যস্থ জল (প) পিষ্টনের উপরে উঠিয়া পড়িবে।

তৎপরে যখন পিষ্টন্ আবার (ক) পর্য্যন্ত উঠে, তখন কাযেই ঐ জল (ঘ) মুখ দিয়া দমকলের বাহির হয়। তখন চামড়ার নল (ন) দিয়া তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে লইয়া যাইতে পার। রাস্তায় জল ছড়াও, ঘরে আগুন লাগিলে তাহা নিবাও, যেরূপ চাও, কর।

এইরূপে পুনঃপুনঃ হাতল ধরিয়া তোলা ও নামানতে যখন (কখ ও খগ) সমুদয় স্থল বায়ুশূন্য ও জলপূর্ণ হইবে, তখন হু হু করিয়া কেবলই জল বাহির হইবে।

মাখন।—অতি পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়াছি। দাদাবাবু, আমার ইচ্ছা হইতেছে, একটা এইরূপ পম্প্ তৈয়ার করাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখি।

বালকগণ।—ঠিক, ঠিক। দাদাবাবু, আপনি যদি রামচরণ টীনওয়ালাকে বলিয়া দেন, ত সে ঐ রকম যন্ত্র গড়িয়া দিতে পারে।

নবীনবাবু স্বীকার করিলেন ও বলিলেন যে, এইরূপে সব কাজ নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বড় উপকার হইবে। সে দিন রাত্রি বেশী হইয়াছিল, সকলে শয়ন করিতে গেলেন।

ঝড়বৃষ্টি।

এ কি কালো মেঘ, বাপ্,
এ কি কাল ঝড়,
এ কাল-বৈশাখী পায়ে
কোটি কোটি গড়!
ছোটে পশু, ছোটে পাখী,
মাথা চেলে লোটে শাখী,
ওড়ে চালা, ডাল পালা
ভাঙে মড় মড়।
তাল, ঝাউ একগুঁয়ে,
তারাও পড়িছে নুয়ে,
গোড়া উচু ক'রে ভূঁয়ে
শুয়ে পড়ে বড়।
ঈশানে বায়ুর বেগ,
পাহাড়ের মত মেঘ
গুমরিয়া গুম্ গুম্
ডাকে গড় গড়।
বিজলী বিকট হাসে,
চক্ চক্ চোকে ভাসে,
মরি ত্রাসে—পড়ে বাজ
কড় কড় কড়।
ধরা দিতে রসাতল,
ক্ষেপা মেঘে ঢালে জল,
ঢালে জল—ঢালে জল
ছড় ছড় ছড়।
দশ দিক ভয়ে ভেকা,
বচন থাকিতে নেকা,
জলে জাড় বেঙ একা
ডাকে কড় কড়।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নূতন নির্ব্বাচিত সভ্য।

তোমরা বোধ হয় জান না, আমাদের ছোট লাট সাহেবের একটি ব্যবস্থাপক সভা আছে। ইহার নাম "বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা।" ছোটলাট বাহাদুরের শাসনাধীন প্রদেশের জন্য কোন আইনের প্রণয়ন, পরিবর্ত্তন বা সংশোধন আবশ্যক হইলে, এই সভার সভ্যগণ মিলিত হইয়া উহার মীমাংসা করেন। প্রতি বৎসর এ প্রদেশের আয়ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করা, কোন নূতন কর বা শুল্ক স্থাপন করা বা উঠাইয়া দেওয়া এবং এইরূপ অন্যান্য সমস্ত কার্য্যই এই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সম্মতিক্রমে হইয়া থাকে। সুতরাং এই সভায় প্রজাপক্ষীয় লোক সভ্যরূপে স্থান পাইলেই প্রজা সাধারণের মঙ্গল। এত দিন কিন্তু লাট সাহেব নিজেই এ সভার সভ্য মনোনীত করিতেন। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের অনুগৃহীত ব্যক্তিগণই এ সভায় স্থান পাইতেন। তাঁহাদের দ্বারা সকল সময় বাসনানুরূপ ফললাভের প্রত্যাশা করা অসম্ভব। দেশের লোকের এই অসুবিধা বুঝিয়া ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি কয়েক বৎসর হইতে এই সভা সংস্কারের জন্য আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি এই সকল আন্দোলনের ফলে একটু সুবিধা হইয়াছে। এই সভায় দেশীয় লোকের কয়েক জন করিয়া প্রতিনিধি লইবার নিয়ম হইয়াছে। এইবার এ দেশীয় লোকের নির্ব্বাচিত ছয় জন প্রতিনিধি এই সভায় স্থান পাইয়াছেন। তন্মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি রূপে বারিষ্টার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যো-

পাধ্যায়, কলিকাতা মিউনিসিপালিটির প্রতিনিধি রূপে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগের মিউনিসিপালিটির প্রতিনিধি রূপে বারিষ্টার শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ দেশের এই তিন রত্নও এই সভায় প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা তিন জনই বিদ্যা, বুদ্ধি, বাগ্মিতা, রাজনীতিজ্ঞতা ও স্বদেশহিতৈষিতার জন্য দেশের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত। ইঁহাদের নির্ব্বাচনে দেশের সকলেই আনন্দিত। ইঁহাদের দ্বারা দেশের উপকার হইবে এমন আশা করা যায়। বালকবালিকাদের জন্য আমরা ইঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি সহিত সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করিলাম।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। *

আজি কালি জ্ঞান ও বিদ্যায় যাঁহারা ভারতের শীর্ষস্থানে বিরাজিত, দেশের পরমহিতৈষী বলিয়া যাঁহারা পরিগণিত এবং দেশে ও বিদেশে সর্ব্বত্রই যাঁহারা পরিচিত ও সম্মানিত, বারিষ্টার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে এক জন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের আদি নিবাস হাবড়ার ৭।৮ ক্রোশ পশ্চিমে বাগাণ্ডা নামক স্থানে ছিল। ইহাঁর পিতামহ তথা হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। কলিকাতায় ও খিদিরপুরে ইহাঁর পিতামহের বিলক্ষণ বিষয় সম্পত্তি ছিল। এই খিদিরপুরের বাটীতে খ্রিঃ ১৮৪৪ অব্দের ২৯এ ডিসেম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হাইকোর্টের এটর্ণি ছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতাও অতি মাননীয় বংশের মহিলা। ইনি ত্রিবেণীর সুবিখ্যাত পণ্ডিত স্বর্গীয় জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের বংশজাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা সিমলার একটি ক্ষুদ্র পাঠশালায় এবং তৎপরে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি ও হিন্দু স্কুলে অধ্যয়ন করেন। বাল্যকালে ইঁহার পড়া শুনায় তাদৃশ অনুরাগ ছিল না, বরং খেলা ধূলার দিকেই মন ছিল। সুতরাং স্কুলেও তেমন প্রশংসা পাইতে পারেন নাই। খ্রিঃ ১৮৬১ অব্দে হিন্দু স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পাঠ সমাপ্ত করিয়াই তিনি স্কুল ছাড়িয়া দিলেন। পুনরায় স্কুলে পাঠাইয়া বিশেষ কোন ফল হইবার আশা নাই দেখিয়া ইঁহার পিতা সেই বৎসরেই ইঁহাকে নিজের ব্যবসায় শিখাইবার সঙ্কল্প করিলেন এবং অনতিবিলম্বেই সুপ্রিম কোর্টের এক জন এটর্ণির নিকট কাজ শিখিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কয়েক মাস পরে ইনি এই এটর্ণির কাজ ছাড়িয়া অপর একজনের নিকট কাজ শিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়েই ইনি আপনার বাল্যজীবনের ভ্রম সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলেন এবং সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া লইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া অধ্যবসায় সহকারে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। এই অধ্যবসায়ের ফলে ইনি ক্রমশঃ যে জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইলেন, তাহা বাস্তবিকই অসামান্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধিই ইঁহার নাই, কিন্তু আজি বিশ্ববিদ্যালয়ের কত উচ্চশিক্ষিত যুবকও ইঁহার চরণতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক্ষণে যে উচ্চপদ ও সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, খ্রিঃ ১৮৬৪ অব্দেই তাহার সূত্রপাত হয়। একটি পরীক্ষায় ইনি বোম্বাইয়ের রস্তমজি জামসেৎজি জিজিভাইয়ের প্রদত্ত বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া বারিষ্টার হইবার

* শ্রীযুত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের প্রার্থনামতে অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার একখানি ফটোগ্রাফ আমাদিগকে দিয়াছেন। এজন্য আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। স-স।

আশায় ঐ সালের অক্টোবর মাসেই বিলাত যাত্রা করিলেন। সেখানে সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণের সাহায্যে ও স্বকীয় ধৈর্য্য, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের গুণে অতি অল্প দিনেই প্রভূত উন্নতি লাভ করিলেন। এ দেশে প্রত্যাগত হইয়া, খ্রিঃ ১৮৬৮ অব্দে ইনি বিচারালয়ে প্রথম ব্যবহার-শাস্ত্রের তর্ক করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিলেন। এখন ইহাতে ইঁহার এমনই প্রতিপত্তি হইয়াছে যে, এতদ্দেশবাসী সর্ব্বজাতীয় লোকেই বিচারালয়ে স্বপক্ষসমর্থনের জন্য ইঁহাকে নিয়োগ করিতে পারিলে, পরম সৌভাগ্য বিবেচনা করিয়া থাকেন।

ইঁহার এইরূপ ক্ষমতা দেখিয়াই কয়েকবার হাইকোর্টের ষ্টাণ্ডিং কৌন্সেলের পদে ইঁহাকে প্রতি-নিধি রূপে কার্য্য করিতে দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন কয়েকবার হাইকোর্টের দেশীয় জজের পদশূন্য হইলেও ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি সার্ রিচার্ড্ গার্থ্ মহোদয় ইঁহাকে ঐ কার্য্য স্বীকার করিবার জন্য বিস্তর অনুরোধ করেন। কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহাতে সম্মত হন নাই। ইনি স্বচ্ছন্দে স্বাধীন ভাবে যে অর্থোপার্জ্জন করেন, তাহা হাইকোর্টের প্রধানতম জজের বেতন অপেক্ষাও বেশী।

দেশের অভাব ও দুঃখের কথা কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের গোচর করিবার জন্য ইঁহার বিশেষ চেষ্টা আছে। ইনি ভারতের জাতীয় মহাসমিতির একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এবং এই সমিতির প্রথম অধি-বেশনে ইনিই সভাপতিত্বে বরিত হইয়াছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভামঞ্চে দাঁড়াইয়া বক্তৃতার জন্য দেশবিখ্যাত নহেন, কিন্তু ইঁহার ন্যায় সুন্দর, সসার বক্তৃতার শক্তিও অতি অল্প লোকেরই আছে। দেশহিতার্থ ইঁহার চেষ্টা শুধু এ দেশেই আবদ্ধ নহে; যাহাতে বিলাতের লোকেও এ দেশের দুঃখের কথা জানিতে পারিয়া এ দেশীয় লোকের প্রতি সহানুভূতিশীল হন এজন্য ইনি বিলাতেও একটি সমিতি স্থাপন করেন।

স্বীয় জননীর প্রতি ইঁহার অসাধারণ ভক্তি ছিল। মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইনি কোন কর্ম্মই করিতেন না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমস্ত সদ্‌গুণের উল্লেখ করিতে পারি আমাদের ক্ষুদ্র পত্রিকায় এরূপ স্থান নাই। সংক্ষেপে কেবল এই মাত্র বলিতে পারি, তাঁহার ন্যায় বিদ্বান্, সত্যপ্রিয়, স্বদেশহিতৈষী মহাত্মার আবির্ভাবে দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে এবং তাঁহার স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণও গৌরবান্বিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতের রাজনৈতিক গগনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহা-শয়ের উজ্জ্বল মূর্ত্তি নয়নপথে পতিত হয়। ইঁহার প্রপিতামহ ফরিদপুর জেলা হইতে আসিয়া ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী মণিরামপুরে বাস করেন। ইঁহার পিতা ৺ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতার একজন বড় ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার নাম জানেন না, এ দেশে এমন লোকই নাই।

খ্রিঃ ১৮৪৮ অব্দের নবেম্বর মাসে কলিকাতা নগরে সুরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। বাল্যকালে পটলডাঙ্গার একটি পাঠশালায় পড়িয়া সাত বৎসর বয়সের সময় সুরেন্দ্রনাথ ডভ্‌টন কালেজে ভর্ত্তি হন। এখানে ইনি প্রতি বৎসরই পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিতেন। খ্রিঃ ১৮৬৩ অব্দে ইনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তাহার পর, ১৮৬৮ অব্দে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, ঐ কলেজের অধ্যক্ষ ইহাঁকে সিবিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষা দেওয়াইবার জন্য ইহাঁর পিতাকে অনুরোধ করেন। এই পরীক্ষা দিবার জন্য ইহাঁকে

বিলাত যাইতে হইল। সেখানে যথারীতি পাঠ সমাপনান্তে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি খ্রিঃ ১৮৭১ অব্দে দেশে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীহট্টের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু দুই বৎসর পরে এ কার্য্যও ইঁহাকে ত্যাগ করিতে হইল। ইহার পর ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মিট্রোপলিটন ইন্ষ্টিটিউশনে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন। এখানে ও অন্য স্থানে কয়েক বৎসর শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া কলিকাতায় স্বয়ং একটি স্কুল স্থাপন করেন। তাঁহার নামের গুণে অল্প দিনেই স্কুল ছাত্রে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এক্ষণে এই স্কুল কলিকাতার একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হইয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহার কয়েকটি শাখাও সংস্থাপিত হইয়াছে।

স্বদেশহিতৈষিতা ও বাগ্মিতার জন্য সুরেন্দ্রনাথের নাম দেশের সকলের নিকট সুপরিচিত। ইনি যে এত বিখ্যাত হইয়াছেন, এবং ইহাঁর যে এত সম্মান, উপরি উক্ত দুইটি গুণই তাহার প্রধান কারণ। "বেঙ্গলি" নামে এক খানি ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্র ইহাঁর সম্পাদকতায় পরিচালিত হয়। খ্রিঃ ১৮৮৩ অব্দে ইহার সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথকে লইয়া দেশমধ্যে একটা হুলস্থূল পড়িয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ অপর একখানি সংবাদপত্রের কথায় বিশ্বাস করিয়া হাইকোর্টের কোন বিচারপতির বিচারবুদ্ধির নিন্দা করেন। ইহাতে আদালতের অপমান করা হইয়াছে বলিয়া ইহাঁর নামে অভিযোগ আইসে এবং বিচারে ইহাঁর দুই মাস কারাবাসের আদেশ হয়। এই বিচারের সময় দেশমধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়, এবং এই সময় হইতেই এ দেশীয় সাধারণ লোকে আপনাদের দেশ ও আপনাদের স্বত্ব উত্তমরূপে বুঝিতে আরম্ভ করে। খ্রিঃ ১৮৭৬ অব্দে ইনি কলিকাতায় যে ভারত-সভা সংস্থাপিত করেন, ইহাই ইঁহার জীবনের প্রধান কীর্ত্তি। দেশে ও বিলাতে এই সভার আন্দোলনে অনেক সুফল ফলিয়াছে। কয়েক বৎসর হইল, ভারতে যে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সুরেন্দ্রনাথ তাহার একজন প্রধান উদ্যোগী। আমরা সংক্ষেপে তাঁহার গুণাবলী বর্ণন করিলাম। ফলতঃ সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় সুসন্তান দেশে অতি অল্পই আছেন।

শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ।

খ্রিষ্টীয় ১৮৪৯ অব্দে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী কৃষ্ণনগরে লালমোহনের জন্ম হয়। ঢাকায় ইঁহাদের আদি নিবাস। ইঁহাদের বংশ অতি প্রাচীন ও দেশমধ্যে সম্ভ্রান্ত বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহার পিতা স্বর্গীয় রামলোচন ঘোষ মহাশয় ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারল লর্ড্ অক্লাণ্ড্ সাহেব কর্ত্তৃক প্রধান সদর আমিনের পদে নিযুক্ত হন। রামলোচন স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায়ের একজন পরম বন্ধু ছিলেন এবং ঢাকা কলেজ সংস্থাপন বিষয়ে যাঁহারা বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন, ইনিও তাঁহাদের মধ্যে এক জন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ বিদ্বান্, সদ্বক্তা ও স্বদেশ হিতৈষী বলিয়া দেশের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। লালমোহন ইঁহারই সহোদর।

বাল্যকালে কলিকাতার কোন স্কুলে শিক্ষা লাভ করিয়া লালমোহন আইন অধ্যয়নের জন্য খ্রিঃ ১৮৬৯ অব্দে বিলাত গমন করেন এবং দুই বৎসর পরেই বারিষ্টার হইয়া দেশে প্রত্যাগত হন।

পূর্ব্বে ভারতবাসীদিগের সিবিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষা দিবার বিস্তর বিঘ্ন ছিল ; এজন্য তদ্বিষয়ে আন্দোলনের নিমিত্ত ইনি ভারতসভার প্রতিনিধি হইয়া বিলাত গমন করেন। খ্রিঃ ১৮৭৯ অব্দে বিলাতে পঁহুছিয়া ইনি স্বর্গীয় ভারতহিতৈষী মহাত্মা ব্রাইট্ সাহেবের সহানুভূতি লাভ করেন। লাল-

মোহনের রাজনীতিজ্ঞতা ও বাক্‌পটুতায় মোহিত হইয়া মহাত্মা ব্রাইট্‌ সাহেবও ইঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি করেন। ইনি বিলাতের অনেক সভা সমিতিতে সুন্দর সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়া সেখানকার লোকদিগকে বিস্মিত ও মোহিত করিয়াছিলেন। সিবিল সার্ব্বিস্‌ সম্বন্ধে এই আন্দোলনের ফলে দেশের উপকার হয়। অল্প দিন বিলাতে থাকিয়াই ইনি স্বদেশে প্রত্যাগত হন। খ্রিঃ ১৮৮৪ অব্দে বিলাতের পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় নূতন সভ্য নির্ব্বাচনের সময় উপস্থিত হয়। এই উপলক্ষে মহাসভায় প্রবেশলাভের জন্য ইনি পুনরায় বিলাত যান। এই সময়েই ইঁহার যশোভাতি স্বদেশে বিদেশে সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। বিলাতের বহুতর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইঁহাকে আপনাদের প্রতিনিধি করিয়া পার্লিয়ামেণ্টে পাঠাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। তথাপি তিনি যে সে বার পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যপদ লাভ করিতে পারেন নাই, ইহা কেবল আমাদিগের দেশেরই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

ধাঁধা।

গত বারের ধাঁধার উত্তর।

১। আলস্য।

২। খুল্‌না।

৩।

মৈ	না	ক
না	র	দ
ক	দ	ম্ব

"মৈনাক" শব্দের পরিবর্ত্তে "পিনাক" লিখিলেও উত্তর ঠিক হয়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এপ্রিল মাসের তিনটি ধাঁধারই ঠিক উত্তর দিয়াছেন :—

শ্রীপ্রমদারঞ্জন লাহিড়ী, পুটিয়া। শ্রীআশিনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঁচি। শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস, টিকারী। শ্রীসুরেন্দ্রবিনোদ সিংহ, ত্রিপুরা। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন, গৌহাটী। শ্রীবরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কীর্ত্তিপাশা। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন, বাসণ্ডা। শ্রীক্ষেত্রনাথ পাল, কাশিমবাজার। শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, তেজপুর। শ্রীগতিনাথ সিকদার, পলাশবাড়ী। শ্রীরসিকলাল দাস, তারামোহন স্কুল। ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রগণ, কালীগঞ্জ। শ্রীমতী মৃণালিনী রায়, কালীঘাট। শ্রীঅমৃতলাল রায়, মাণিকদহ। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর। শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস গুপ্ত, কালিয়া। শ্রীশরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত, রামনগর। শ্রীঅখিলনাথ বসু, কলিকাতা।

নূতন ধাঁধা।

১। ভূপালের উত্তরবর্ত্তী একটি প্রাচীনতম দেশ, কবিগণের দ্বারা কোকিলের প্রিয় রূপে বর্ণিত একটি বৃক্ষ, আর যাহা ব্যঞ্জনে না দিলে ব্যঞ্জন সুস্বাদ হয় না এমন একটিদ্রব্য—তিনটিই তিন তিন অক্ষরের—এমন কোন্‌ তিনটি শব্দকে কেমন করিয়া সাজাইলে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পংক্তি পড়িলেও যা, ক্রমান্বয়ে প্রতি পংক্তির প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অক্ষরগুলি পড়িলেও তাহাই হইবে।

২। পাঁচ অক্ষরে নাম এমন একটি শিল্পী দ্বাপর যুগে এক সুন্দর সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইঁহার নামের শেষ অক্ষরটি বাদ দিলে বেশ বেড়াইবার জায়গা। শেষ দুটি অক্ষর বাদ দিলে মানুষের খাদ্য। শেষ তিনটি অক্ষর বাদ দিলে, ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই শিল্পীরই নাম। বল ত সেই শিল্পী কে?

সখা
একাদশ ভাগ। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

জুন, ১৮৯৩।

বিবিধ।

বর্ণপরিবর্ত্তক বৃক্ষ।—মার্কিন দেশে একটী বৃক্ষ দেখা গিয়াছে। ইহার রং প্রত্যহ তিনবার পরিবর্ত্তিত হয়। এই বৃক্ষের পত্র সকালে শ্বেত, দ্বিপ্রহরে লোহিত এবং সায়ংকালে নীলবর্ণ ধারণ করে।

*
* *

বালকের পৃথিবীভ্রমণ।—কিছুদিন হইল ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্ক একটী বালক ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়াছে। ইহার বাড়ী আমেরিকা। পৃথিবীভ্রমণ না কি ইহার সঙ্কল্প। এই বালক এ পর্য্যন্ত ৫০,০০০ হাজার মাইল পথ পরিভ্রমণ করিয়াছে।

*
* *

প্রবেশিকা পরীক্ষার বৃত্তি।—কলিকাতার এলবার্ট কালেজের শ্রীমান্ প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হইয়া ২০৲ কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইয়াছেন। মেয়েদের মধ্যে বেথুন কালেজের কুমারী সরলা সেন প্রথম হইয়া ২০৲ কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইয়াছেন।

বাক্‌পটু গর্দ্দভ।—ইংলণ্ডের দৈনিক "গ্রাফিক" সংবাদপত্রে জনৈক সংবাদদাতা একটী গাধার কথা লিখিয়াছেন। এ জন্তুটী না কি ইংরেজী ও ফ্রেঞ্চ ভাষায় কতকগুলি কথা বলিতে পারে। ঈশ্বর গ্লাড্‌ষ্টোন সাহেবকে দীর্ঘজীবী করুন (God save Gladstone) ইহা খুব স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পারে। ইহার পালক দুই হাজার টাকারও বেশি দিয়া অন্য এক ব্যক্তির নিকট হইতে গাধাকে ভাষা-শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী শিক্ষা করিয়াছেন।

*
* *

ভয়ানক বৃষ্টি।—৬ই আষাঢ় সোমবার রাত্রে কলিকাতা অঞ্চলে ভয়ানক বৃষ্টি হইয়াছিল। রাত্রি ১১টার সময় বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া প্রায় ৪টা পর্য্যন্ত ছিল। এই পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই কলিকাতা সহর জলে থৈ থৈ হইয়াছিল। কলিকাতার অনেকগুলি রাস্তা ছোট ছোট খালের আকার ধারণ করিয়াছিল। কোন কোন রাস্তার উপর প্রায় ২ হাত জল জমিয়াছিল। পটলডাঙ্গার গোলদীঘি ছাপিয়া জল কলেজ ষ্ট্রীটে আসিয়াছিল। পুকুরের মাছগুলি সে দিন বাড়ীর প্রাঙ্গণ ও রাস্তার উপর। ছেলেগুলি কাপড় দিয়া মাছ ধরিয়াছিল। অনেকের বাড়ীর ভিতর জল প্রবেশ করিয়াছিল। দুঃখী লোকের ঘর দুয়ারগুলির দুরবস্থার ত কথাই নাই। অনেকগুলি খোলার বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে।

চিকাগো মহামেলা।

অনরেবল্ লিম্যান্ জে গেজ্
চিকাগো প্রদর্শনীর সভাপতি।

কর্ণেল্ জর্জ্জ্ আর ডেভিস্
চিকাগো প্রদর্শনীর ডিরেক্টর জেনারেল্।

মিসেস্ বার্থা পামার
মহিলা-সমিতির সভাপতি।

আমাদের পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় গ্রাম্য মেলা দেখিয়াছ। সাধারণতঃ যে সকল জিনিস আমরা দেখিতে পাই না, মেলায় গিয়া তাহা দেখি। মেলা হইলেই মনে করি, এখানে কিছু নূতন দ্রব্যাদি দেখিতে পাইব। বাস্তবিকও কখনও দেখি নাই, এমন অনেক জিনিস আমরা মেলার স্থানে গিয়া দেখিতে পাই। সহরে যে সব মেলা হয়, গ্রাম্য মেলা অপেক্ষা সে গুলি উঁচু দরের। আবার অনেক মেলার উদ্দেশ্য কেবল আমোদ, কিন্তু সকল মেলারই মুখ্য উদ্দেশ্য তাহাই নয়। নানা দেশের নানা প্রকার কৃষি শিল্পাদি দ্রব্য দেখিয়া তৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা ও তাহার অনুকরণে তদ্রূপ, বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার সুপথ দেখাইয়া দেওয়াই প্রকৃত মেলার উদ্দেশ্য।

গত ১৮৮৩।৮৪ সালে কলিকাতায় এইরূপ একটী আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী (মেলা) হয়। ইহা তিন মাস ব্যাপিয়া ছিল। নানা দেশ বিদেশ হইতে এখানে কল কারখানা, শিল্প ও বাণিজ্যদ্রব্য আসিয়াছিল, আমরা দেখিতে গিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে আমরা ১৮৮৪ সালের সখায় লিখিয়াছি। সুতরাং এখানে আর বেশী কিছু লিখিব না।

ইউরোপের নানা স্থানে প্রায় প্রতিবৎসরই এই প্রকার প্রদর্শনী হইয়া থাকে। গত ১৮৮৯ সালে ফ্রান্সের রাজধানী পারী নগরে এক সুবৃহৎ প্রদর্শনী হয়, তথায় অনেক স্থানের লোক সমাগত হইয়াছিলেন এবং অনেক রকম জিনিস উপস্থিত হইয়াছিল। সুদূর মার্কিন হইতেও কতিপয় উদ্যমশীল ব্যক্তি এই মেলা দেখিতে আসেন। এই মেলা দেখিয়া তাঁহাদের অপার আনন্দ ও সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত জ্ঞান লাভ হয়। সেই সময় হইতেই আপনাদের দেশে ইহা অপেক্ষাও একটী বড় মেলা খুলিবার তাঁহাদের ইচ্ছা হয়। দেশে ফিরিয়া গিয়া তাঁহাদের মনোগত অভিপ্রায় সকলকে জানান।

দেশের অনেক লোক আহ্লাদের সহিত তাঁহাদের বাক্যের অনুমোদন করেন এবং এক সুবৃহৎ প্রদর্শনী খুলিবার চেষ্টা হয়।

খ্রিঃ ১৪৯২ অব্দে কলম্বস্ আমেরিকা আবিষ্কার করেন। এজন্য খ্রিষ্টীয় প্রতি শতাব্দীর দ্বিনবতি বৎসরে আমেরিকাতে একটী উৎসব হইয়া থাকে। ১৮৯২ সালে পুণ্য বৎসরে কলম্বসের স্মরণার্থ শতাব্দী উৎসবের সময় আমেরিকাতে এই মেলা হইবে ঠিক হইল। কিন্তু মেলার স্থান তখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। নিউইয়র্ক, ওয়াসিংটন, ফিলাডেল্‌ফিয়া, সেণ্ট্ লুই, সিন্‌সিনাতি, এবং চিকাগোতে, তত্তৎ স্থানের অধিবাসীরা এই জাগতিক প্রদর্শনী (World's fair) খুলিবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। অবশেষে অনেক তর্ক বিতর্কের পর চিকাগোতে এই মেলা বসিবে ঠিক হইয়া গেল। চিকাগোবাসীরা মহান্ উৎসবের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। একটী কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা গঠিত হইল। ইউরোপের নানা দেশে লোক পাঠাইয়া কোথায় কি প্রকার বন্দো-বস্তে প্রদর্শনীর কার্য্য সমুদয় সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহিত হইয়াছে, জানিবার বন্দোবস্ত করা হইল। যাঁহা-দিগকে পাঠান হইল, তাঁহাদের সকলেই জ্ঞাতব্য বিষয় সকল সুন্দররূপে আয়ত্ত করিয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন। ইহাতে কিছু সময় কাটিয়া গেল। ১৮৯২ সাল যেন দ্রুতবেগে সম্মুখবর্ত্তী হইতে লাগিল। মানুষ যখন কার্য্যে ব্যস্ত থাকে, সময় কোথা দিয়া চলিয়া যায়, তাহার ঠিক পাওয়া যায় না; আর অলসদের নিকট এক মুহূর্ত্তও একদিন বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা কার্য্যে ব্যস্ত, তাঁহাদের সময়ও কাজেই যেন কোথা দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। তখন তাঁহারা দেখিলেন, ১৮৯২ সালের মধ্যে সমস্ত আয়োজন ঠিক হইবে না; সুতরাং ১৮৯৩ সালে প্রদর্শনী খোলাই ঠিক করিলেন। আমেরিকা ব্যাপিয়া মহা আয়োজন আরম্ভ হইল।

আমেরিকার মধ্যে কতকটা স্থানকেই United States বা যুক্তরাজ্য বলে। এই মেলার কার্য্য চালাইবার জন্য এই প্রদেশ হইতে দুই জন কমিশ-নার এবং ৮ আট জন বিশেষ সভ্য লইয়া একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইল। যাঁহারা এত বড় গুরুতর কার্য্যের ভার লইলেন, তোমাদের মধ্যে অনেকেরই বোধ হয় তাঁহাদের প্রতিকৃতি দেখিতে ইচ্ছা হইতে পারে। আমরা তাই প্রবন্ধের প্রথমে ইহাঁদের মধ্য হইতে তিন জনের ছবি দিলাম। ইহাঁদের উপর সমস্ত পরিদর্শনের ভার রহিল। কিন্তু হাতে কলমে কাজ চিকাগোবাসীরা গ্রহণ করিলেন। এই স্থানের অধিবাসীরা তিন কোটী অথবা আবশ্যক হইলে ইহা অপেক্ষাও বেশী টাকা দিতে আমেরিকার গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন। উদ্যমশীল আমেরিকাবাসীরা শীঘ্রই এই টাকা সংগ্রহ করিলেন। আমাদের দেশে কিন্তু কোন সাধারণ-হিতকর কার্য্যের জন্য তিন কোটী কেন, তিন হাজার টাকা সংগ্রহ করাও এক প্রকার অসম্ভব। তাহার কারণ আমা-দের দেশের লোকেরা তেমন ধনী নয়, আর যাঁহাদের ধন আছে, তাঁহাদের মতিগতিও তেমন নয়।

টাকা সংগৃহীত হইলে, চিকাগোর কোথায় এই প্রদর্শনী বসিবে, সেই স্থান নির্দ্ধারণে সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। চিকাগোর জ্যাক্‌সন পার্ক, ওয়াসিংটন পার্ক এবং এই দুই বাগানের মধ্যবর্ত্তী স্থানে মেলা বসান ঠিক হইল। তোমরা হয় ত মনে করিতেছ, এ আর কতটা স্থান, দুটা বাগান আর তাহার মধ্যবর্ত্তী স্থানটুকু বই ত নয়,— ধরিলাম দুটা বাগানে ৪০ বিঘা করিয়া ৮০ বিঘা, আর তাহার মধ্যবর্ত্তী স্থানে ২০ বিঘা জমি আছে। এতও হয় কি না সন্দেহ। কিন্তু বাস্তবিক তাহা

নয়। এই দুইটি বাগান ও ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রায় চারি হাজার বিঘা জমি আছে।

জ্যাক্‌সন্ পার্কে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাটী প্রস্তুত হইয়াছে, ওয়াসিংটন্ পার্কে নানাবিধ ফুল ফলের গাছ রোপিত হইয়াছে। চিকাগো সহরের মধ্যস্থল হইতে এই প্রদর্শনী প্রায় ৭ মাইল হইবে। এই প্রদর্শনীতে যাওয়া আসার সুবিধার জন্য অনেক রকম যান প্রস্তুত হইয়াছে। মেলাদর্শনার্থী অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গের যাহাতে আহারাদির কিছুমাত্রও অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য বড় বড় ২৭৯টী নূতন হোটেল প্রস্তুত হইয়াছে। এই বাড়ীগুলিতে ৩৩৫০০টী প্রকোষ্ঠ আছে। সহজেই অনুমান করিতে পার এই গুলিতে কতগুলি লোকের সমাবেশ হইতে পারে।

পৃথিবীর সমস্ত দেশের আশ্চর্য্য এবং নূতন রকমের দ্রব্য সকল সেইখানে যাইতেছে। আমাদের ভারতবর্ষ হইতে অনেক জিনিস পত্র গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে টেলারী কোম্পানী তথায় পাঠাইয়াছেন। শ্রীযুক্তা কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়া চিকাগো মহামেলায় প্রদর্শনার্থ কতকগুলি জিনিস নিজের সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। তিনি এক্ষণে ইংলণ্ডে। ঐ জিনিসগুলি মহারাণীর জনৈক পুত্রী তাঁহার সঙ্গে লইয়া চিকাগো যাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। আমাদের মহারাণী স্বীয় হস্তচিত্রিত কতকগুলি সুন্দর চিত্র ইতিপূর্ব্বেই চিকাগো প্রদর্শনীতে পাঠাইয়াছেন।

আমাদের দেশের খ্যাতনামা শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার নিমন্ত্রিত হইয়া আগামী জুলাই মাসে চিকাগো যাইবেন। প্রদর্শনীর সংশ্রবেই একটী ধর্ম্মালোচনা সভা হইবে। প্রতাপ বাবু আলোচনা সভায় এক দিন সভাপতির কার্য্য করিবেন। "আসিয়ার নিকট ধর্ম্ম সম্বন্ধে পৃথিবী কত ঋণী" এই সম্বন্ধে তিনি আর এক দিন বক্তৃতা করিবেন এবং তৎপর দিবস এ সম্বন্ধে আলোচনার সময় যোগদান করিবেন। প্রতাপ বাবুর সম্মানে সমগ্র দেশ সম্মানিত।

গত ১লা মে আমেরিকায় প্রেসিডেণ্ট ক্লেভল্যাণ্ড্ সাহেব প্রদর্শনী খুলিয়াছেন। ইহা আগামী নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত থাকিবে। প্রদর্শনী খুলিবার সময় প্রেসিডেণ্ট মহাশয় সম্মুখের টেবিলের উপর একটী চাবিতে হাত দেওয়া মাত্র সমস্তগুলি কল চলিতে লাগিল।

যে চিকাগো সহরে এই প্রকাণ্ড কাণ্ড হইতেছে, তাহার একটু ইতিহাস তোমাদিগকে বলিব। খ্রিঃ ১৮৩০ অব্দের পূর্ব্বে চিকাগো জল ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। দেশটি ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি ছিল। ঐ সালে কয়েকজন ব্যক্তি উহাকে লোকবাসোপযোগী করিতে চেষ্টা করেন। খ্রিঃ ১৮৩২ অব্দে এখানে সর্ব্বপ্রথম একটী কার্য্যালয় প্রস্তুত হয়। এবং তখন এখানকার লোকসংখ্যা ৩৫০ জন মাত্র ছিল। দেখিতে দেখিতে খ্রিঃ ১৮৩৭ অব্দে ৪,১৭০ জন হইল। দিন দিনই লোকসংখ্যা বাড়িয়া চলিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে খ্রিঃ ১৮৭০ অব্দে চিকাগো সহর পুড়িয়া ভস্মীভূত হইল। বিধাতা মানুষের মধ্যে যে অসীম ক্ষমতা দিয়াছেন তাহাতে দৈব পরাজিত হইল। খ্রিঃ ১৮৮০ অব্দে, অর্থাৎ ঠিক দশ বৎসর পরে, চিকাগোকে লোকে পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্র গুণে সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হইতে দেখিল। চিকাগো এখন ১৮০ বর্গ মাইল স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, এবং যে স্থান ঠিক ৬০ বৎসর পূর্ব্বে ৩৫০ জন মাত্র লোকের বসবাস ছিল, সেস্থান এখন তের লক্ষ লোকের আবাসভূমি হইয়াছে!

এই প্রদর্শনী শেষ হইয়া গেলে, তোমাদিগকে ইহার বিষয় কিছু জানাইবার ইচ্ছা রহিল।

বাদুড়।

একদিন বিকাল বেলায় ঝড়ের সময় একটা বাদুড় উড়িয়া আসিয়া একটি কচি মেয়ের কাছে পড়িয়া মরিয়া গেল। মেয়েটি বাদুড়টিকে দেখিয়া তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা এটি কি পাখী ?"

বাবা বলিলেন,—"ইহার নাম বাদুড়। হাঁস, কাক প্রভৃতিকে পাখী বলে, বাদুড় পাখী নহে।"

নিকটে কচি মেয়ের দাদা বসিয়াছিল। বাদুড় পাখী নয় শুনিয়া পিতাকে বলিল,—"কেন বাদুড় পাখী নয় বাবা!—কাক শকুনির মত বাদুড় ত উড়িতে পারে, আর তাহাদের মত বাদুড়ের ত পাখাও আছে ?"

বাবা।—কোন প্রাণী উড়িতে পারিলেই পাখী হয় না। এক প্রকার মাছ সমুদ্রে বাস করে, সেই মাছ উড়িয়া খানিক দূর উপরে উঠিতে পারে। তাহাকে মাছই বলিব, উড়িতে পারে বলিয়া তাহা পাখী নহে। আবার দেখ, উটপাখী আদৌ উড়িতে পারে না, হাঁসও ভাল উড়িতে পারে না, অথচ এগুলি বাস্তবিক পাখী। আবার, মানুষ ব্যোম-যানে করিয়া উপরে উঠিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া কি মানুষকে পাখী বলিবে ?

দাদা।—মানুষের ত পাখা নাই। যদি মানুষের পাখা থাকিত, আর ঐ পাখার সাহায্যে মানুষ উপরে উঠিত, তাহা হইলে মানুষকে পাখী বলা যাইত। ব্যোমযান একটা আলাহিদা জিনিস।

বাবা।—কোন প্রাণীর পাখা থাকিলেই কি তাহাকে পাখী বলিবে ? বাদুড়ের যেমন পাখা আছে, সেই রকম পাখা এক প্রকার কাঠবিড়ালেরও আছে ; তাহারাও তাহার সাহায্যে উড়িতে পারে। অথচ সেই রকম কাঠবিড়ালকে পাখী বলা চলে না। আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে, তোমারা সেগুলি দেখ নাই।

দাদা।—আমি বলি, যাহার পাখা আছে, সেই পাখী। বাদুড়ের পাখা আছে, বাদুড় পাখী। কাঠবিড়ালের পাখা থাকিলে অবশ্য তাহাকে পাখী বলিতে হইবে।

বাবা।—তুমি বাদুড়ের পাখাটি দেখিয়াই বলিতেছ উহা পাখী। বাস্তবিক সামান্য লোকে এই পাখা দেখিয়াই ইহাকে পাখী বলে। কিন্তু দেখ, কোন প্রাণীর বা কোন জিনিসের একটা কোন অঙ্গ বা গুণ ধরিয়া বিচার করিলে ঠিক হয় না। দেখ, মানুষের হাত আছে, বানরেরও হাত আছে, মানুষ কি বানর ? মানুষের দুইখানি পা আছে, পাখীরও দুইখানি পা ; অতএব মানুষ আর পাখী কি একই ? দেখ লবণও শাদা চিনিও শাদা, লবণ ও চিনি কি একই জিনিস ? সেইরূপ বাদুড়ের পাখা আছে বলিয়াই যে উহা প্রকৃত পাখী, তা নয়। পাখীর অনেক উচ্চে বাদুড়ের আসন। মানুষকে বানর বলিলে যেমন মানুষকে নিম্ন শ্রেণীতে ফেলা হয়, সেইরূপ বাদুড়কে পাখী বলিলে তাহার প্রতি অন্যায় করা হয়।

কচি মেয়ে।—বাদুড়ের পাখা আছে, বাদুড় উড়িতে পারে। ইহাতেও বাদুড় পাখী হইল না ? কি দেখিয়া তবে পাখী ঠিক করিব ?

বাবা।—অনেকগুলি লক্ষণ বা চিহ্ন বিচার করিতে হইবে। পক্ষীর সঙ্গে বাদুড়ের অনেক বিষয়েই অনৈক্য। তাহার কয়েকটি বলিতেছি। পক্ষীদিগের শরীর পালক দিয়া ঢাকা ; তাহাদিগের দন্ত নাই ; কোমল ওষ্ঠের পরিবর্ত্তে তাহাদিগের

কঠিন চঞ্চু আছে ; পালক দিয়া ঢাকা দুইটি পাখা আছে। আবার, ডিম্ব হইতে পাখীর ছানা হয়, অর্থাৎ পাখীরা অণ্ডজ।

কিন্তু এ দিকে দেখ বাদুড়ের শরীরে পালক নাই, লোম আছে ; চঞ্চু নাই, দন্তবিশিষ্ট মুখ আছে। আরও দেখ, বাদুড়ের দুইটি বড় বড় কাণ আছে। কোন পাখীর কখনও লম্বা কাণ দেখিয়াছ? তবেই দেখ, বাদুড়ের আর কিছু না দেখিলেও উহার লোমাবৃত দেহ, দন্তবিশিষ্ট মুখ, এবং স্পষ্ট কর্ণ দেখিলেই উহাকে কিছুতেই পাখী বলা যাইতে পারে না।

কচি মেয়ে।—বাদুড় যদি পাখী না হইল, হবে ইহা কোন্ জন্তু?

বাবা।—বাদুড়টি ভাল করিয়া দেখ, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে উহা কিরূপ জন্তু। বাদুড়ের পাখা বিস্তৃত করিয়া দেখ, গঠন বিষয়ে উহার সহিত প্রকৃত পক্ষীর পাখার কোন সাদৃশ্য নাই। বাদুড় পাখার সাহায্যে উড়িতে পারে সত্য, কিন্তু দেখ, বাদুড়ের পাখা পালকে ঢাকা নয়। উহা খুব পাতলা চর্ম্ম দ্বারা নির্ম্মিত। বাস্তবিক, যেমন কাগজ ও বাঁশের কাঠী দিয়া বাতাস করিবার চীনের পাখা প্রস্তুত হয়, বাদুড়ের পাখাও সেইরূপ কয়েকখানি হাড়ের উপর একটা পাতলা চামড়া দ্বারা গঠিত। যে হাড়গুলিতে চামড়াটি সংলগ্ন, তাহা আর কিছুই নয়, কেবল বাদুড়ের সম্মুখের পায়ের অঙ্গুলিগুলি। যেমন চীনের পাখার মধ্যে বাঁশের সরু সরু কাঠী এবং উপরে ও নীচে দুই পুরু পাতলা কাগজ থাকে, তেমনই বাদুড়ের দীর্ঘ অঙ্গুলির হাড়ের উপর ও নীচে দুই পুরু পাতলা চামড়া আছে। ঐ চামড়া দুইটির মধ্যে একটি পিঠ হইতে আর একটি বুক হইতে আসিয়াছে। উহারা বাদুড়ের লেজ ও পশ্চাতের পা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তবেই দেখ বাদুড়ের পাখা কেমন বিচিত্র! বাদুড় যে কোন প্রকার পাখী নহে, তাহার আর একটি বিশেষ প্রমাণ এই যে, উহার বক্ষঃস্থলে দুইটি স্তন আছে। বাস্তবিক, বাদুড় পাখীর মত ডিম্ব প্রসব করে না। শৃগাল, কুকুর প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বাদুড় সন্তান প্রসব করে। আমাদের দেশে সচরাচর যে বাদুড় দেখা যায়, তাহারা একটি করিয়া সন্তান প্রসব করে। ছানাটিকে তাহার মা বুকে করিয়া রাখে এবং স্তনদুগ্ধ পান করাইয়া জীবিত রাখে। কুকুর, বিড়াল, গরু, মহিষ, ছাগ, বানর প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তুদিগের স্ত্রীজাতির স্তন আছে, এবং তাহাদিগের ছানাগুলিও মায়ের দুগ্ধ পান করে। এজন্য ঐ সমস্ত জন্তুদিগের সাধারণ নাম স্তন্যপায়ী। 'স্তন্য' অর্থে স্তনের দুগ্ধ, এবং 'পায়ী' অর্থে যে পান করে। অতএব বাদুড়ও স্তন্যপায়ী জন্তুর মধ্যে একটি।

কচি মেয়ে।—কুকুর গরু মাটির উপর থাকে, বাদুড় কোথায় থাকে?

বাবা।—পেঁচার ন্যায় বাদুড় রাত্রিচর। দিনের বেলা বাদুড় অনেকগুলি একত্র হইয়া গাছে ঝুলিয়া কাটায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বাদুড়ের পাখা, উহার সম্মুখের হাত বা পায়ের অঙ্গুলিগুলির হাড়ের উপর ও নীচে একটা পাতলা চামড়া দিয়া মোড়া। প্রত্যেক হাতের পাঁচটি অঙ্গুলিই এইরূপে চর্ম্ম দ্বারা আবৃত নহে। হাতের বুড় আঙ্গুলটি ক্ষুদ্রই থাকে এবং তাহাতে একটি বাঁকা নখ থাকে। তর্জ্জনীতেও ক্ষুদ্র নখ আছে। দুই হাতের বুড় আঙ্গুলের নখ দিয়া দিনের বেলা শত শত বাদুড় একত্রে এক গাছে ঝুলিতে থাকে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহারা একটি একটি করিয়া আহারের চেষ্টায় বাহির হয়। উহারা আম, জাম, নিম, বট, অশ্বত্থ, পেয়ারা, তাল প্রভৃতি গাছের ফল ভক্ষণ করে। আহারের নিমিত্ত বাদুড়েরা এক এক সময় অনেকগুলি করিয়া দল বাঁধিয়া অনেক দূরে চলিয়া

যায়। এলো মেলো হইয়া আকাশে বাদুড়ের দল চলে না। বাদুড়ের দল আকাশে যখন উড়িয়া যায়, তখন পশ্চাতে অনেকগুলি চলে, পরে ক্রমে ক্রমে কম হইয়া সম্মুখে একটি মাত্র থাকে। ইহাতে দলটি দেখিতে ত্রিকোণাকার হয়। রাত্রি শেষ হইবার আগেই আবার ইহারা ফিরিয়া আসে। দিনের বেলা বাদুড় অনেকগুলি করিয়া এক এক গাছে থাকে। তাহাতে জায়গা লইয়া সকলের মধ্যে অনবরত ঝগড়া চলিতে থাকে। সেদিন একটা তেঁতুল গাছে প্রায় এক শত দেড় শত বাদুড় দেখিলাম। তাহারা এত 'কেচর মেচর' করিতেছে যে সেখানে এক দণ্ড দাঁড়ানও কঠিন।

কচি মেয়ে।—দেখ দাদা, এই বাদুড়ের মুখটি কেমন? কেমন দাঁত দেখ!

দাদা। মুখটি দেখিতে যেন একটি ছোট শেয়ালের মুখ!

বাবা।—এই বাদুড়ের শুধু মুণ্ডটি দেখিলে, উহাকে একটি অসম্ভব রকম ক্ষুদ্র শেয়ালের মাথা বলিয়া তোমাদের ভ্রম হইতে পারে। এজন্য ইহাকে শেয়ালমুখো বাদুড় বলে।

কচি মেয়ে।—কত রকম বাদুড় আছে, বাবা? সবাই কি আম জাম খায়?

বাবা।—নানা প্রকার বাদুড় আছে। কতকগুলি কেবল ফল খাইয়া বাঁচিয়া থাকে, তাহাদিগকে ফলভুক্ বাদুড় বলে। অধিকাংশ বাদুড় কীট ভক্ষণ করে, তাহাদিগকে কীটভুক্ বাদুড় বলে। ফলভুক্ বাদুড়ের কাণের চেয়ে কীটভুক বাদুড়ের কাণ অনেক বড়। ফলভুক্ বাদুড়ের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীতে বাঁকা নখ থাকে, কীটভুকের কেবল অঙ্গুষ্ঠেই নখ থাকে। কীটভুক্দিগের মধ্যে এক জাতি বাদুড় আছে, তাহারা অপরাপর জন্তুর উষ্ণ শোণিত পান করে, কোন কোনটা আবার অপরবাদুড়ের রক্তও পান করে।

দাদা।—যাহারা পোকা খায়, এমন বাদুড় এ দেশে আছে?

বাবা।—প্রায় ত্রিশ চল্লিশ রকম বাদুড় ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের অধিকাংশই কীটভুক্। বোর্ণিও, জাবা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে এই সকল বাদুড়ের অনেকগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। কীটভুক্দিগের মধ্যে অধিকাংশই য়ুরোপ ও আমেরিকাতে পাওয়া যায়।

কচি মেয়ে।—সে দিন দাদা একটা চামচিকা ধরিয়াছিল। তাহারও মুখটি এই বাদুড়ের মুখের মত।

বাবা।—চামচিকাও এক প্রকার বাদুড়। ইহাকে সাধুভাষায় চর্ম্মচটিকা বলে। ইহার এবং বাদুড়ের আর একটি নাম অজীনপত্র। "অজীন" শব্দের অর্থ 'চর্ম্ম', এবং 'পত্র' শব্দের অর্থ 'পাখা',—অর্থাৎ যাহার পাখা চর্ম্মময়। পুরাতন ভাঙ্গা বাড়ী মন্দির প্রভৃতি নির্জ্জন কিছু অন্ধকারময় স্থানে চামচিকা বাস করে। শেয়াল মুখো বাদুড় অপেক্ষা চামচিকা অনেক ছোট। চামচিকা কীটভুক্।

কীটভুক বাদুড় বধ করা উচিত নয়। অনেক পোকা, ফলমূলের অনিষ্ট করে। এই রকম অনেকগুলি পোকা কীটভুক্ বাদুড়েরা খায়। এইরূপে কীট বিনাশ করিয়া কীটভুক বাদুড়েরা আমাদের উপকার করে। আমাদের দেশের নীচ লোকেরা শেয়ালমুখো বাদুড় ভক্ষণ করে। লম্বা সরু বাঁশের অগ্রভাগে আটা লাগাইয়া তাহারা বাদুড় ধরে। তবেই দেখ কীটভুক্ এবং ফলভুক্ উভয় জাতীয় বাদুড়ই আমাদের কোন না কোন উপকারে আইসে।

শিম্পাঞ্জি।

মানুষের সহিত বনমানুষের শরীরের অনেকটা সাদৃশ্য আছে ; শিম্পাঞ্জি নামক বনমানুষের সহিত মানুষের সাদৃশ্য আরও অনেকটা বেশি। আফ্রিকায় বিষুবরেখার সন্নিহিত স্থান সকলই এই জাতীয় জীবের বাসস্থান। উত্তরে গাম্বিয়া নদীর তীরবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে দক্ষিণে কঙ্গো ও আঙ্গোলা প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী বনময় ভূখণ্ডে ইহাদিগের বাস। আফ্রিকা হইতে অনেকবার বিলাতে শিম্পাঞ্জি লইয়া যাওয়া হয়। গ্রীষ্মপ্রধান আফ্রিকায় ইহারা যেমন সবল ও সুস্থ থাকে, শীত-প্রধান ইংলণ্ডে কিন্তু ইহারা তেমন সবল ও সুস্থ থাকিতে পারে না।

শিম্পাঞ্জির মুখে লোম অতি অল্পই দেখা যায়। মুখের রং অনেকটা হরিদ্রাভ পাটল বর্ণ। মাথায়, ঘাড়ে ও পিঠে কৃষ্ণবর্ণ ঘন লোম হয়, বক্ষঃস্থল ও উদরের লোম কিন্তু তেমন ঘন নয়।

ইহাদের ওষ্ঠ, অধর ও নাসিকার আকৃতি কেমন, তাহা চিত্রেই প্রকাশিত হইয়াছে। চক্ষুর পাতাগুলি দেখিতে বেশ। ভ্রূর উপরকার হাড় দুইখানি উচ্চ, কিন্তু কপালটি নীচু। বসিয়া থাকিলে, চিবুকটি বুকের উপর পড়ে—গলাটি ঢাকিয়া যায়। হাতগুলি বনমানুষের মত লম্বা নয়, দাঁড়াইলে হাঁটু অবধি আইসে। মানুষের মত ইহাদের হাতের ও পায়ের বুড়া অঙ্গুলিগুলি ছোট, তদ্ভিন্ন অন্যান্য অঙ্গুলিগুলি লম্বা লম্বা। অঙ্গুলিতে বড় বড় নখ আছে। চলিবার সময় হাত দুলাইয়া দুলাইয়া চলে। ইহাদের হাতের চেটোর রং পাটল বা গাঢ় পাটল। পায়ের নিম্নভাগটী দেখিতে কিছু অদ্ভুত রকম। পায়ের চেটোর উপরকার গ্রন্থিস্থলে লম্বা লম্বা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ লোম হয়, কিন্তু উহার নীচেই একবারে আর লোমের সম্পর্কটি নাই, ঐ স্থলে মানুষের গায়ের মত চামড়া বাহির হইয়া থাকে। মাথায় চুলগুলিরও বাহার বেশ। চুলগুলির ভিতর দিয়া লম্বা বড় বড় দুইটি কাণ বাহির হইয়া রহিয়াছে।

একটি শিম্পাঞ্জির বিষয় শুনা গিয়াছে, তাহাকে যখন জাহাজে করিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তখন জাহাজের খালাসিদিগের মধ্যে অনেককে সে করমর্দ্দনের জন্য হাত বাড়াইয়া দিত, কতকগুলি লোককে দিত না—করমর্দ্দনের জন্য গেলেই রাগিয়া উঠিত। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই জাহাজের সমস্ত খালাসির সহিতই তাহার বেশ মিল হইয়া গিয়াছিল। কেবল একটি বালককে সে মোটেই দেখিতে পারিত না। যখন খালাসিরা খাইতে বসিত, তখন সে তাহাদের প্রত্যেকের কাছে গিয়া তাহাদিগকে জড়াইয়া ধরিত এবং খাবার পাইলে, আমোদের সহিত খাইত। রাগিলে ছেলেদের মত চীৎকার করিত কিম্বা কুকুরের ডাকের মত শব্দ করিত।

একবার একটি লোক আফ্রিকা হইতে একটি শিম্পাঞ্জি ক্রয় করেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে ইহার মাতাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা হয়। ইহার ক্রেতা, একটি নিগ্রো বালকভৃত্যের উপর ইহার রক্ষার ভার অর্পণ করেন। শিম্পাঞ্জি বালকের এরূপ অনুরক্ত হইয়াছিল যে, বালক একদণ্ড তাহার নিকটে না থাকিলে, সে চীৎকার করিয়া, আছাড় পাছাড় খাইয়া খুন হইত। সে পোষাক পরিতে বড়ই ভাল বাসিত, পরিচ্ছদের ঘরে গেলেই একটা না একটা পোষাক টানিয়া আনিত। প্রাতে ৮টার সময় ইহাকে জলে দুধে ভিজান পাঁওরুটি, দুইটার সময় গোটা দুই কলা, এবং সন্ধ্যার সময় কলা, কমলা লেবু প্রভৃতি ফল খাইতে দেওয়া হইত ; সেও ইহা আনন্দের সহিত খাইত। কিন্তু কলাই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় পদার্থ ছিল। রাত্রি আসিলে, একটি টবে বসিয়া নিদ্রা যাইত। আবার সকাল হইলে দরজার কাঠের উপর কি জানালার কাছে গিয়া মানুষের মত বসিত। সে অনেক সময় অনেক কারণে বড়ই রাগিয়া যাইত, কিন্তু তাহার পালক অথবা প্রভুকে রাগের সময়ও কখনও কামড়াইতে যায় নাই। সে বিলক্ষণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত। মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হইলে, একাই নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া যাইত।

আর একবার একটা শিম্পাঞ্জিকে গুলি করিয়া মারা হইয়াছিল। শিম্পাঞ্জিটি দীর্ঘে তিন হাত এবং উহা এত ভারি যে দুই জন লোক উহাকে একটা দণ্ডে করিয়া ঝুলাইয়া লইয়া যাইতে বেশ একটু কষ্ট অনুভব করিয়াছিল। যখন ইহারা বনে থাকে, তখন ইহাদের শক্তি এত অপরিমিত যে, যে গাছের ডাল দুই জন বলবান্ লোকেও নোয়াইতে পারে না, ইহারা অক্লেশে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলে। লতা পাতায়

গৃহ রচনা করিয়া শিম্পাঞ্জি তাহাতে বাস করে, এবং অনেকে একত্র দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। অনেক সময়ই ইহারা মানুষের মত লাঠি হাতে করিয়া বেড়ায়। শত্রু সম্মুখীন হইলে, ইহারা দক্ষতা পূর্ব্বক লাঠি চালাইয়া আত্মরক্ষা করে। মনুষ্য কিম্বা হস্তী প্রভৃতি শত্রু ইহাদের আবাসের নিকটে গেলে লাঠি চালাইয়া বা পাথর ছুড়িয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। মানুষের অবয়বাদির সহিত ইহাদের এইরূপ সাদৃশ্য ও বুদ্ধিচাতুর্য্য দেখিয়াই প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা ইহাদিগকে মনুষ্যের নীচেই স্থান দান করিয়াছেন।

"আমি"-বলি।

স্নেহের পাঠক পাঠিকাগণ! "বলি" কাহাকে বলে, তোমরা জান। প্রতিমার কাছে পাঁটা বলি, মহিষ বলি হয় ত অনেকে দেখিয়াও থাকিবে। "আমি" নামে যে এক প্রকার জানোয়ার আছে, তাহা বোধ হয় তোমরা জান না, আর কোন্ দেবতার কাছে এই জানোয়ার বলি হয়, তাহাও বোধ হয় অবগত নও। আজ তোমাদিগকে সেই জানোয়ারের কথা ও তাহার বলির পদ্ধতি বলিব।—

প্রথমে জানোয়ারের পরিচয় দিই। উহা মনুষ্যদেহে বাস করে। আকৃতি—যাহার শরীরে বাস করে, তাহারই ন্যায়। তবে মানুষের শিং নাই, উহার দুইটা শিং আছে। একটার নাম—"দ্বেষ", অপরটার নাম "দম্ভ"। এই দুই শৃঙ্গের সাহায্যে "আমি" যাকে তাকে আক্রমণ করে, এই জানোয়ারের কাছে কাহারও অব্যাহতি নাই। কুৎসা, অপকার, পরনিন্দা, পরগ্লানি, প্রভৃতি বত্রিশটী দাঁতে এই জানোয়ার নিরন্তর মানুষকে কামড়ায়। যারে কামড়ায়, সে ছটফট্ করে বটে, কিন্তু "আমি" জানোয়ারেরও তাহাতে বড় সম্পদ বৃদ্ধি হয় না। অনেক সময়, অনেক "আমি"কে, অকালে নিজের সুরম্য বাসস্থানে আগুন ধরাইয়া পলাইয়া যাইতে দেখা গিয়াছে।

এই জানোয়ারকে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না। অণুবীক্ষণ সাহায্যে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট নয়নগোচর হয়, সেইরূপ "জ্ঞান-বীক্ষণ" নামক যন্ত্রের সাহায্যে ইহাকে মনুষ্যদেহে দেখিতে হয়। তোমরা হয় ত এই যন্ত্রের নামই শুন নাই, সুতরাং এই জানোয়ারও দেখ নাই। জ্ঞানিগণ এই যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহারা যন্ত্রসাহায্যে নিজের নিজের "আমি"কে দেখিতে পান, এবং "বিনয়" নামক দেবতার নিকট বলি দিয়া থাকেন।

লোককে ভূতে পায় শুনিয়াছ;—লোককে "আমি"তে পায় এরূপ কখনও শুন নাই। নাই বা শুনিলে, জানিয়া রাখ, "আমি"তে অনেককে পায়।—ভূতকে ধরা যায় না, তাই ভূতের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য লোক ওঝা ডাকে। কিন্তু "আমি"র বেলা সেই বন্দোবস্ত নহে; "জ্ঞানযন্ত্রের" সাহায্যে তাহাকে ধরিয়া "বিনয়" দেবতার নিকট বলি দিতে হয়।

"আমি"তে পাইলে লোকের যে যে লক্ষণ হয়, তাহার কয়েকটী এই:—

যাহাকে "আমি"তে পায়, সে ভাবে,—"জগতে আমার মত কেহ নাই। আমি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ,

সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ; আমার ক্ষমতার মত আর কাহারও ক্ষমতা নাই; আমি যেমন সুশ্রী এরূপ কেহ নহে; আমার বুদ্ধির মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কাহারও নাই; আমি যেরূপ জ্ঞানী, এমন আর কেহ হইতে পারে না।" কেবল যে এরূপ ভাবিয়াই সে নিরস্ত হয়, তাহা নহে; হিংসা, দ্বেষ, অসূয়া প্রভৃতি তাহার নিত্য সহচর হয়। স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া সে সচরাচর পরের অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়।

শাস্ত্র "আমি"-বলির অনেক পুণ্য লিখিয়াছেনঃ—যে "আমি" বলি দেয়, সে ঈশ্বরের অনুগ্রহের পাত্র হয়, লোকের নিকট আদর পায়, চিরকাল সুখে থাকে। "বিনয়" দেবতা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে নানাবিধ সুখের অধিকারী করেন।

শিশুগণ, তোমরা খুব যত্ন করিয়া এই "আমি" টাকে ধরিয়া "বিনয়" ঠাকুরের কাছে বলি দাও। "আমি"র আর একটা নাম আছে সেটা কি বল ত?

বিড়াল বাবু।

দেখেন বিড়াল বাবু ঘুম ভেঙ্গে চেয়ে।
রাঙ্গা রবি-করে গেছে চারিদিক ছেয়ে॥
"ওই যা! আজ কি ভোরে ডাকেও না কাক।
তাই ত! কখন্ হ'বে মর্ণিং ওয়াক্?"
এই ব'লে মুখ ধুয়ে নেন তাড়াতাড়ি।
কালী ছিল মুখে, কাল খেয়েছেন হাঁড়ি॥
তার পর এঁটে কোট গলায় কলার।
আয়নায় দেখিলেন মুখের বাহার॥

চিরুণি বুরুস নিয়ে চুল ফিরাইয়া॥
চলিলা পকেটে হাত, লেজ বাঁকাইয়া॥
ভুঁড়ির ঠেলায় কোট ছিঁড়ি ছিঁড়ি করে।
বাবু যেন কত বাবু যান মদ ভরে॥
এ রূপে বিড়াল বাবু গেলে কিছু দূর।
দেখিলা চরিছে গোরু, চারি পায়ে খুর॥
অমনি জুতার কথা জাগে আসি চিতে।
"ওই—যাঃ! ভুলিয়ে গেছি জুতো পায়ে দিতে!"

দিন রাত বাবুদের বৈঠকখানার।
জানালায় শুয়ে কাল কাটায় মার্জ্জার॥
দিন রাত কালোয়াৎ আসে সেথা কত।
হাত মুখ নেড়ে গান গায় শত শত॥
বিড়াল তা শুনে শুনে হ'ল কালোয়াৎ।
ভাবে সে, করিতে পারি মজলিস্ মাত॥
একদিন রাতে তাই সবে গেলে ঘরে।
দাঁড়ায় বিড়াল বাবু যন্ত্র ল'য়ে করে॥

হাত নেড়ে গলা ছেড়ে তান ভাঁজে রুখে।
ক্যাঁও ক্যাঁও বাজে সুর, ম্যাও ম্যাও মুখে ॥

তাল মান পলাইছে পেয়ে অপমান।
হাঁ ক'রে গিলিছে তবু রাগিণীর প্রাণ ॥
তাল ফাঁদে এ গায়ক বিড়ালের কাছে।
দেশে হেন কালোয়াৎ কোথা কেবা আছে?
যে বলে বিড়াল এঁরে, না বোঝে সে গান।
বিড়াল রূপেতে ইনি মিয়া তান্‌সান ॥

লম্বেও যেমন বাবু ওসারে তেমন।
বিশাল আকারখানি ভয়াল বদন ॥
কারে বাঁধা চসমা উজলে চোকে র'য়ে।
দুইখানা চোক জ্বলে চারিখানা হ'য়ে ॥
বিশাল দশনগুলি, কাণ দুটি খাড়া।
চুরুটের ধোঁয়া ওড়ে, গোঁপে দেন চাড়া ॥
কটিদেশে ডানি হাত, ছড়ি ধরা তায়।
দাঁড়ানে দারুণ ভঙ্গী, দেখে ভয় পায় ॥

এক দোষে মাটি শুধু—লেজ আছে ঝুলে।
গুটাইয়া চাপকানে নাও উটি তুলে ॥

তা হ'লে দ্বিগুণ যশ বাড়িবে তোমার।
বিড়াল বলিয়া কেহ চিনিবে না আর ॥

(প্রাপ্ত।)

বালিকার কৃতজ্ঞতা।

ভারতবর্ষের দক্ষিণে নীলগিরির সানুদেশস্থ ভূমিখণ্ড পরম-রমণীয়। উপরে নীল আকাশ, নীচে শ্যামল ক্ষেত্র, চারিদিক বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ। তথায় অবিরত পক্ষী-

দিগের কলকণ্ঠ শুনা যায়, মধ্যে মধ্যে বন্যজন্তুদিগের চীৎকার কর্ণগোচর হয়। তদ্ভিন্ন অন্য কোনও শব্দ নাই। মনুষ্যবসতি নিতান্ত বিরল—কেবল স্থানে স্থানে অসভ্য বন্যজাতিদিগের পর্ণকুটীর ও দুই একটী অট্টালিকা।

এই পার্ব্বত্য প্রদেশে লিণ্ড্‌সে নামক একজন ভারতবর্ষের বিচারপতি গ্রীষ্মবাসের নিমিত্ত একটী অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিনি প্রায় এ স্থলে থাকিতেন না। তাঁহার সহধর্ম্মিণী দুইটি সন্তান ও দাসদাসী লইয়া বৎসরের অধিক সময়ই সেইখানে কাটাইতেন। লিণ্ড্‌সের দুইটি সন্তান; জ্যেষ্ঠটির নাম উইলি বয়স ৭ বৎসর, কনিষ্ঠ এনি ৫ বৎসরের বালিকা। এনি বড় চতুরা। সে সহোদরকে প্রাণের অধিক ভালবাসিত। সেই জনহীন স্থানে তাহাদের আনন্দের পরিসীমা ছিল না। কিন্তু তাহাদের সে সুখ অধিক দিন ভোগ করিতে হইল না।

গ্রীষ্মশেষে একদিন সন্ধ্যাকালে এনির মাতা বারাণ্ডায় বসিয়া করতলে কপোল স্থাপন পূর্ব্বক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। সায়ংকালীন মনোহর দিনান্তশোভার প্রতি তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র দৃক্‌পাত ছিল না। তাঁহার কপালে চিন্তার রেখা। লোচন স্থির ও ক্ষণে ক্ষণে অশ্রুপূর্ণ হইতেছিল। উইলি আজ মৃত্যুশয্যায়। কয়দিন হইল সে কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়াছে। তাহার পিতাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সময় তিনি পড়িয়া গিয়া চলৎশক্তিহীন হইয়াছিলেন। প্রাণসম পুত্রের পীড়ার কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলেন—নিজে আসিতে পারিলেন না। অবিলম্বে বিচক্ষণ চিকিৎসক পাঠাইয়া দিলেন। অনেকরূপ চিকিৎসা হইল, কিন্তু রোগ কিছুতেই উপশমিত হইল না। আজ শেষদিন। মৃত্যু নিকট জানিয়া উইলির মাতা পুত্রের জন্য বিরলে বসিয়া নীরবে কতই কাঁদিতে ছিলেন। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে এনি, মাতার কাপড় ধরিয়া টানিয়া বলিল :—"মা, তুমি কাঁদ কেন? দাদা ভাল আছে?"

ইহা শুনিয়া মাতা ক্ষণকালের জন্য যেন আশ্বস্ত হইলেন। এনিকে ক্রোড়ে করিয়া চুম্বন করিলেন, চক্ষু মুছিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন :—"জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর যেন উইলি এখনই ভাল হইয়া যায়।" এনি জিজ্ঞাসিল,—"মা, আমি ভগবানকে ডাক্‌লেই অসুখ ভাল হ'য়ে যাবে?—ভগবানকে ডাকবো?" মা বলিলেন,—"ডাক মা!" এনি পুনরায় বলিল,—"তা হ'লে দাদা ভাল হয়ে যাবে? কি বল মা!" মা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বালিকার করুণকণ্ঠে তাঁহার শোক উছলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন :—

"মা, আর কি তোর দাদাকে দেখ্‌তে পাবি?"

কথাটি বালিকার মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিল। ক্ষুদ্র বালিকা ভাইকে হারাইতে হইবে শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

এমন সময় একজন দাসী আসিয়া এনির মাতার কাণে কাণে কি বলিয়া এনিকে ক্রোড়ে লইয়া চলিয়া গেল।

মাতা চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বালক উইলি খাবি খাইতেছে। কাঁদিতে কাঁদিতে শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। পরক্ষণেই বালক চক্ষু মুদ্রিত করিল। মুখের কোনও রূপ বিকৃতি হইল না—মনে হইল যেন বালক নিদ্রিত, কিন্তু সে নিদ্রা আর ভাঙ্গিল না। প্রাণের ভগিনীকে একলা ফেলিয়া উইলি নিঃশব্দে প্রাণত্যাগ করিল।

উইলির মৃত্যুর পর এনি গৃহে আসিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল। সহজে তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ

হইল না। আবার যখন মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইতে লাগিল, তাহার একটু পরেই এনি পুনরায় মূর্চ্ছিত হইতে লাগিল। ডাক্তার আসিয়া দেখিলেন—অনেকরূপ চিকিৎসা করিলেন—কিছুতেই উপকার পাওয়া গেল না। পুত্রশোকে কাতরা মাতা কন্যার মঙ্গলের জন্য নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে এনির মাতা ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, ভ্রাতৃ-বিয়োগ-জনিত দুশ্চিন্তা পরিহার ভিন্ন কিছুতেই আর এনির এ রোগের উপশম নাই। এনি বড় তেজস্বিনী বালিকা। সৈনিক পুরুষ দেখিলে উহার আর আনন্দের সীমা থাকে না। অতএব উহার কাছে সর্ব্বদা সৈনিক পুরুষ আনিয়া রাখিতে পারিলে উহার মনের গতি ফিরিতে পারে।

এইরূপ স্থির করিয়া এনির মাতা তথাকার এক সেনানিবাসের অধ্যক্ষকে পত্র দিলেন। অধ্যক্ষের সহিত তাঁহার অনেক দিনের আলাপ। তিনি পত্রপাঠমাত্র ক্ষণ-বিলম্ব না করিয়া পত্রবাহকের সহিত ব্রাউন নামক একজন সৈনিককে পাঠাইয়া দিলেন।

ব্রাউন সাহেব আসিয়াই এনির ঘরে প্রবেশ করিল, এনি বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সময়ে সময়ে যখন তাহার জ্ঞান হইত, তখন সে কেবল "উইলি উইলি" করিয়া কাঁদিত। আহার দিলে সে উইলির হাতে খাইতে চাহিত। খেলিতে বলিলে, সে উইলিকে খুঁজিত। কিন্তু কিছুই তাহার ভাল লাগিত না। যখন ব্রাউন সাহেব গৃহে প্রবেশ করিল, তখন এনি তাহার পোষাক দেখিয়াই তাহাকে সৈনিক পুরুষ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিল। দেখিবামাত্র এনির মুখে আনন্দের হাসি দেখা দিল। ভ্রাতৃবিয়োগের পর এনি এই প্রথম হাসিল। সে হাসিতে মাতা যেন কিছু আশ্বস্ত হইলেন। এনি হাত বাড়াইয়া সৈনিককে নিকটে ডাকিল। সৈনিক আসিয়া এনিকে ক্রোড়ে লইল। এনি তাহাতে অহ্লাদিত হইয়া সৈনিককে তথায় থাকিতে অনুরোধ করিল। ব্রাউন সাহেব একজন সামান্য বেতনভোগী কর্ম্মচারী, অধ্যক্ষের বিনানুমতিতে অধিক দিন থাকিলে পাছে কর্ম্মচ্যুত হয় এই ভয়ে দুই এক দিন থাকিয়াই যাইতে চাহিল। এনি তাহাতে কাঁদিতে লাগিল। এনির মাতাও কন্যাকে সম্পূর্ণরূপ সুস্থ না করিয়া তাঁহাকে যাইতে দিলেন না—সৈন্যাধ্যক্ষকে পত্র লিখিলেন। তাহাতে ব্রাউন সাহেব দুই মাস ছুটী পাইল। এই দুই মাস কাল এনি ব্রাউন সাহেব ভিন্ন আর কাহারও কাছে থাকিত না।

একদিন সন্ধ্যাকালে এনি ব্রাউন সাহেবের সহিত বেড়াইতে যাইতেছিল। বেড়াইতে বেড়াইতে এনি তাহাকে তাহার সংসারের কথা জিজ্ঞাসা করিল। সৈনিক তাহাতে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ-করিয়া বলিল,—"আমি একজন সামান্য বেতনভোগী কর্ম্মচারী। বিলাতে আমার স্ত্রী ও তিনটি শিশু সন্তান আছে। তাহাদের বড় দুরবস্থা। আমার এই অল্পবেতন হইতে তাহাদের ভরণপোষণ চলিতে পারে এমন কিছুই পাঠাইতে পারি না। ছোট ছোট ছেলেগুলিকে একটী খেলনার সামগ্রী দিতে পারি নাই। এই সকল কারণে আমি বড় কষ্টে আছি। যদি আমার কেহ না থাকিত, অথবা অধিক বেতন পাইতাম, তবেই আমার এ দুঃখ ঘুচিত।"

সৈনিকের এই সকল দুঃখের কথা শুনিয়া এনির চক্ষে জল আসিল। বালিকা কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হইলে তুমি ও তোমার পরিবার সুখে থাকে?" সৈনিক বলিল "পদোন্নতির জন্য আমি মান্দ্রাজের প্রধান সেনাপতি হেরিসের

নিকট দুই তিন বার আবেদন করিয়াছিলাম, কিন্তু আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে। এক্ষণে যদি আমার এমন কোনও সুহৃদ্ থাকেন যে, প্রধান সেনাপতিকে অনুরোধ করিয়া আমার পদোন্নতি করিয়া দিতে পারেন, তবেই আমি সুখী হই, নতুবা আমার দুঃখের অবধি নাই।"

সৈনিকের এই কথা শুনিয়া বালিকার মুখ ঈষৎ হর্ষোৎফুল্ল হইল। বালিকা বলিল :—"তুমি চিন্তিত হইও না। আমরা এখান হইতে শীঘ্রই মান্দ্রাজে যাইতেছি। আমার পিতা সেখানকার বিচারপতি। আমি সেখানে গিয়া আপনার ভাল করিব। আপনার কথা কখনও ভুলিব না।"

ব্রাউন বালিকার এই সকল পরদুঃখ মোচনের কথা শুনিয়া মনে মনে তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

এনি গৃহে আসিয়াই শুনিল, তাহার পিতা তাহাদিগকে মান্দ্রাজ যাইবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন। এ সংবাদে এনি বড় সুখী হইল। মান্দ্রাজ গিয়া হয় ত ব্রাউন সাহেবের উপকার করিতে পারিবে, এই ভাবিয়া সুখী হইল। দুই মাস পূর্ব্বে একদিন যে ব্রাউন সাহেবের যাইবার কথা শুনিয়া এনি কত কাঁদিয়াছিল, আজ আবার তাঁহারই ভাল করিতে পারিবে ভাবিয়া, তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিল।

পরদিবস তাঁহাদের যাওয়া স্থির হইল। এনি তাহার ভাল ভাল খেল্‌নাগুলি আনিয়া ব্রাউন সাহেবের হাতে দিয়া বলিল,"এ খেল্‌নাগুলি আপনি নিন, আপনার ছেলেদের জন্য পাঠাইয়া দিবেন।" এ খেল্‌নাগুলি এনির এত আদরের ছিল যে, উইলিও কখন তাহাতে হাত দিতে পারিত না।

যাত্রাকালে এনির মা ব্রাউন সাহেবকে যথেষ্ট পুরস্কার দিলেন। এনি কাঁদিতে লাগিল। ব্রাউন সাহেবও কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় হইলেন।

মান্দ্রাজে আসিয়া অবধি এনি কেবল প্রধান সেনাপতিকে দেখিবার জন্য সুযোগ খুঁজিতেছিল। সৌভাগ্যবশতঃ সেই সুযোগ আপনা হইতেই আসিল।

একদিন এনির পিতা এনিকে লইয়া ঘোড়-দৌড়ের মাঠে ঘোড়দৌড় দেখিতে গেলেন। মাঠ লোকে লোকারণ্য, এক দিকে বড় লোকদিগের বসিবার জন্য পৃথক আসন ছিল, উচ্চপদস্থ অনেক কর্ম্মচারী তথায় উপস্থিত ছিলেন। এই সকল দেখিয়া এনির মনে মনে বড় আহ্লাদ হইল, ভাবিল—হয়ত এখানে সৈন্যাধ্যক্ষ আসিয়াছেন। এনি সেনাপতিকে চিনিত না। পিতার নিকট হইতে সরিয়া গিয়া একজনকে সেনাপতির কথা জিজ্ঞাসা করিল। সে এনিকে চিনিতে পারিয়া বলিল :—"সৈন্যাধ্যক্ষকে তোমার প্রয়োজন কি? তিনি এই মাত্র তোমার পিতার সহিত কথা কহিয়া ঐ দিকে গিয়াছেন।" এই বলিয়া সৈন্যাধ্যক্ষকে দেখাইয়া দিল।

এনি গিয়াই তাঁহার পদতলে পড়িল। সেনাপতি বিস্মিত হইয়া বালিকাকে তুলিলেন। এনি বলিল, "আমি, বিচারপতি লিও্‌সের কন্যা। দয়া করিয়া আজ আমার একটি কথা আপনাকে শুনিতে হইবে। আপনার অধীনে ব্রাউন নামে একজন সৈনিক আছেন। তিনি আমার বড় হিতাকাঙ্ক্ষী, আমার অনেক উপকার করিয়াছেন। তাঁহার যত্নে আমি কঠিন পীড়া হইতে রক্ষা পাইয়াছি। আমি তাঁহার উপকার করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আপনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া যদি তাঁহার একটু পদোন্নতি করিয়া দেন, তাহা হইলে আমি বড়ই সুখী হইতে পারি।"

বালিকার সরল হৃদয়টি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ দেখিয়া সেনাপতি প্রীত হইলেন, এবং ব্রাউন সাহেবের

পদোন্নতি করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। এনি হৃষ্টচিত্তে পিতার নিকট গিয়া সকল কথা বলিল। তিনি তাহাতে এনির উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে ব্রাউন সাহেবের পদোন্নতি হইল। ব্রাউন সাহেব বুঝিতে পারিলেন, এনি না থাকিলে তাঁহার ভাগ্যে এ সুখ কিছুতেই ঘটিত না। ব্রাউন কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট এনির দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিল ও মনে মনে শত সহস্রবার ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

ধাঁধা।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

১। ত মা ল
মা ল ব
ল ব ণ।

২। ময়দানব।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মে মাসের দুইটি ধাঁধারই ঠিক উত্তর দিয়াছেন :—

শ্রীমতী কামিনীসুন্দরী বন্দ্যোপাধ্যায়, হুগলি; শ্রীমতী হেমপ্রভা দত্ত, কালীঘাট; শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, কলিকাতা; শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সেন, গৌহাটী; শ্রীশ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বালুরঘাট; শ্রীসুরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, ছাপ্‌পারমুখ; শ্রীমণীন্দ্রনাথ চৌধুরী, গিরিধি; শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের টোলের ছাত্রগণ, গোক্ষদী; শ্রীতুলসীন্দ্রনাথ মিত্র, কোন্নগর; শ্রীকুমুদিনী দেবী, হালিসহর; শ্রীমৃণালিনী দেবী, হালিসহর; শ্রীসুধীরচন্দ্র সান্যাল, পাবনা; শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ক্ষুরুট; শ্রীমতী চারুবালা দেবী, বোদা; শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সেন, গড়বেতা; শ্রীগোষ্ঠবিহারী লাল, রাণিগঞ্জ; শ্রীমতী মৃণালিনী মুখোপাধ্যায়, বহরমপুর; শ্রীমহেন্দ্র নাথ প্রধান, মহিষাদল; শ্রীগণেন্দ্রনাথ মিত্র, কলিকাতা; শ্রীনলিনীবালা রায়, সেনহাটী; শ্রীসরোজনাথ ঘোষ, বেলতলা; শ্রীআশুতোষ দে, সোনামুখী; শ্রীআশুতোষ দত্ত, কাশিয়াডাঙ্গা; শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র সিংহ চৌধুরী, ভান্ডাড়া; শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস, তারাপুর; শ্রীমতী সৌদামিনী চক্রবর্ত্তী, বাঘৈর; শ্রীহেমন্তকুমার চৌধুরী, ধানশিরীমুখ; শ্রীসুবোধ মিত্র, কান্দি; শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, কলিকাতা; শ্রীসতীশচন্দ্র চৌধুরী, কান্দি; শ্রীশরচ্চন্দ্র হালদার, রামনগর; শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভাগলপুর; শ্রীপ্রমথনাথ বিশ্বাস, জলাবাড়ী; শ্রীরমণীমোহন সরকার, টেপা তারামোহন স্কুল; শ্রীক্ষেত্রনাথ পাল, কাশিমবাজার; শ্রীমতী সরযূবালা দেবী, নিমতা; শ্রীবিশ্বেশ্বর বসু, বনগ্রাম স্কুল; শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, কালীঘাট; শ্রীবসন্তকুমার পাল, রাঁচি; শ্রীশ্রীশচন্দ্র গুপ্ত, হুগলি; শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার, কলিকাতা; শ্রীপ্রমথনাথ সান্যাল, রূপসী; শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র সেন, বরিশাল; শ্রীহীরালাল পাল, মহম্মদপুর; শ্রীমতী কিরণশশী সিংহ, বুন্ধাইপাড়া; শ্রীশ্রীশচন্দ্র সেন, মাগুরা; শ্রীমতী গিরিবালা দাস, বীরশ্রী; শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মাণিকদহ স্কুল,; শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী ঘোষ, নাড়াজোল; শ্রীললিতমোহন বিশ্বাস, নড়াইল; শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চৌধুরী, কলিকাতা; শ্রীনিরঞ্জনচন্দ্র মিত্র, শিবপুর; শ্রীযোগেশচন্দ্র খাসনবীস্, নীলগঞ্জ; শ্রীচারুচন্দ্র সেন, ঢাকা; শ্রীএককড়ি দে, চুঁচড়া; শ্রীমাখনলাল কুণ্ডু, কলিকাতা; শ্রীযতীন্দ্রমোহন কুণ্ডু, কলিকাতা; শ্রীবিরজাসুন্দরী দাস, আখালিয়া; শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বসু, দ্বারভাঙ্গা; শ্রীবসন্তকুমার পাল, কালীগঞ্জ স্কুল; শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দত্ত, কলিকাতা।

নূতন ধাঁধা।

সর্ব্বত্র আমার বাস যথা তথা নয়।
স্বরগে সোহাগে থাকি সুরপুরময়॥
সুধীর প্রাসাদে থাকি সোপানে সোপানে।
যেখানে সুন্দর, রই আমি সেইখানে॥
সখা সখী সনে মিলে থাকি অনিবার।
বল দেখি প্রিয় সখা কি নাম আমার?

শ্রীমহীন্দ্রমোহন চন্দ, ময়মনসিংহ।

সখা
একাদশ ভাগ। ৭ম সংখ্যা।

জুলাই, ১৮৯৩।

বিবিধ।
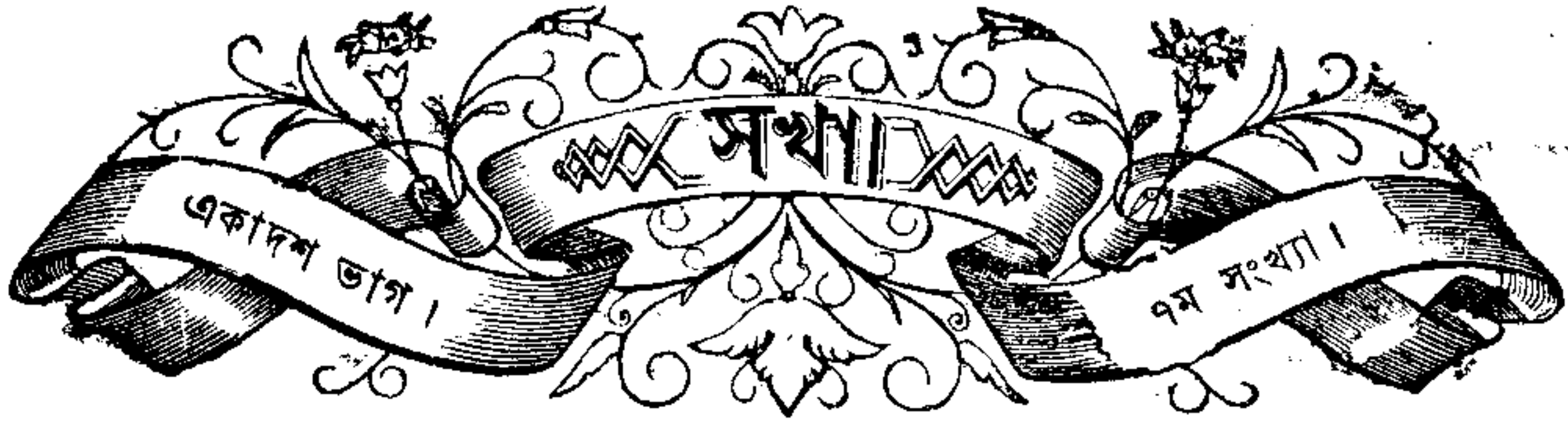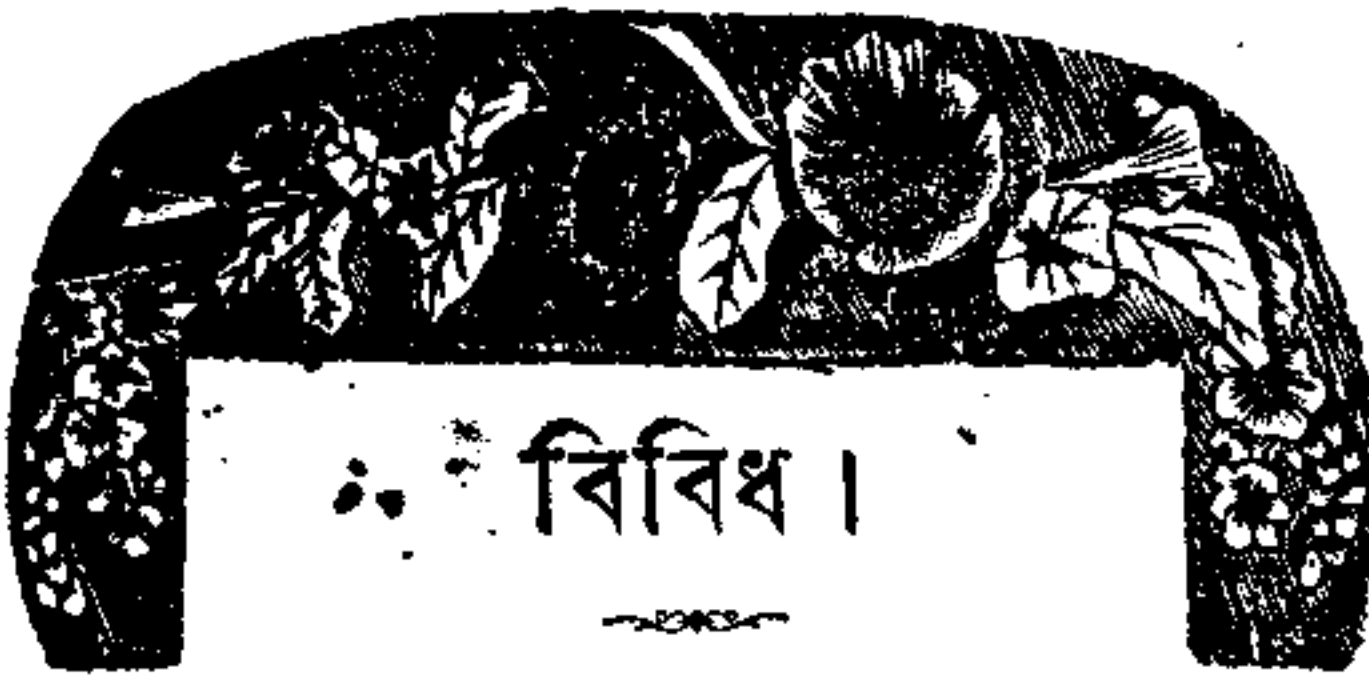
স্মরণার্থ সভা।—গত ১৩ই শ্রাবণ শুক্রবার ভারতবাসীর পরম বন্ধু মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণার্থ সিটি কলেজ, মেট্রপলিটান স্কুল ও সায়েন্স্ এসোসিয়েসনে সভা হইয়াছিল। সিটি কলেজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি অয়েল পেণ্টিং প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

*
* *

প্রতিমূর্ত্তি।—মান্দ্রাজের ত্রিবানড্রম নামক সহরে রাজা সার টি মাধব রাওয়ের একটি প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজনৈতিক বুদ্ধি বিবেচনায় কংগ্রেস হিতৈষী মহাত্মা সার টি মাধব রাও জগতে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন।

*
* *

গরীবের প্রতি দয়া।—সে দিন ক্যাম্বেল হাসপাতালে কুষ্ঠাশ্রমের রোগীদিগের জন্য কুচবিহারের মহারাণী বোম্বাই আম, আনারস, সন্দেশ ও বাতাসা পাঠাইয়াছিলেন। ইনি প্রতি বৎসরই এই রূপে রোগীদিগকে খাওয়াইয়া থাকেন।

*
* *

বোবার স্কুল।—সে দিন আমরা সিটি কলেজে বোবাদের কথা শুনিতে গিয়াছিলাম। বোবা আবার কথা বলিবে, এও কি কখনও হয়! গত ১৮৯২ সালের সখায় "বোবার কথা" প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি যে ইয়ুরোপ ও আমেরিকাতে বোবাদিগকে কথা বলান হইতেছে। বোবারা কেন কথা বলিতে পারে না, আমরা তাহা সেই প্রবন্ধে বলিয়াছি। গিয়া দেখিলাম, দুইটি হাবা অ, আ, ক, খ, পড়িল; বাবা, মা, প্রভৃতি সহজ সহজ কথাও দুই একটি বলিল।

*
* *

দান।—অনেকে আপনার কষ্টোপার্জ্জিত ধন স্বীয় সন্তান সন্ততিদিগের জন্য রাখিয়া যান। ধনের উত্তরাধিকারী হইয়া প্রায়ই অনেকে উহার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন না। কলিকাতার বিখ্যাত ম্যাকিনন্ ম্যাকঞ্জি কোম্পানির স্থাপন কর্ত্তা সার উইলিয়ম ম্যাকিনন্ সাহেবের কয়েক মাস হইল মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তিনি নানা প্রকার সৎকার্য্যে ৭৬,০০০ হাজার পাউণ্ড (প্রায় সাড়ে এগার লক্ষ টাকা) দান করিয়া গিয়াছেন; এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের কোম্পানির ভারতবর্ষীয় কেরাণীদিগকে ১,০০০০০ এক লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য উইল করিয়া গিয়াছেন। ম্যাকিনন্ সাহেবের এই সাধু দৃষ্টান্ত সকলেরই অনুকরণীয়।

চিতা দ্বারা শিকার।

প্রায় সকল প্রকার জন্তুকেই পোষ মানান যায়। প্রকাণ্ডকায় হস্তীগুলিও মানুষের বুদ্ধিকৌশলে পোষ মানে, ও শেষে মানুষের জন্য অনেক কাজও করিয়া থাকে। পশুরাজ সিংহও মানুষের প্রতি দয়া দেখাইয়াছেন, তোমরা শুনিয়া থাকিবে। বাঘের সহিত মানুষে খেলা করিয়া থাকে দেখা গিয়াছে। তাহাতে নানা প্রকারে তাহাকে অন্যমনস্ক রাখিতে হয়। বাঘকে বশে আনা বড়ই কঠিন। মান্দ্রাজ প্রদেশে কিন্তু এ হেন বাঘের দ্বারা লোকে শিকার পর্য্যন্ত করিয়া

থাকে। শিকারের দিনে পালক, চিতাকে কিছুই খাইতে দেয় না। একটী গোরুর গাড়ীর মধ্যে চিতাকে পূরিয়া, যে জঙ্গলে হরিণ থাকে, তথায় লইয়া যায়। শিকারে যাইবার সময় উহার চক্ষু দুইটী বাঁধিয়া রাখে। গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া চিতাকে গাড়ীর মধ্য হইতে উপরে উঠায়, এবং যে দিকে হরিণগুলি চরিয়া বেড়াইতেছে, চক্ষুর বাঁধন খুলিয়া উহাকে সেই দিকে ছাড়িয়া দেয়। এই সকল চিতাকে বাল্যকাল হইতে এমনই ভাবে শেখান হয় যে, ছাড়িয়া দিবার পর কি করিতে হইবে, তাহার জন্য চিতা একটুও ভাবে না। যাই ছাড়িয়া দেওয়া অমনি ছুট। হরিণের পালের নিকটবর্ত্তী হইলে চিতা সুযোগ খুঁজিতে থাকে। তখনকার হাব ভাব দেখিলে উহার মনের গতি বেশ বুঝিতে পারা যায়। সে হরিণগুলির অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে আপনাকে লতা পাতার মধ্যে লুকাইয়া অগ্রসর হইতে থাকে, আর প্রতিপদেই হরিণ ধরিবার সুযোগ খুঁজিতে থাকে। কখনও ধীরে ধীরে একটু অগ্রসর হইতেছে, কখনও বা আবার থামিতেছে। এই প্রকার করিতে করিতে হঠাৎ গিয়া হরিণের পালের মধ্যে পড়ে। হরিণগুলি ভয়ে ত্রস্ত হইয়া এদিক ওদিক ছুটিতে থাকে। চিতা যেটিকে লক্ষ্য করে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে থাকে। কিছু ক্ষণ পরেই তাহার ঘাড় কামড়াইয়া পালকের নিকট উপস্থিত হয়। পালক তৎক্ষণাৎ হরিণের গলাটা কাটিয়া উহার উত্তপ্ত শোণিত ও কতকটা মাংস চিতাকে খাইতে দেয়। বাঘ তাহাতেই সন্তুষ্ট হয়। পালক, শিক্ষার গুণে, বাঘের ন্যায় হিংস্র জন্তু দ্বারাও আপন কাজ সাধন করিয়া লয়।

পিতার ভবিষ্যৎ বাণী।

বিলাতে বিলিংহাম্ নামক একটি গ্রাম আছে। গ্রামের সকলেই প্রায় মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক, কাহারও বিশেষ অভাব নাই। এই গ্রামের একটি বাড়ীতে জনৈক প্রাচীন ভদ্র লোক তাঁহার স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করিতেন। গৃহের কর্ত্তা এখন আর কোন কাজ কর্ম্ম করেন না, যৌবনের সঞ্চিত অর্থেই এক রকমে দিনপাত হয়। একদিন এই স্ত্রীপুরুষ মধ্যাহ্নভোজনান্তে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়—একটি আট বৎসর বয়স্ক মোটাসোটা বালক আসিয়া উপস্থিত হইল। বালককে দেখিয়াই গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন,—

"জিমি, তুমি কোথায় গিয়াছিলে? দেখিও টমের সঙ্গে খেলিতে যাইও না। তাহার ত লেখা নাই, পড়া নাই—খেলাই সর্ব্বস্ব; আর কেবল কাহার অনিষ্ট করিবে, সেই চিন্তা।"

জিম্ বলিল:—"মা আমি ত টমের সঙ্গে খেলিতে যাই নি; সেই যে—সে দিন বারণ ক'রেছিলে, সেইদিন অবধি আর যাই নাই। আমি কোথা গিয়েছিলেম্ ব'লবো? না—ব'ল্‌বো না—" এই বলিয়া বালক নিজের মুক্তাতুল্য দন্তগুলি বাহির করিয়া ঈষৎ হাস্য করিল।

মাতা সেই হাসি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। জিম্‌কে ক্রোড়ে করিয়া সাদরে চুম্বন করিলেন। জিম্ তাঁহাদের বৃদ্ধ বয়সের সন্তান—"আঁধার ঘরের মাণিক"।

পিতা বলিলেন,—"জিম্, লক্ষ্মী বাবা! বল-না কোথা গিয়েছিলে?"

জিম্। বল্‌বো? আমি খুড়ীমাকে দেখিতে গিয়াছিলাম।—হাঁ মা! খুড়ীমার পৃথিবীতে কি কেউ নাই? তিনি একা সংসারের সকল কাজ কি ক'রে করেন? একে বুড়ো—তাহাতে রোগা, তাহার উপর আবার তাঁর দুঃখের জ্বালা—আহা, তাঁর কত কষ্ট মা! আমাকে দেখে তিনি কত কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

মাতা। তুমি তাঁকে কি ব'ল্‌লে?

জিম্। আমি আর কি ব'ল্‌বো? আমারও বড় কান্না পেতে লাগ্‌লো। হাঁ মা, আমি রোজ্‌গার কর্‌তে শিখ্‌লে খুড়ীমাকে আমাদের বাড়ীতে এনে রাখ্‌বে?

কর্ত্তা ও গৃহিণী বালকের স্বভাবের মাধুর্য্য এবং সরলতা দেখিয়া প্রীত হইলেন, উভয়ের চক্ষুতেই বিন্দু বিন্দু জলকণা দেখা দিল। মাতা, জিম্‌কে পুনরায় চুম্বন করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা রাখ্‌বো।"

শুনিয়া, জিমের গায় আর আহ্লাদ ধরে না। সে আহ্লাদে ছুটিয়া পলাইল। কিন্তু দরজা পর্য্যন্ত যাইয়া হঠাৎ মাতার দিকে ফিরিয়া বলিলঃ—

"হাঁ মা, আর এক কথা!" মাতা তাহার মুখের দিকে চাহিলেন।

জিম্ বলিল,—"কাল্ থেকে সকালে চা খাইবার সময় আমি আর বিস্কুট খাইব না। বিস্কুটগুলি লইয়া খুড়ীমাকে দিব।"—এই বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই জিম্ পলাইয়া গেল।

কর্ত্তা, গৃহিণীর প্রতি চাহিয়া বলিলেনঃ— "এমিলি, আমার ভবিষ্যদ্বাণী শোন—এ বালক বাঁচিলে, কালে মহৎ লোক হইবে।"

এমিলি। কিন্তু এক কথা, জিম্ এখন বড় হইয়াছে। উহার পড়া শুনার কোনই বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইল না।

প্রবীণ জর্জ্ বলিলেন,—"সে কথা আমিও ভাবিতেছি। আমি মনে করিয়াছি, জিম্‌কে ইতি মধ্যেই কোন বোর্ডিং স্কুলে দিব।"

বিলাতের ছেলেরা স্কুলেই থাকে, স্কুলেই পড়ে। কেবল বন্দের সময় বাড়ী আসিতে পারে। আমাদিগের এখানকার ছেলেদের মত স্বাধীনভাবে চলিতে পারে না। সকল সময়েই নিয়মে বাঁধাবাঁধি হইয়া থাকিতে হয়।

বোর্ডিং স্কুলের কথা শুনিয়া, মাতার প্রাণ চমকিয়া উঠিল। জীবনের একমাত্র সম্বল জিম্‌কে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে, এই কথা মনে হইয়া তাঁহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল।

জর্জ্ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেনঃ—"শিহরিলে কি হইবে?—ছেলের মঙ্গলের জন্য এ ক্লেশ সহ্য করিতেই হইবে।"

অবশেষে অনেক বাদানুবাদের পর, স্থির হইল, জিম্‌কে শীঘ্রই "অক্সফোর্ড্ গ্রামার স্কুলে" দেওয়া হইবে।

(২)

ক্রমে জিমের স্কুলে যাইবার দিন নিকটে আসিতে লাগিল। জিম্ এই প্রথম বাড়ী ছাড়িয়া যাইবে, সুতরাং যাইবার কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই তাহার মন বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। আর মাতার ত কথাই নাই; একা এক স্থানে দুদণ্ড বসিলেই, তাঁহার চোক দিয়া জল পড়িতে লাগিল। জিমিকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া বাঁচিবেন, এই ভাবনায় তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

অবশেষে পিতা মাতাকে ছাড়িয়া জিমের বোর্ডিং স্কুলে যাইবার দিন আসিল। মাতা প্রাতে উঠিয়াই বিষণ্ণমনে জিমির যাওয়ার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পিতা—"এটি দেও" "ওটি দেও" বলিয়া দেখাইয়া দিতে লাগিলেন।

আর জিমি? সে আজ প্রত্যূষে উঠিয়াছে। উঠিয়া, বারান্দায় একটি চেয়ারে গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে। তাহার সেই সময়ের সৌন্দর্য্য যে দেখিতেছে, সেই মুগ্ধ হইতেছে। বড় বড় থোবা থোবা চুলগুলি কপালের উপর ঝুলিয়া রহিয়াছে, প্রাতঃকালের মৃদু বাতাস সেইগুলি লইয়া খেলা করিতেছে। বড় বড় চোক দুটি ঘুমের আবেশে, চোকের জলে ঈষৎ ফোলা;—সেই স্বর্গীয় পবিত্রতা মাখা মূর্ত্তি পৃথিবীতে অতুলন।

ক্রমে জিমের যাইবার সময় হইল। তিনজনে ষ্টেসনে গেলেন। এমিলির চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ক্রমে ষ্টেসনে গাড়ী আসিল, পিতাপুত্রে গাড়ীতে উঠিলেন। মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে জিমের মুখচুম্বন করিলেন। জিম্ মাতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল ঃ—

"মা, তুই কাঁদিস্ না—আমি তোর জন্যে খাবার নিয়ে আস্‌বো।"

আর এক মিনিট পরেই ট্রেন "হুস্" "হুস্" করিয়া চলিয়া গেল। এমিলি কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিলেন।

(৩)

জিম্ স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছে। সে ছাত্রনিবাসের ছেলেদের সঙ্গে এক সঙ্গে আহার করে, এক সঙ্গে পড়ে এবং খেলিবার সময় এক সঙ্গে খেলে। কিন্তু তাহাদের সঙ্গে বড় একটা মেশে না। প্রথম প্রথম একাকী বসিয়া বাড়ীর চিন্তা করিতে তাহার বড় ভাল লাগিত, এবং সর্ব্বদা পিতা মাতাকে দেখিবার জন্য সে বড়ই ব্যাকুল হইত। কিন্তু অভ্যাসের গুণে ক্রমশঃ আর তাহার ততটা কষ্ট বোধ হয় না। তথাপি সে এখনও নির্জ্জনে বসিয়া বাড়ীর কথা, পিতা মাতার কথা ভাবিত, অন্যান্য ছেলেরা তাহার এইরূপ স্বভাব দেখিয়া তাহার উপর বড়ই বিরক্ত।

(৪)

এইরূপে প্রায় আট বৎসর চলিয়া গেল। জিম্ এখন ষোড়শবর্ষীয় যুবক। তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বিলক্ষণ সবল হইয়াছে। তাহার সমপাঠীরা কেহই তাহার সহিত ব্যায়ামে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। জিম্ পড়া শুনায়ও বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এখনও সে কাহারও সহিত মেশে না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক একাকী বেড়াইতে ভালবাসে। ছেলেদের অসার বাচালতা তাহার ভাল লাগে না। সকলেই তাই জিমের উপর বিরক্ত। কেহ কেহ বিদ্রূপ করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছে "পেচক"।

এক দিন জিম্ বসিয়া আছে, এমন সময় পিয়ন একখানি পত্র দিয়া গেল। জিম্ দেখিল, তাঁহার পিতার হাতের লেখা। পত্রে লেখা ছিল,—

"প্রিয় জিম্,

আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। যে ব্যাঙ্কে আমাদের টাকা জমা ছিল, তাহা ফেল হইয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে বোধ হয় অনাহারে মরিতে হইবে। এই সংবাদ পাইয়া তোমার মাতা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন—বাঁচিবেন কিনা সন্দেহ। তুমি একবার আসিও। হাতে একটি পয়সা নাই, চিকিৎসার খরচ কি দিয়া চালাইব, বুঝিতে পারি না। ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

তোমার পিতা।"

জিম্ পত্রখানি পড়িল। তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল। পত্রখানি দশ বার পড়িল, দশ বার রাখিয়া দিল। কি পরিবর্ত্তন! সংসারের কি বিচিত্র গতি! আজ যে ধনী, কাল সে ভিক্ষুক—তবে মানুষ অহঙ্কার করে কিসের?

জিম্ ছুটি লইয়া বাড়ী গেল। যাইয়া দেখিল, পিতা মাতা উভয়েই অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। জিমের চেষ্টায় তাঁহারা আরোগ্য হইলেন বটে, কিন্তু একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিলেন।

মাতা বলিলেন—"বাবা! উপায় কি হবে?"

জিম্ উত্তর করিল—"মা জগদীশ্বর উপায় করিবেন। পৃথিবীতে না খাইয়া কে মরিয়া থাকে? এক প্রকারে দিনপাত হইবেই হইবে।"

জিম্, মাতাপিতাকে শান্ত করিল। পরে পুরাতন বাড়ী বিক্রয় করিয়া একটি সামান্য বাড়ীতে তাঁহাদিগকে রাখিয়া, স্কুলে ফিরিয়া আসিল।

হায়! সেই পুরাতন বাড়ী, সেই পুরাতন উদ্যান, পুরাতন আসবাব্—এ সমুদয় ছাড়িয়া আসিতে জর্জ্ ও এমিলির প্রাণে কি কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল!

ক্রমশঃ।

সুয্যি মামার দেশ।

ঠাকুরমার নিকট তোমরা নিশ্চয়ই সুয্যি মামার দেশের অনেক গল্প শুনিয়াছ। সুয্যি মামা আট ঘোড়ার রথে চড়িয়া ভ্রমণে বাহির হন, সুয্যি মামার রথের সারথি অরুণ, তাই যখন তিনি পূর্ব্ব দিক দিয়া ভ্রমণে বাহির হন তখন আকাশ রক্তবর্ণ হয়, ইত্যাদি। আমাদের গল্পে সে প্রকার অলৌকিক ব্যাপার কিছুই নাই। যাহা আজ তোমাদিগকে বলিব সে সকলই সত্য। তবে সত্য হইলেও অনেক অদ্ভুত ব্যাপার আমাদের সুয্যি মামার দেশে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। আজ আমরা কেবলমাত্র তোমাদিগকে মামা মহাশয়ের দেশের প্রাকৃতিক অবস্থাদি বিষয়ে দুই একটা কথাই বলিব।

পুরাতন মহাদেশের মধ্যে জাপানের পূর্ব্ব দিকে আর দেশ নাই। সূর্য্য উদয় হইলে জাপানবাসীরাই সর্ব্বপ্রথমে সূর্য্য দেখিতে পান। চীন প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত পশ্চিমদেশবাসীরা সেকালে মনে করিতেন, সূর্য্যদেব জাপান হইতেই আকাশে উঠেন; তাই চীনদেশবাসীরা উহাকে জি-পেন বলিতেন। জি-পেন কথার অর্থ—যে স্থান হইতে সূর্য্য উঠে। এবং সেই জি-পেন কথা হইতে বর্ত্তমান জাপান নাম হইয়াছে। চীনদেশবাসীদের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও জাপানকে সুয্যি মামার দেশ বলিলাম। বোধ হয় আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে এই নামকরণে কোন প্রকার আপত্তি হইবে না।

মামা মহাশয়ের দেশের প্রাকৃতিক এবং আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন বিস্ময়জনক। সময় সময় আগ্নেয় পর্ব্বতে জাপানের অনেক প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তেমনই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই দেশের লোকের আচার ব্যবহার রীতি নীতি সম্বন্ধেও খুব পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। আসিয়াতে জাপানবাসীদিগের ন্যায় ক্রমোন্নতিশীল জাতি আর নাই।

জাপানের প্রাকৃতিক অবস্থার কথা কহিতে গেলেই, সর্ব্বাগ্রে ইহার আগ্নেয়গিরির কথা বলিতে হয়। জাপানে যতগুলি আগ্নেয় পর্ব্বত আছে, এত আর কোন দেশে নাই। প্রায় কুড়িটী পর্ব্বত হইতে এখনও দিবারাত্র অবিশ্রান্ত ধূম ও অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে। ইহা দ্বারা অন্ধকার রাত্রিতে নাবিকদিগের আলোকমঞ্চের কাজ হয়। এই সকল আগ্নেয় পর্ব্বতের অগ্ন্যুদ্গমে জাপানে সময়ে সময়ে ভয়ানক অনিষ্ট হইয়াছে। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে একদিন

ফিজিসান পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি হঠাৎ ভয়ানক অন্ধকারে আবৃত হইল। আকাশে মেঘ নাই অথচ সূচ্যভেদ্য অন্ধকার! মুহুর্মুহু বজ্রের ন্যায় ধ্বনিতে সেইস্থানের লোকেরা আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। এই ভীষণ ধ্বনি প্রায় ৬০ মাইল দুরবর্ত্তী স্থান হইতেও শোনা গিয়াছিল। আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে উদ্গীর্ণ পদার্থে নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি প্রায় ২ হাত প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। এই অগ্ন্যুদ্গম ফিজিসান পর্ব্বতে হয়। ইহাতে শত শত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। খ্রিষ্টীয় ১৮৭৪ অব্দে পুনরায় একদিন এই প্রকার অগ্ন্যুদ্গমে দেশবাসীর সর্ব্বনাশ হয়।

আমাদের দেশে ভূমিকম্পের উপদ্রব নাই বলিলেই হয়। দৈবাৎ ভূমিকম্প হইলেও, উহার কম্পন অতি সামান্য ও অল্পক্ষণস্থায়ী। কিন্তু আমাদের সূর্য্যিমামার দেশে বৎসরের মধ্যে প্রায় ৫০০ শতবার ভূমিকম্প অনুভূত হইয়া থাকে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে ক্রমান্বয়ে কয়েক দিন ভূমিকম্প হইয়াছিল, এবং কোন কোন স্থানে অল্পাধিক ক্ষতিও হইয়াছিল। কিন্তু এই একবারের ভূমিকম্পেই দেশময় হাহাকার রব উঠিয়াছিল। আর জাপানে বৎসরের মধ্যে ৫০০ শতবার ভূ-কম্প। জাপানবাসীদের প্রাণ ত সর্ব্বদাই আতঙ্কিত। পূর্ব্বে ভূমিকম্প সম্বন্ধে জাপানবাসীদের অদ্ভুত রকমের একটী সংস্কার ছিল। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, পৃথিবীর নীচে প্রকাণ্ড এক মৎস্য আছে; যখন সেই মৎস্য মহাশয় নড়েন, তখনই ভূমিকম্প হয়। কিন্তু ভূমিকম্প কেন হয়, তাহা তোমরা পূর্ব্বেই সখায় পাঠ করিয়াছ; সুতরাং আমরা সে সম্বন্ধে আজ আর কিছু লিখিব না।

খ্রিষ্টীয় ৬৮৫ অব্দের ভূমিকম্পে অনেক বড় বড় পর্ব্বত ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছিল। নদীর জল উচ্চ ভূমিতে উঠিয়াছিল। সহস্র সহস্র নর নারী, পশু পক্ষী, মুহূর্ত্ত মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। খ্রিষ্টীয় ১৮৩০ অব্দে কিউটো সহরে এক দিন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২০ বার ভূ-কম্প অনুভূত হইয়াছিল। আবার ১৮৫৫ অব্দের ১০ই নবেম্বর ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। ইহাতে সুন্দর টকিও সহরটী রাবিসের স্তূপে পরিণত হইয়াছিল। একে দুরন্ত ভূমিকম্পে লোকে অস্থির, তাহাতে আবার ৩০টী

বিভিন্ন স্থানে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কত লোক ঘর বাড়ী চাপা পড়িয়া ত মারা গেল। যাহারা কোন ক্রমে এতক্ষণ আপনাদিগকে বাঁচাইতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে আবার অগ্নিদেবের ভীষণ লোল জিহ্বাতে আপনাদিগকে আহুতি প্রদান করিল। টকিও সহরটি শ্মশানে পরিণত হইল। ঐ ভূমিকম্প ১৮ দিবস স্থায়ী হইয়াছিল। প্রায় দশ সহস্র লোক এই কয়েক দিনে মারা গিয়াছিল!

মাত্র দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৮৯১ অব্দে টকিও হইতে ১৫০ মাইল পূর্ব্বে কোন দেবমন্দিরে ৩০০ শত লোক একত্র হইয়া ইষ্টদেবের উদ্দেশে পূজা দিতেছিল, সেই সময় ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া মন্দিরটি ধরাশায়ী হইল। সেই সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সেই সমুদায় লোক সেই অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গেল—তাহাদের কোন চিহ্নই রহিল না। দুইটি জেলাতে ৭,৫২৪ জন লোক মারা গিয়াছিল। ভূমিকম্প ও আগ্নেয় পর্ব্বতের অগ্ন্যুদ্গম জাপানে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।

সূর্য্যি মামার দেশের লোকেরা পূর্ব্বে এই দুইটি উপদ্রবের হাত হইতে রক্ষা পাইবার কোন প্রকার চেষ্টা করে নাই। গত ১৮৮০ সালে অধ্যাপক মিল্‌নীর চেষ্টাতে একটি সভা গঠিত হইয়াছে। তাহাতে একটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই যন্ত্রের সাহায্যে ভূমিকম্প হওয়ার পূর্ব্বে লোকে তাহা জানিতে পারিয়া সাবধান হইতে পারে।

জাপানে ১০০টী উষ্ণপ্রস্রবণ আছে; এত উষ্ণপ্রস্রবণও আর কোন দেশে নাই। আগ্নেয় পর্ব্বতের পাদদেশে অনেকগুলি গন্ধকের প্রস্রবণ আছে। কাহারও কোন প্রকার চর্ম্মরোগ হইলে ইহাতে স্নান করিলে রোগ সারিয়া যায়।

সূর্য্যি মামার দেশ—সুতরাং তোমরা মনে করিতেছ দেশটি অত্যন্ত গরম। কোন কোন স্থলে অত্যন্ত গরম বটে। আবার কোন কোন স্থানের জলবায়ু কিন্তু খুব শীতল। নাতিশীতোষ্ণ স্থানও আছে। তামা, রসাঞ্জন, লৌহ এবং কয়লা এখানে খুব পাওয়া যায়। জাপানে চা বৃক্ষের চাষও হইয়া থাকে। বিড়াল বা বাঘ জাপানে আদবেই নাই। প্রায় সকল রকম জলজন্তুই মামাঠাকুরের দেশের লোকেরা আনন্দের সহিত ভোজন করিয়া থাকেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছ হইতে হাঙ্গর পর্য্যন্ত বাদ যায় না। ইঁহারা সাপ ও টিক্‌টিকির মাংসও, ঔষধের ন্যায় কাজ করে বলিয়া, ভক্ষণ করিয়া থাকেন।

আর এক দিন জাপানবাসীদিগের কথা তোমাদিগকে বলিব। পুরাতন মহাদেশের মধ্যে এখন জাপানেই সর্ব্ব বিষয়ে প্রচুর উন্নতি হইতেছে। এসিয়ার এরূপ উন্নতিশীল একটি দেশের সম্রাটের প্রতিকৃতি দেখিতে তোমাদের ঔৎসুক্য হইতে পারে এজন্য আমরা জাপানের বর্ত্তমান সম্রাটের প্রতিকৃতিও এই সঙ্গে প্রকাশ করিলাম।

কিণ্ডরগার্টেন।

আমাদের দেশের ছোট ছোট ছেলেরা যেমন বাঙ্গালা পাঠশালায় যায়, বিলাত ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশের শিশুরাও সেই রকম কিণ্ডরগার্টেন স্কুলে যায়। তিন বছর থেকে সাত বছর পর্য্যন্ত বয়সের ছেলেরা ঐ খেলার স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া থাকে। কিণ্ডরগার্টেন শিক্ষাপ্রণালী

ছোট ছোট বালক বালিকাদের বড়ই উপযোগী। উহা দ্বারা চালাক ছেলেগুলি আরও চালাক হয়, চতুর ছেলেদের বুদ্ধি আরও তীক্ষ্ণ হয়, আর বোকা ছেলেদেরও মাথা পরিষ্কার হইয়া বিবেচনা-শক্তি ধারাল হয়।

কিণ্ডরগার্টেন একটি জর্ম্মন্ কথা। উহার মানে খেলা ও সামান্য বস্তু দ্বারা শিশুকে কাজ ও জ্ঞান শিখান। ইউরোপের জর্ম্মনি দেশে ঐরূপ শিশু-শিক্ষার প্রথা প্রথম প্রচার হয়, এজন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ঐ প্রকার শিক্ষার স্কুলগুলি ঐ জর্ম্মন্ নামেই চলিত। জর্ম্মনি দেশে পণ্ডিত ফ্রোবেল কিণ্ডরগার্টেনের প্রথম ও প্রধান উদ্ভাবক; তাঁহারই বিশেষ যত্নও পরিশ্রম বলে ঐ শিক্ষাপ্রণালী ইউরোপের সর্ব্বত্র ও আমেরিকা পর্য্যন্ত প্রচলিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের পিতামাতারা ঐ শিক্ষার মহৎ উদ্দেশ্য এখনও সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত নহেন। আর সেজন্য এ দেশে কিণ্ডরগার্টেন স্কুলের দ্রুত বিস্তারও হইতেছে না। এত বড় কলিকাতা সহরে অনেকগুলি ছোট বড় স্কুল কালেজের মধ্যে সম্প্রতি কেবল দুইটিতে কিণ্ডরগার্টেন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। একটি কলিকাতা বালিকা বিদ্যালয়ে (The Calcutta Girls' School)—ইংরেজ ও খৃষ্টান শিশুদের জন্য; অপরটি সেঞ্চুরী স্কুলে—বাঙ্গালী ছেলে মেয়েদের জন্য।

কিণ্ডরগার্টেনের শিক্ষাপ্রণালী যে কিরূপ চিত্তাকর্ষক, তাহা নিজে চক্ষে না দেখিলে বুঝিবার সাধ্য নাই; তবে পাঠকপাঠিকাদের জন্য আমি যথাসাধ্য লিখিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব। মনে কর, শিক্ষয়িত্রী হাতে দুইটা জিনিস ধরিয়া আছেন, উহারা দেখিতে এক রকম হইলেও পরস্পর হইতে বিভিন্ন। একটা সূতার নরম গোলা, আর অন্যটা কাঠের শক্ত গোলা। ছেলেরা পূর্ব্বে ঐ সম্বন্ধে কিছু শিখিয়াছিল, কিন্তু এখন তাহারা উহা আর এক নূতন ভাবে দেখিল। উহা দ্বারা গোলাকার বস্তু ও উহার সহজে গড়ানর গতি তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায়। ঐ দুই রকম গোলার বিভিন্নতাও তাহারা শিখে, একটা নরম ও হাল্‌কা—বিনা শব্দে মেজের উপর গড়ায়; অন্যটা কঠিন ও ভারী—লাফাইয়া লাফাইয়া চলে।

শিক্ষয়িত্রী একে একে সব ছেলেগুলিকে কাছে ডাকিয়া গোলা দেখান। পরে তাহাদিগকে চোক বুজিতে বলেন ও প্রত্যেকের হাতে ক্রমে দুইটা গোলা দিয়া, কোন্‌টি কোন্ গোলা জিজ্ঞাসেন। তাহারা চক্ষে না দেখিয়াই, স্পর্শ-দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন গোলা নির্ণয় করে।
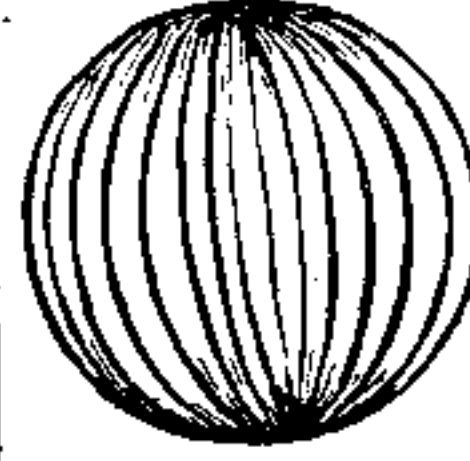
গোলা।

পরে তিনি একটার পর অন্যটা মাটীতে ফেলিয়া দেন, শব্দের দ্বারা শিশু তাহা কোন্‌টা, স্থির করে। এইরূপে অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদির চালনার জন্য, আরও অনেক প্রকার শিক্ষা দেওয়া হয়। ছেলেরা সকলে অতি আনন্দ ও উৎসাহের সহিত উহাতে যোগ দেয়। গোলা খেলার পর কিউব্, সিলিণ্ডার প্রভৃতি দ্বারা শিশু-দিগকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আকারজ্ঞান ও গণনার ধারণা শিখান হয়।

কিউব।

গোলা, কিউব ও সিলিণ্ডার প্রথমতঃ পৃথক্ ভাবে দেখান হয়। পৃথক্ ভাবে তাহাদের আকার ও কার্য্য বুঝাইয়া দেওয়া হয়। তৎপর গোলা ও সিলিণ্ডারে কি প্রভেদ, সিলিণ্ডারে ও কিউবে কি প্রভেদ, এইরূপে সমস্ত ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয়। এই প্রকার সাধারণ জিনিসগুলির স্ব স্ব আকৃতি, কার্য্য, এবং একের সহিত অন্যের তুলনা করিয়া তাহাদের মধ্যে প্রভেদ বেশ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ কঠিন

সিলিণ্ডার

বিষয়গুলি খেলার ছলে এমন সরল ও সুন্দর করিয়া বালকদের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া হয় যে, উহা শিখিতেও তাহাদের কোন কষ্ট হয় না, আর উহা কখন ভুলিয়াও যায় না।

ঐ প্রকার শিক্ষার পর তাহাদের নিজ নিজ কাজ করিবার সময় আইসে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুগুলি তখন ছোট ছোট বাড়ী বা পোল ইত্যাদি নির্ম্মাণ ও অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেরা কাঠের দ্বারা ঘর বাড়ী, বেঞ্চ, চৌকি, দেরাজ প্রভৃতি তৈয়ার করিতে আরম্ভ করে। প্রথমে তাহাদিগকে অতি সরল প্রথা মতে শিক্ষা দেওয়া হয়। দিয়াসলাইয়ের বাক্সর মত ছোট ছোট কাঠের টুক্‌রা দিয়া তাহারা নানা রকম ঘর বাড়ী, আস্‌বাব ইত্যাদি নির্ম্মাণ করে। প্রথমে উহা দ্বারা তাহারা সোজা, বাঁকা, প্রভৃতি জ্যামিতির রেখা টানিতে শিখে। অল্প দিনের মধ্যে তাহারা নিজেই কাঠের ঐ সব বড় বড় জিনিস তৈয়ার করিতে সক্ষম হয়। তাহারা নিজে যাহা বানায়, নিজ নিজ কল্পনা মতে তাহার ভিন্ন ভিন্ন নাম দেয়; এজন্য উহাতে তাহাদের কোন ভুল ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। শিশুরা আত্ম-সাহায্যে যাহার কল্পনা ও নির্ম্মাণ করে, তাহা কখনও ভুলিয়া যায় না।

সকলের চেয়ে ছোট ছেলেরা অতি সরল দ্রব্য লইয়া আরম্ভ করে। একটী বাক্সতে একটা বড় কিউব অর্থাৎ চৌকা থাকে। ছোট ছোট আটখানি চৌকা গায়ে গায়ে সাজাইয়া রাখিয়া সেই বড় চৌকা জিনিসটি তৈয়ার করা হয়। শিশুরা শিক্ষয়িত্রীর আদেশ মত ঐ চৌকাগুলি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আলাদা করিয়া রাখে ও সাজায়। উহা দ্বারা তাহাদের সংখ্যা জ্ঞান হয়, ও ছোট বড় দ্রব্যের তুলনা দ্বারা পরিমাণ করিবার শক্তি জন্মে। এইরূপে এক এক রকম ক্রীড়া শেষ হইতে থাকে, আর মাঝে মাঝে আধ ঘণ্টা করিয়া শিশুরা পড়া শিখে। উহাতে তাহাদের শরীর ও মন দুই-ই সমভাবে চালিত হয় ও বিশ্রাম পায় বলিয়া তাহারা শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়ে না। এমন কি অনেক শিশু কিণ্ডরগার্টেনের খেলা ও পড়া ছাড়িয়া বাড়ী যাইতেও চাহে না।

কিণ্ডরগার্টেন স্কুলে অনেক ছেলে জমিলে প্রত্যহ খেলা ও পাঠের পর এক একটী ছোট নাটকের অভিনয় দ্বারা তাহাদিগকে উচ্চারণ শক্তি, বক্তৃতা করা প্রভৃতি বাগিন্দ্রিয়ের চালনা শিক্ষা দেওয়া হয়। জনকতক ছেলে উহা অভিনয় করে, আর অবশিষ্টেরা গান গায়।

অভিনয় অনেক রকম হয়। এক দিন হয় ত দুজন বালক রাজা ও ঘোড়া সাজে, দুজন বালিকা সরাইয়ের কর্ত্রী ও তাহার দাসী হইয়া একটী কোণে, যেন রাস্তার ধারে সরাইয়ে বসিয়া থাকে। দুজন ছেলে কামার ও তার সঙ্গী হয়ে আর এক কোণে বসে। দরওয়ান গোলাকার বেড়ের মধ্যে থাকে। দুজন লম্বা ছেলে ফাটক হইয়া দাঁড়ায়, আর দুজন সহিস হইয়া আস্তাবলে কাজ করে। রাজা মহাশয় ঘোড়ায় চড়িয়া আস্তে আস্তে বেড়াইতে যান। কিন্তু অল্পক্ষণ পরে রাজা ও ঘোড়ার ক্ষুধা পাওয়াতে রাজা সরাইয়ের দিকে ঘোড়া ফিরান। সরাইয়ের কর্ত্রী ও তাহার দাসী তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার ঘোড়াকে জল খাবার দেয়। বিশ্রামের পর আবার রাজা ঘোড়ায় চড়িয়া সেখান হইতে যাত্রা করেন। কিছুদূর যাইতে না যাইতে রাজার ঘোড়া আবার থামে—এবার ঘোড়ার খুরের নাল ভাঙ্গিয়া গিয়েছে। রাজা আস্তে আস্তে কামারের দোকানে গিয়া উপস্থিত হন। সেখানে ঘোড়ার নাল বাঁধান শেষ হইলে, রাজা সেদিনকার মত হাওয়া খাওয়া শেষ করিয়া

বাড়ী চলিয়া যান। তাঁহাকে বাড়ীতে দেখিয়া ছেলেরা আবার গান গাহিয়া উঠে। ঐরূপ গানের মধ্যে তিনি ঘোড়া হইতে নামেন ও সহিসকে ঘোড়া দিয়া ছেলেদের সহিত কথাবার্ত্তা কহেন। এইখানেই এ খেলার শেষ। কিন্তু অন্যান্য সকল ছেলেরাই যাহাতে খেলায় যোগ দিতে পারে, সেজন্য তিন চার বার ঐ কৌতুকের অভিনয় করা হয়। এইরূপ আমোদ আহ্লাদ ও খেলার মধ্যে শিশুর মনে তাহার অজ্ঞাতসারে জ্ঞানের অঙ্কুর জন্মিতে থাকে। যত্ন ও সুবিধা পাইলে, সময়ে ঐ অঙ্কুর যে অতি বৃহৎ শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষে পরিণত হইয়া উঠে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

স্বর্গীয় নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর।

নিজের চেষ্টায় ফরিদপুর-নিবাসী এক জন সম্ভ্রান্ত মুসলমান, খাঁ বাহাদুর ও শেষে নবাব উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে কেহ নিজ পদোপরি দণ্ডায়মান হইয়া আপনার ও প্রতিবেশীর উন্নতি সাধন করিয়া যান, তিনিই সাধারণের পূজ্য। তাঁহার অভাবে দেশের লোক চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখে। অশ্রুজলে তাঁহার পূজা করিয়া থাকে।

নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর গত আষাঢ় মাসে ভারতবাসীকে কাঁদাইয়া এই সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মুসলমান ও হিন্দুর পরম বন্ধু ছিলেন। নবাব বাহাদুর সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল্যকালে তিনি কলিকাতা মাদ্রাসায় লেখা পড়া শিক্ষা করেন।

লেখা পড়া সাঙ্গ হইলে বিষয় কর্ম্মের প্রয়োজন। তখনকার দিনে ভাল কাজ পাওয়া এদেশীয়ের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার ছিল। বহু চেষ্টা করিয়া দারগাগিরির অধিক কাহারও বড় একটা জুটিত না। কিন্তু আবদুল লতিফের এই সময়ে একটী বিশেষ সুবিধা হইল। প্রবলপরাক্রান্ত নেপিয়র সিন্ধুর আমিরদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন। পরাজিত আমিরদিগের মধ্যে এক জন এই সময় দমদমাতে বাস করিতে-ছিলেন। আবদুল লতিফ তাঁহার এক জন প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন। এই কাজে তিনি অধিক দিন ছিলেন না। তাহার পর ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষকতা, স্যামুয়েল সাহেবের কেরাণীগিরি, এবং কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজের অধ্যাপনা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য করিয়া ১৮৪৬ খ্রিঃ অব্দে আলিপুরের ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন।

আজ হউক, কাল হউক, লোকের গুণ প্রকাশ হইবেই হইবে। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াই আবদুল লতিফ অসাধারণ কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যতৎপরতার পুরস্কার স্বরূপ খ্রিঃ ১৮৫২ অব্দে তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিলেন। এবং ইহার তিন মাস পরে তিনি বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার "জষ্টিস্ অব্ দি পিস্" পদে নিযুক্ত হইলেন।

আবদুল লতিফ তখনকার নূতন কলারোয়া মহকুমায় (বর্ত্তমান সাতক্ষিরা মহকুমা) প্রেরিত হইলেন। কলারোয়াবাসীরা নীলকরের উপদ্রবে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছিলেন, আবদুল লতিফ দুঃস্থ কলারোয়াবাসীদিগকে নীলকরদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখন নীলকর সাহেবেরা গভর্ণমেণ্টের পোষ্য-পুত্র ছিল, সুতরাং তিনি কৃতকার্য্য হইলেন না। আবদুল লতিফ হুগলির জাহানাবাদে বদলি হইলেন। জাহানাবাদ অতি ভয়ঙ্কর স্থান, বদমায়েসের আড্ডা ছিল। আবদুল লতিফ সেখানে গিয়া বদমায়েসদিগকে জব্দ করিয়া, জাহানাবাদে শান্তি-সংস্থাপন করিলেন।—তিনি যখন জাহানাবাদ পরিত্যাগ করেন, তখন সকলেই তাঁহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যপরায়ণতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার জন্য ৮০০৲ শত টাকা বেতনের একটী গ্রেড সৃষ্টি করিলেন।

ক্রমে ইনি আরও সম্মানের পদ লাভ করিলেন—ছোট লাটের ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য হইলেন। ইনি বৃদ্ধ বয়সে পেন্‌সন প্রাপ্ত হন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান করিয়াছেন। প্রথম খাঁ বাহাদুর তৎপরে নবাব উপাধি দ্বারা তাঁহাকে সুশোভিত করা হইয়াছিল।

এমন কাজ ছিল না যাহাতে সেই পক্ককেশ বৃদ্ধ, যুবকের ন্যায় উৎসাহে যোগদান না করিতেন। মুসলমানদিগের এমন পর্ব্ব ছিল না যেখানে নবাব সাহেব উপস্থিত না থাকিতেন।

গত ২৭শে আষাঢ় এই মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে। বঙ্গদেশের একটী রত্ন খসিয়া পড়িয়াছে। ভারতবাসী আজ অশ্রুজলে তাঁহার পূজা করুন। নবাব খাঁ বাহাদুরের কার্য্যকুশলতা, উৎসাহ এবং তেজস্বিতা সকলেরই অনুকরণীয়।

কুকুরের অভ্যর্থনা।

"এ দিক পানে কে গা তুমি আস্‌চো ধীরে ধীরে।
যত্ন বিনা শীর্ণ দেহ, ভাস্‌চো নয়ন-নীরে!
কাঁপ্‌চো শীতে, বৃষ্টি-জলে ভিজে গেছে কায়,
মুখ দেখে হয় দুখটি বড়, বুকটি ফেটে যায়।
ক্ষুধায় কাতর দেখচি তোমায়, খাও-না কিছু এসে,
গরম হবে,—বস্‌বে এস আমার গা-টি ঘেঁসে!"

"আমি যে—দয়ায় তোমার হলেম কেনা
দয়াল কুকুররাজ,
ক্ষুধায় কাতর, তাই এসেছি
তোমার দ্বারে আজ!
প্রভুর আমার কেউ নাই আর,
গেছেন তিনি ম'রে,
তার কাছে যাই, যে ডাকে ভাই
যেথায় "আয়্ তু" ক'রে।

কিন্তু ঘূরে এমন ক'রে পেট ভরে না আর,
যেই খানে যাই ভাত মাছ নাই খাড়ার চিবড়ে সার!
আবার বালাই, এতেও আসে পাঁচটা কুকুর তেড়ে,
কাজেই ছুটি লেজ গুটিয়ে সখের খানা ছেড়ে।
মরবো—তবু ছুট্‌ব না আর "আয় তু" শুনে, ভাই,
কুকুর ব'লে আমার কি আর মান অপমান নাই?"
"ভেব না ভাই, দুঃখের নিশি হবেই হবে ভোর,
আজ্‌কার দিন হতে তুমি বন্ধু হ'লে মোর।
আমার খাবার এলে দোঁহে খা'ব মিলে তাই।
দুই জনেতে থাক্‌ব যেন আমরা দুটী ভাই॥
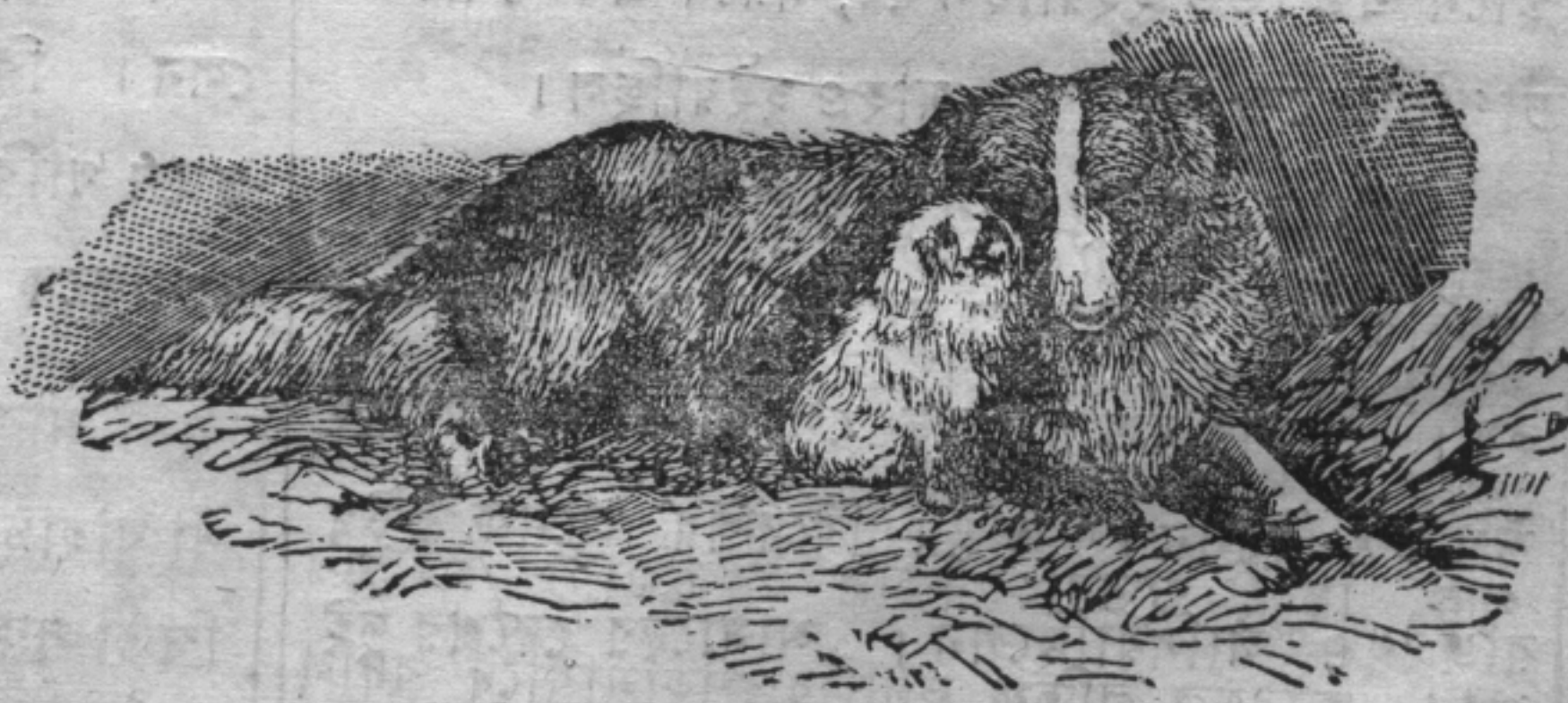
রাজদম্পতি।

গত ৬ই জুলাই টেক-রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া মে-র সহিত আমাদের মহারাণীর পৌত্র ইয়র্কের ডিউক্ রাজকুমার জর্জের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। মহারাণী ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ এলবার্টের রাজত্ব শেষ হইলে রাজকুমার জর্জ আমাদের রাজা হইবেন। ইহাঁদের বিবাহদিনের ত কথাই নাই, বিবাহের পূর্ব্বের দিনও সমস্ত লণ্ডন নগর আমোদ উৎসবে পূর্ণ ছিল। বিবাহের দিন লণ্ডনের সমস্ত দোকান পাট বন্ধ ছিল। স্থানে স্থানে এত ভিড় হইয়াছিল যে, গরমে এবং লোকের চাপাচাপিতে অনেকের মোহও হইয়াছিল।

বিখ্যাত সেণ্ট্ জেম্‌স্ রাজপ্রাসাদের রাজকীয় গির্জ্জায় বেলা দ্বিপ্রহরের সময় বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। দেশের যত বড় বড় লোক প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। তদ্ভিন্ন বিদেশীয় অনেক কুটুম্ব রাজগণও আসিয়াছিলেন। আমাদের দেশের দুই এক জন রাজাও বিবাহসভায় উপস্থিত ছিলেন। বিবাহের সময় নিকটবর্ত্তী; উপস্থিত সকলে উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বরপক্ষীয়দের আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। অবশেষে বরের আগমনসূচক ভেরীধ্বনি হইল। বাদ্যযন্ত্র সব বাজিয়া উঠিল। প্রথমে মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রবেশ করিলেন। সিংহাসনে বসিয়া তিনি হাতের উপর মাথা রাখিয়া কিয়ৎকাল মনে মনে ইষ্টদেবের উপাসনা করিলেন। তাহার পর পিতা যুবরাজ এবং পিতৃব্য এডিনবরার ডিউকের সঙ্গে বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলের শেষে সখিগণের সহিত রাজকুমারী মে-কে লইয়া তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা আসিলেন। সকলে আসিলে রাজপুরোহিত পবিত্রভাবে বিবাহকার্য্য সমাধা করিয়া নবদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন রাজকুমার নববিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে পিতামহীকে অভিবাদন করিলেন। মহারাণীও সস্নেহে পৌত্র ও পৌত্রবধূকে চুম্বন এবং আলিঙ্গন করিলেন। তার পর তাঁহারা পিতা মাতা ও অন্যান্য গুরুজনদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারাও বরকন্যাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

বিবাহ শেষ হইলে, সকলে বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে আসিলেন। সেখানে অতি সমারোহের সহিত ভোজ হইল। তাহার পর সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া রাজকুমার ও রাজকুমারী মার্ল্‌বরো হাউস নামক রাজপ্রাসাদে প্রস্থান করিলেন। বিবাহের পর কিছু দিন তাঁহাদের সেইস্থানে থাকিবার কথা। পরমেশ্বর আমাদের রাজদম্পতিকে সুখী ও দীর্ঘজীবী করুন।

বালকের রচনা।

(ফুলের সাজি।)

পারস্য দেশে এক জন দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। একদা তাঁহার একটী শিষ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কি ক'রে এত জ্ঞান উপার্জ্জন করিলেন?" পণ্ডিত উত্তর করিলেন "যখন যাহা বুঝিতে পারি নাই, তখন তাহা অপরের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছি। লজ্জা আমাকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। এই উপায়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছি।"

এক জন অত্যাচারী রাজা কোন এক ধার্ম্মিককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম কি?" ধার্ম্মিক উত্তর করিলেন "তোমার জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম দিবানিদ্রা; কারণ, তুমি যতটুকু সময় নিদ্রা যাইবে, ততটুকু সময় প্রজাগণ নিশ্চিন্ত থাকিবে।"

একদা কোন এক স্থানে একজন পক্ককেশ বৃদ্ধ তালগাছ রোপণ করিতেছিল। একটী পথিক, বৃদ্ধকে তালগাছ রোপিতে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল "ওহে বৃদ্ধ, তালগাছ রোপণ করিয়া তোমার কি হইবে? তোমার ত আর তাল খাওয়ার প্রত্যাশা নাই?" বৃদ্ধ এই কথা শুনিয়া মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিতে লাগিল "ভাই হে, ঐ যে ফলশালী বৃক্ষ দেখিতেছ, উহা কেহ রোপণ করিয়া গিয়াছিল বলিয়াই ত আমরা তাহা ভোগ করিয়া আজও রসনা তৃপ্ত করিতেছি। এইরূপ আমিও এই গাছগুলি রোপণ করিয়া যাইতেছি, উত্তরকালে আমাদিগের সন্তান সন্ততিগণ উহাদের ফলভোগ করিয়া, আমাদের নাম করিবে এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে।"

(শ্রীনলিনীভূষণ দত্ত, ঢাকা।)

(ফুল-সাজ।)

প্রভাত হইল নিশি, বন উপবনে
বিহঙ্গ গাইছে গান হরষিত মনে।
করিয়া মধুর ধ্বনি গুণ্ গুণ্ স্বরে,
ফুলে ফুলে মধুকর মধুপান করে।
আনন্দে পবন বহে মন্দ মন্দ গতি,
শাখা নেড়ে শাখিগণ জানাইছে প্রীতি।
হেন কালে দুটী বো'ন দরজা খুলিয়ে,
ধাইল উদ্যান পানে ফুল-সাজি নিয়ে।
মনের মতন ফুল করি আহরণ,
রাখিল ভরিয়া সাজি করিয়া যতন।
তখন দুজনে মিলি বসি বৃক্ষতলে,
গাঁথিল ফুলের মালা অতি কুতূহলে।
অবশেষে দোঁহে মালা করি পরিধান,
পরস্পরে নিরখিয়া প্রফুল্ল বয়ান।
"দেখ লো ভগিনি আজ"—কহে পরস্পরে।
"এ মালার তুলা নাই ভুবন ভিতরে;
এ ফুল সৃজন যেই করিলা ধরায়,
কোটি কোটি নমস্কার করি তাঁর পায়।"
বলিতে বলিতে দোঁহে হাতে লয়ে সাজি,
গেলা চলি নিজ গৃহে ফুল-সাজে সাজি।
দেখিলে প্রীতির বস্তু, ওহে শিশুগণ,
প্রীতিদাতা পরমেশে করিও স্মরণ।

(শ্রীরমণীলাল মৈত্র, রঙ্গপুর।)

ধাঁধা।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

১। স।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ জুন মাসের ধাঁধার ঠিক উত্তর দিয়াছেন।

শ্রীবিমলাচরণ সেন, কলিকাতা; শ্রীত্রিপুরাচরণ সেন, কলিকাতা; শ্রীমতী তরলাসুন্দরী, কলিকাতা; শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষাল, ভাগলপুর; শ্রীমতী হেমপ্রভা দত্ত, কালীঘাট; শ্রীমতী মৃণালিণী রায়, কালীঘাট; শ্রীমতী সরোজিনী গুপ্তা, রাণীগঞ্জ; শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, কালীঘাট; শ্রীগণেন্দ্রনাথ মিত্র, কলিকাতা; শ্রীমতী নলিনীবালা রায়, চাইবাসা; শ্রীশ্রীশচন্দ্র সেন,রাণীগঞ্জ; শ্রীনীরদকুমার ঘোষ, নড়াইল; শ্রীমতী প্রতিভা-সুন্দরী মিত্র, বাসুয়াড়ি; শ্রীবসন্তকুমার পাল, কালীগঞ্জ; শ্রীক্ষেত্রনাথ চৌধুরী, দাতুন; শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রঙ্গপুর; শ্রীমতী প্রভাবতী রায়, মুঙ্গের; শ্রীঅমৃতলাল রায়, মাণিকদহ; শ্রীহীরালাল রায়, বরিশাল; শ্রীহীরালাল পাল, মহম্মদপুর; শ্রীবিনয়ভূষণ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা; শ্রীসরোজ নাথ ঘোষ, বেলতলা; শ্রীঅমলানন্দ নাগ, হাঁসাড়া; শ্রীমতী সুরবালা দেবী, কটক; শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা ঘোষ, কলিকাতা; শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভাগলপুর; শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চৌধুরী, কলিকাতা; শ্রীহরিশ্চন্দ্র দাসগুপ্ত, মেদিনীপুর; শ্রীমতী চারু-বালা দেবী, বোদা; শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, গৌহাটী; শ্রীহরি-হর শেঠ,চন্দননগর; শ্রীবিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, ছাপ্পার-মুখ; শ্রীমতিলাল সেন, ছাপ্পারমুখ; শ্রীশরচ্চন্দ্র নন্দী, নোহাট্টা; শ্রীমতী সৌদামিনী চক্রবর্ত্তী, বাঘের; শ্রীরেবতী-কান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, আগড়তলা; শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন, গৌহাটী; শ্রীরমণীলাল মৈত্র, রঙ্গপুর; শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরী, ধানসারীমুখ; শ্রীরজনীমোহন সরকার, টেপা তারামোহন স্কুল; শ্রীমুকুন্দলাল কুণ্ডু, কলিকাতা; শ্রীহরনাথ বসু, কলি-কাতা; শ্রীবিশ্বেশ্বর বসু, বনগ্রামস্কুল; শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, করিমগঞ্জ; শ্রীহারাধন মুখোপাধ্যায়, হালিসহর; শ্রীবিভুরঞ্জন দাস, চট্টগ্রাম; শ্রীমহম্মদ সাহেদালী, জালালপুর; শ্রীমতী মৃণালিণী মুখোপাধ্যায়, বহরমপুর; শ্রীসুধীরচন্দ্র সান্ন্যাল, পাবনা; শ্রীমোহিনীমোহন রায়, ময়মনসিংহ; শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত, বরাহনগর; শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী, রামনগর; শ্রীমতী শৈলবালা রায়, দিনাজপুর; শ্রীঅখিলনাথ বসু, কলিকাতা; শ্রীএককড়ি দে, চুঁচুঁড়া; শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ, ঢাকা; শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সিংহ, ভান্ডাড়া; শ্রীমতী কুমুদিনী দেবী ও শ্রীমতী মৃণালিণী দেবী, হালিসহর; শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, কালিয়া; শ্রীতুলসীন্দ্রনাথ মিত্র, কোন্নগর; কুমারী হিরণবালা দত্ত, তেজপুর; শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বসু, নর্থব্রুক স্কুল; শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র, কলিকাতা।

নূতন ধাঁধা।

১। চতুস্পদ জন্তু আমি, তিন বর্ণে নাম।
ত্যজিলে প্রথম বর্ণ বুঝায় সংগ্রাম॥
মধ্য ত্যাগে অস্ত্র মধ্যে করয়ে গণন।
শেষ ত্যাগে সপ্তাহেতে করি বিচরণ॥
(শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র, কলিকাতা।)

২। ত্র্যক্ষরে আমার নাম জানে সর্ব্বজন।
উদরের মধ্যে আমি রাখি নরগণ॥
ছেদন করিলে পরে মস্তক আমার।
রাশি রাশি পশু পা'বে উদর মাঝার॥
চরণ কাটিয়া দেখ নয়ন মেলিয়া।
পেটে যে কি নাই, তাহা না পাবে খুঁজিয়া॥
(শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাস গুপ্ত, বড় কালিয়া।)

৩। জীব জন্তু নহে সেই ধাতুময় কায়।
আপনি না জানে কিছু পরকে জানায়।
হস্ত পদ নাই, কিন্তু দিবানিশি চলে।
কি হেন পদার্থ বল আছে ভূমণ্ডলে॥
(শ্রীহরিহর শেঠ, চন্দননগর।)।

সখা
একাদশ ভাগ। ৮ম সংখ্যা।

আগষ্ট, ১৮৯৩।

বিবিধ।

কদভ্যাস।—হাতের নখ কামড়ান রোগ অনেক বালকেরই আছে। অভ্যাসটা কিন্তু ভাল নয়। ইহাতে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং ইহা স্নায়বিক দুর্ব্বলতার এক প্রধান কারণ।

*
* *

জাতীয় মহাসমিতি।—জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন এবার লাহোরে হইবে। বিলাতী মহাসভার সভ্য শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরজি দেশে আসিয়া ইহার সভাপতির কার্য্য করিবেন।

*
* *

বিপদজনক খেলা।—হাবড়া জেলায় বেলুড়ে একটি ছেলে একটা ভীমরুলের চাকে ডেলা মারে। ভীমরুলগুলা রাগিয়া একটি বালিকাকে কামড়ায়; ইহাতেই বালিকাটির মৃত্যু হইয়াছে! বালকদিগের এরূপ খেলা বড়ই দূষণীয়। দেখিয়া শিক্ষা লাভ করা উচিত।

*
* *

আপেল ফল।—জর্ম্মন্ রাসায়নিক পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, আপেল ফলে যে পরিমাণ ফস্‌ফরাস আছে, আর কোন ফলেই তত নাই। তাঁহারা বলেন, এই ফল নিয়মিতরূপে খাইতে পারিলে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা দূর হয়, যকৃতের ক্রিয়া ভাল হয়, এবং মস্তিষ্ক বৃদ্ধি পায়।

*
* *

বিজ্ঞান-বুদ্ধি।—উষ্ণ বাতাসে শস্যের হানি হয়, এজন্য আমেরিকায় একটি কোম্পানি গঠিত হইয়াছে, এই কোম্পানির সভ্যেরা বিজ্ঞান-বুদ্ধিতে গ্রীষ্মের সময়ও শস্যরক্ষার জন্য উত্তরাঞ্চল হইতে শীতল বাতাস বহাইয়া ছাড়িবেন। আমাদের দেশের লোকে কিন্তু ইহা শুনিলে হাসিবে। ধন্য বিজ্ঞান-বুদ্ধি!

*
* *

অদ্ভুত রান্না।—আমাদের দেশের লোকে জানে কাঠ পোড়াইয়াই রান্না হয়, আর রান্না হয়—কয়লার জ্বালে। বিলাতে কিন্তু গ্যাসের জ্বালে রান্নার পরীক্ষা অনেক দিন হইয়া গিয়াছে, এখন তাড়িত দিয়া রান্নার পরীক্ষা চলিয়াছে। ইহাতে রান্নাও বেশ হইতেছে, হাঁড়িতেও কালী ধরে না।

আমার সাধের তরি।
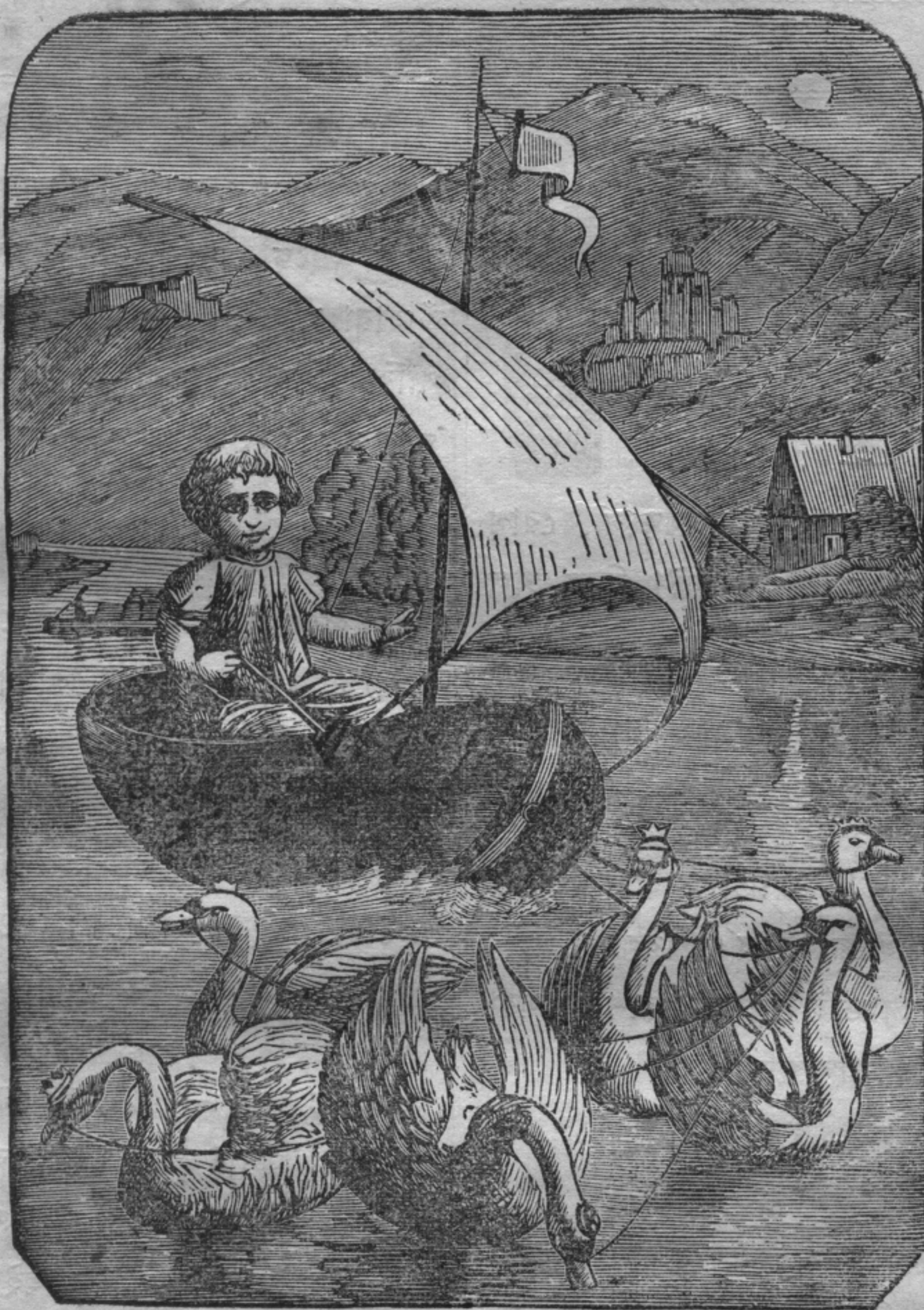
(১)

ওগো তোরা দেখ্‌বি যদি
হেথায় ছুটে আয়,
আমার সাধের তরি মনের সাধে
পবন-বেগে ধায়!

ছুট্‌ছে নদী বেগে যত
আমার ছয়টি মাঝি ছুট্‌ছে তত,
আবার বইছে হাওয়া মনের মত
মৃদুল মধুর তায়;

তোরা দেখ্‌বি কে গো আজ্‌কে সবাই
হেথায় ছুটে আয়।

(২)

আজ নীল আকাশে জ্যোছ্‌না মেখে
ভাস্‌ছে পাখী সব,
আমার সাধের তরির হরষ হেরে
মুখে মধুর রব;
ও সেই মন-মাতানো মোহন গীতে
মাঝিরা মোর উঠ্‌লো মেতে,
আমি চল্‌নু ছুটে বিদেশ পানে
দেখ্‌বি কে গো আয়,
আমার সাধের তরি মনের সাধে
পবন-বেগে ধায়।

(৩)

কে জানে কোন্‌ কঙ্কাবতী
চড়ে' সোনার যানে,
একবার "মন-পবনে" ছুটেছিল
পরী দেশের পানে;
আজ আমার তরি "মন-পবনে"
চল্‌বে উড়ে পাখীর সনে,
তোরা আন্‌তে যাবি তারার মালা
আমার সাথে আয়,
চেয়ে দেখ নীল আকাশে চাঁদ্‌নি হাসে,
নীল জলে তার কিরণ ভাসে,
আমি চাঁদ্‌নি, তারা গড়েছে যে
আস্‌বো দেখে তায়;
তোরা কে কে যাবি, আমার তরি
চাঁদের দেশে যায়।

বালিকার গৃহিণীপনা।

ইংলণ্ডের উত্তরভাগে, গ্রাস্‌মিয়ার নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে, জর্জ্জ্‌ ও সারা গ্রীন নামে এক দরিদ্র কৃষকদম্পতি বাস করিত। লক্ষ্মীর বিরাগ সত্ত্বেও হৃদয়ের সৌন্দর্য্যগুণে ইহারা সকলেরই বিশেষ প্রীতিভাজন ছিল।

এতৎপ্রদেশে প্রায় প্রতি মাসেই কোনও না কোনও স্থলে, নিত্য প্রয়োজনীয় পুরাতন গৃহ-সামগ্রী সকল নিলামে বিক্রয় হইয়া থাকে। আমাদের কৃষকদম্পতি এইরূপ একটা মেলায় উপস্থিত হইবার নিমিত্ত খ্রীঃ ১৮০৭ অব্দের এক প্রভাতে উভয়েই যাত্রা করিল। তখন শীতকাল, পথ সকল বরফে আবৃত। কিন্তু কুয়াসার তেমন অন্ধকার না থাকায় ইহাদের বিশেষ কোনও ক্লেশ হইল না। কৃষকগৃহিণীর আজিকার মেলায় যাইবার একটু বিশেষ উদ্দেশ্যও ছিল। তাঁহার একটি নয় বছরের কন্যা ছিল; কোন ভদ্র গৃহস্থ তাহাকে চাকরাণী রাখিয়া, কাজকর্ম্ম শিখাইয়া, কিছু কিছু বেতন দিলে তাহার ভবিষ্যতের ভাবনা আর ভাবিতে হয় না। কিন্তু জননী দুহিতার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। অবশেষে মেলা ভাঙ্গিবার সময় হইয়া আসিল। তখন রাত্রি হইয়াছে। ঝড়বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। দুজনে যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই ফিরিয়া যাইতে চাহিলে, অনেকেই তাহাতে আপত্তি করিল। কিন্তু এ বিষয়ে তখন তাঁহাদিগকে জিদ্‌ই বা করে কে? সকলেই ঘরে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত। জর্জ্জ্‌ ও সারা সেই সোজা পার্ব্বত্য পথই ধরিলেন। তাহার পর

তাঁহারা যে কোথায় গেলেন—কি হইল—কেহই জানিল না। গভীর রাত্রে, গিরিপুঞ্জের অভ্যন্তরে চীৎকার-ধ্বনি শুনিয়া, কেহ কেহ কিছু আশঙ্কা করিয়াছিল; আবার কেহ বা উহাকে প্রমোদমত্ত ব্যক্তিবৃন্দের কলরবের প্রতিধ্বনি বলিয়া উড়াইয়া দিল।

এ দিকে ছয়টি ছোট ছোট বালকবালিকা গৃহমধ্যস্থিত আগুনের পার্শ্বে বসিয়া, সাগ্রহে পিতামাতার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। সাতটা হইতে রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত কাটিয়া গেল। মা ত আসিলেন না, বাবারও দেখা নাই! অবশেষে সর্ব্বজ্যেষ্ঠা বালিকা—তাহারও বয়স নয় বর্ষ মাত্র—ভাইভগ্নীগুলিকে বিছানায় গিয়া ঘুমাইতে বলিল। বড় দিদির কথায় সকলে গেল বটে, কিন্তু দিদির মুখের ভাব দেখিয়া শিশুদের সরল প্রাণও যেন অকস্মাৎ কাঁদিয়া উঠিল।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া, পর দিন প্রভাত পর্য্যন্ত বরফ পড়িয়া শিশুদিগকে এক প্রকার কারারুদ্ধ করিয়া ফেলিল। কাহারও কাছে যাইয়া যে খবর দিবে, সে উপায়ও রহিল না। বালিকা আগ্‌নেস্ ভাবিল, তাঁহারা রাত্রে ঝড় বৃষ্টির জন্য আসিতে পারেন নাই, সকাল হইয়াছে, এইবার আসিবেন। কিন্তু প্রভাত যে অতীত হইয়া গেল, আবার সন্ধ্যা আসিল, বালিকা আর আশা করিতে সাহসী হইল না। সে কিছুই জানিত না কিছুই বুঝিত না; আজ যেন সকলই বুঝিতে পারিল। কে জানে কোন্ অজ্ঞাত, বিচিত্র বিধি-বশে সে আজ সহসা একজন গৃহিণী হইয়া বসিল; ভাইভগিনীগুলিকে জাতীয় ধর্ম্মের প্রথানুসারে নতজানু করাইয়া সে প্রথমতঃ তাহাদের দৈনিক প্রার্থনাবচন বলাইল। তার পর বালিকা আগ্‌নেস্ অবস্থানুযায়ী গৃহকার্য্যে মন দিল।

বালিকা ভাবিল, কতকাল এইরূপ বরফের মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে, তাহার ত স্থিরতা নাই। তাই সে সর্ব্বাগ্রে সময়-নিরূপণের নিমিত্ত ঘড়িটায় দম দিয়া রাখিল। তৎপরে যে দুধটুকু ছিল, তাহা যাহাতে টকিয়া খারাপ না হয়, তাহার উপায় করিল। যে ময়দাগুলি ঘরে ছিল, তাহার কিয়দংশ লইয়া কয়েকখানি রুটি প্রস্তুত করিল। তোমাদের মধ্যে নয় বছরের বালিকা ত অনেকেই আছ, একবার এই নয় বছরের বালিকা আগ্‌নেসের বুদ্ধির কথা শুন। পাছে বরফরাশি হইতে উদ্ধার হইবার পূর্ব্বেই খাদ্যগুলি সমস্ত ফুরাইয়া যায়, এই ভয়ে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট দুইটি শিশু ব্যতীত, সে সকলেরই খাবার কিছু কিছু কম করিয়া দিল। পুনর্ব্বার বরফ পড়িলে হয় ত ঘরের দরজা পর্য্যন্ত খুলিতে পারিবে না, এই ভয়ে, দুইটি ভাইকে সঙ্গে লইয়া, দুই চারিখানি করিয়া এক সপ্তাহের উপযোগী কাঠ বহিয়া আনিয়া ঘরের ভিতর রাখিল। বাহিরে এক জায়গায় গোটাকতক গোল আলু চাপা দেওয়া ছিল; আগুনের গরমে পচিয়া যাইবার ভয়ে নূতন গৃহিণী সে গুলিকে গৃহমধ্যে আনিল না।

এইরূপে জীবনধারণের এক প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া, সে ঘরের গোরুটির দুধ দুহিয়া আনিল। গোরুটি ভাল খাইতে পায় নাই, সুতরাং দুধ বেশী হইল না। গোরুর জন্য শুকান ঘাস মাচার উপর তোলা ছিল; বালিকা অনেক কষ্টে দুই চারি আঁটি সংগ্রহ করিয়া, সেদিনকার মত গোরুটিকে একটি বেশ গরম জায়গায় আনিয়া বাঁধিল। অতঃপর খিল কপাট যত্নপূর্ব্বক বন্ধ করিয়া, আগ্‌নেস্ ছোট শিশু দুইটির কাপড় ছাড়াইয়া, তাহাদিগকে দোলায় দোলাইয়া, ধীরে ধীরে ঘুম পাড়াইল। অপর কয়টিকে পার্শ্বে লইয়া প্রায় মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত

জাগিয়া রহিল। কিন্তু কেহই ত তাহাদের খবর লইতে আসিল না। বালিকা ভাঙ্গা জানালাগুলি ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিল; বরফ ও ঝড় বাতাস ভিতরে আসিলে, তাহাদের আর বাঁচিবার উপায় থাকিবে না।

রাত্রি প্রভাত হইল। লোকের সাড়াটিও পাওয়া যায় না। তুষার-পতন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আগ্‌নেস্ তাহার পরিবারস্থ শিশুদিগকে কোনও রূপে আশ্বস্ত রাখিয়া, দ্বিতীয় দিবসও কাটাইল। তৃতীয় কি চতুর্থ দিবসে একটু আশার সঞ্চার হইল। রাত্রির বাতাসে বরফরাশি এক-ধারে সরিয়া পড়িয়াছিল। একটা অনুচ্চ প্রাচীরের উপর দিয়া বাহিরে যাইতে পারা যায় দেখিয়া, বালিকা, ভাই দুটিকে সঙ্গে লইয়া, বহু আয়াসে পথ পরিষ্কার করিয়া পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে আসিয়া পঁহুছিল। সেখান হইতে দুই ভাইকে শিশুদের কাছে ফিরিয়া যাইতে বলিয়া, নিকটবর্ত্তী এক গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া তাঁহাদের আনন্দ প্রকাশের অবকাশ ছিল না; তাহার মুখে উপস্থিত বিপদের কাহিনী শুনিয়া সকলেরই প্রাণ চমকিয়া উঠিল। সংবাদ মুহূর্ত্তমধ্যে চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল, মেলার দিবস জর্জ্জ্ ও তাহার পত্নী সারার কোনও খবরই পাওয়া যায় নাই! তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া উপত্যকাবাসিগণ দলে দলে, পর্ব্বতের উপর বরফরাশির মধ্যে, তাহাদের অন্বেষণে বহির্গত হইল।

তিন চারি দিন কোনও সন্ধানই মিলিল না। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। কিন্তু অন্বেষণকারিগণের উৎসাহ কমিল না। যাহারা মজুরি করিয়া খাইত, তাহারাও নিঃস্বার্থভাবে দিনের পর দিন এইরূপে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে, তীক্ষ্ণঘ্রাণশক্তিসম্পন্ন কুক্কুরগণের সাহায্যে, আকাশভেদী এক গিরিশৃঙ্গের উপরিভাগে ও তলদেশে, হতভাগ্য দম্পতির মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইল। জর্জ্জ্ সেই পর্ব্বতচূড়া হইতে নীচে পড়িয়া গিয়াছিল। সারার মৃতদেহ পাহাড়ের উপরেই বরফে জমিয়া রহিয়াছে। তাহার শীতনিবারণের জন্য জর্জ্জ্ নিজের লম্বা ওভার-কোটটি খুলিয়া দিয়াছিল, উহা অভাগিনীর গায়েই জড়ান রহিয়াছে। বোধ হয়, সারাকে এইখানে রাখিয়া, কোন্ মুখে যাইতে হইবে, জর্জ্জ্ তাহারই সন্ধান করিতে গিয়াছিল। কিন্তু বেশী দূর যাইতে না যাইতেই ঝড়ের বেগে অন্ধকারে পড়িয়া গিয়া প্রাণ হারাইয়াছে। রাত্রিকালে লোকে যে অস্ফুট চীৎকারধ্বনি শুনিয়াছিল, তাহা এই হতভাগিনী রমণীরই করুণ বিলাপধ্বনি!

ইহার পর কৃষকদম্পতির সমাধি অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। বালকবালিকাগুলি সকলেই এক একটি ভদ্রসংসারে আশ্রয় পাইল। শিশুগুলির ভবিষ্যতের সাহায্যার্থ অনেকে আগ্রহ সহকারে চাঁদা দিতে লাগিলেন। আগ্‌নেসের বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা তৃতীয় জর্জ্জের মহিষী ও তাঁহার কন্যাগণ, বিশেষ ব্যথিত হইয়া, আগ্রহের সহিত আগ্‌নেসের নিমিত্ত অর্থসাহায্য পাঠাইলেন।

পারস্যভাষায় একটি সুন্দর গল্প আছে। গভীর সমুদ্রগর্ভে শুক্তিমধ্যস্থিত এক বারিবিন্দু আপনার নির্জ্জন কারাবাস ও দুঃখের কথা স্মরণ করিয়া বড়ই বিলাপ করিতেছিল। কিছু দিন যাইতে না যাইতে সে দেখিতে পাইল, তাহার শরীর ক্রমশঃ সুগোল, ও সুদৃঢ় হইয়া আসিতেছে। অবশেষে একদিন কে তাহাকে শুক্তি সমেত তুলিয়া লইয়া, তাহার কারাগার ভেদ করিয়া, তাহাকে মুক্ত করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ দেখিতে পাইল, সে রাজাধিরাজ শাহান্

শাহ পারস্যাধিপতির মস্তকের উপর মুক্তামালার মধ্যস্থলে শোভা পাইতেছে! আমাদের আগ্নেসের অবস্থাও কি ঠিক সেইরূপ নহে? নবমবর্ষীয়া বালিকা যখন দরিদ্র কৃষিব্যবসায়ীর কুটীরে নির্জ্জনে সামান্য ভাবে বাস করিত, তখন ত কেহই তাহাকে জানিত না। কিন্তু কার্য্যের গুণে সে গ্রেটব্রিটনের মহারাণীরও মনে স্থান লাভ করিয়াছিল। ঘোরতর বিপদে পড়িয়াও সে সাধারণ বালিকাসুলভ আশঙ্কায় আকুল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে নাই। বালিকা আপনার হৃদয়নিহিত শক্তিগুলিকে মুহূর্ত্তমধ্যে কেমন বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিল! ভরসা করি আগ্নেস্ তোমাদের হৃদয়মন্দিরে দেবীর ন্যায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া, চিরদিন তোমাদিগকে আত্মনির্ভরতা ও কর্ত্তব্যের পথে পরিচালিত করিবে।

সার সালার জঙ্গ।

ভারতবর্ষের রাজা ইংরেজ। ইহার মধ্যে কতকগুলি দেশের শাসনকার্য্য একেবারে ইংরেজদের হাতে,—যেমন আমাদের এই বাঙ্গালা দেশ। আবার এমন কতকগুলি দেশও আছে যেখানে আমাদের দেশীয় হিন্দু বা মুসলমান রাজারা রাজত্ব করেন, কিন্তু ইঁহারাও একেবারে স্বাধীন নন। ইংরেজরাজকে ইঁহারা আপনাদের উপরে কর্ত্তা বলিয়া মানেন, তাঁহাকে কর দেন এবং ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের মত লইয়া আপনাদের রাজকার্য্যাদি নির্ব্বাহ করেন। এই রাজ্যগুলিকে করদ ও মিত্ররাজ্য বলে। হায়দ্রাবাদ একটী প্রধান মুসলমান করদ রাজ্য। এখানকার মুসলমান রাজাকে নিজাম বলে। সার সালার জঙ্গ এই রাজ্যের প্রধান রাজমন্ত্রী ছিলেন। খৃঃ ১৮৩৪ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৫৩ সালে ১৯ বৎসর মাত্র বয়সে ইনি বৃহৎ নিজাম রাজ্যের মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হন, এবং সেই সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অতিশয় দক্ষতার সহিত এই কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

যুবাই বল আর বালকই বল, একটী ১৯ বৎসরের ছেলের হাতে রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান কার্য্যের

ভার পড়িল। যদি রাজ্যের অবস্থা ভাল ও রাজকার্য্যের খুব ভাল বন্দোবস্ত থাকে, তাহা হইলেও এত অল্প বয়সে এত বড় একটা রাজ্যের কায চালান খুব কঠিন। কিন্তু সার সালার জঙ্গ যখন প্রথম মন্ত্রী হইলেন, নিজাম রাজ্যের তখন বড়ই দুরবস্থা। রাজকার্য্যের শৃঙ্খলা কিছুই ছিল না বলিলেও হয়। চারিদিকে নানা প্রকার গোলযোগে রাজ্যটি একেবারে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছিল। কিন্তু এ সকল সত্বেও তিনি এক দিনের জন্যও বিচলিত হন নাই, বরং সমস্ত বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া ধীর ও প্রশান্তভাবে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া চলিলেন। তাঁহার শাসনগুণে স্বল্প দিনেই রাজ্যের সর্ব্বত্র সুনিয়ম স্থাপিত হইল এবং ক্রমেই রাজ্যের সবিশেষ উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল।

বেরার প্রদেশটি হায়দ্রাবাদের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান। যে বৎসর সালার জঙ্গ মন্ত্রী হন, সেই বৎসর ইংরেজেরা বেরার আত্মসাৎ করেন। তখন একটা কিছু সুবিধা পাইলেই প্রজারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী পর্য্যন্ত হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু রাজ্যের যেরূপ অবস্থা তাহাতে যুদ্ধ করিলে সম্পূর্ণ অসুবিধারই সম্ভাবনা, এজন্য সালার জঙ্গ আপনার রাজনৈতিক বিচক্ষণতার বলে সে সমস্ত নিবারণ করিয়া রাখিলেন। সালার জঙ্গ দেখিলেন রাজকোষে টাকাকড়ি মোটেই নাই, অথচ কর আদায়ের কোন প্রকার সুবিধামত বন্দোবস্তও নাই। তখন রাজস্বের সুবিধা করিবার জন্য মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু তখন কর সংগ্রহের চেষ্টা করিলে সুবিধা হইবে না দেখিয়া আপাততঃ সমস্ত রাজকর্ম্মচারিগণের বেতন কমাইয়া ফেলিলেন; আপনাকেও অবশ্য বাদ দিলেন না। তার পর শান্তিরক্ষার জন্য পুলিসের কার্য্যপ্রণালীর উত্তম বন্দোবস্ত করিলেন। দুর্দ্দান্ত কলহপ্রিয় আরব এবং রোহিলারা আসিয়া রাজ্যমধ্যে যত গোলযোগের সূত্রপাত করিত, এজন্য তাহাদের আগমন একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। চারি বৎসরের মধ্যেই রাজ্যের অবস্থা অনেকটা ভাল হইয়া উঠিল, বাণিজ্যাদি বেশ চলিতে লাগিল, রীতিমত রাজস্ব আদায় হইতে লাগিল, উপদ্রবাদি অনেক কমিয়া গেল, এবং প্রজারা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল।

কিন্তু এক গোলযোগ ভাল করিয়া মিটিতে না মিটিতে সালার জঙ্গ আর একটি মহাসঙ্কটে পড়িলেন। এই সময় ভারতে সিপাহি-বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। হায়দ্রাবাদের প্রজাগণ ইতিপূর্ব্বেই ইংরেজের উপর চটিয়াছিল, এখন প্রতিশোধ লইবার জন্য বিদ্রোহে যোগ দিতে উৎসুক হইয়া উঠিল। বিপদের উপর বিপদ—এই সময় আবার নিজামের মৃত্যু হইল। এমন অবস্থায় রাজ্য কিছু দিন নেতৃহীন হইয়া থাকিলে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হইবে, তাহা সালার জঙ্গ সহজেই বুঝিতে পারিলেন, এবং নিজামের মৃত্যু হইবামাত্র কালবিলম্ব না করিয়া মৃত নিজামের পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া অতি কষ্টে হায়দ্রাবাদকে বিদ্রোহের চেষ্টা হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার ক্ষতি যথেষ্ট হইল—প্রজাদের নিকট ভক্তি শ্রদ্ধা তিনি একেবারে হারাইলেন।

অবশেষে বিদ্রোহ থামিয়া গেলে তিনি দেশের উন্নতি সাধনের দিকে আবার মনোযোগ করিলেন। তাঁহার সুশাসনের গুণে এবং প্রজাহিতকর কার্য্যে দেশের লোকের সর্ব্বপ্রকার সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। অথচ যে রাজভাণ্ডারে একদিন টাকার জন্য হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল, সেই রাজভাণ্ডারই টাকায় ভরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে

সালার জঙ্গের খ্যাতি প্রতিপত্তিও আবার বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। ইংরেজ গবর্ণমেন্টের নিকটও তাঁহার আদরের সীমা রহিল না।

মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র যখন এ দেশে আইসেন, সালার জঙ্গ তখন তাঁহার নিকট বিশেষ সম্মান পাইয়াছিলেন। ইহার পর যখন তিনি বিলাত যান, তখন ইউরোপবাসীদের নিকট রাজা রাজড়ার-মত আদর অভ্যর্থনা পাইয়াছিলেন। সালার জঙ্গ বেশ দীর্ঘকায় পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মুখশ্রী প্রশান্ত ছিল, এবং দেখিলেই বোধ হইত যেন উহা চিন্তাশীলতায় পূর্ণ। তিনি পরিষ্কাররূপে ইংরেজি বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। তাঁহার বেশভূষার আড়ম্বর মোটেই ছিল না। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। পরিশ্রম করিবার শক্তিও তাঁহার অসাধারণ ছিল এবং এত কার্য্যের মধ্যেও তাঁহার পড়া শুনাটি একদিনের জন্যও বাদ যাইত না। তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ এই দেখা যায় যে, তিনি যেটি কর্ত্তব্য মনে করিতেন, শত সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি উপস্থিত হইলেও তাহা হইতে বিচলিত হইতেন না। খৃঃ ১৮৮৩ অব্দে ৪৯ বৎসর বয়সে বিসূচিকা রোগে ইঁহার মৃত্যু হয়—ভারতাকাশ হইতে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়ে।

সূয্যি মামার দেশ।

(১০৪ পৃষ্ঠার পর।)
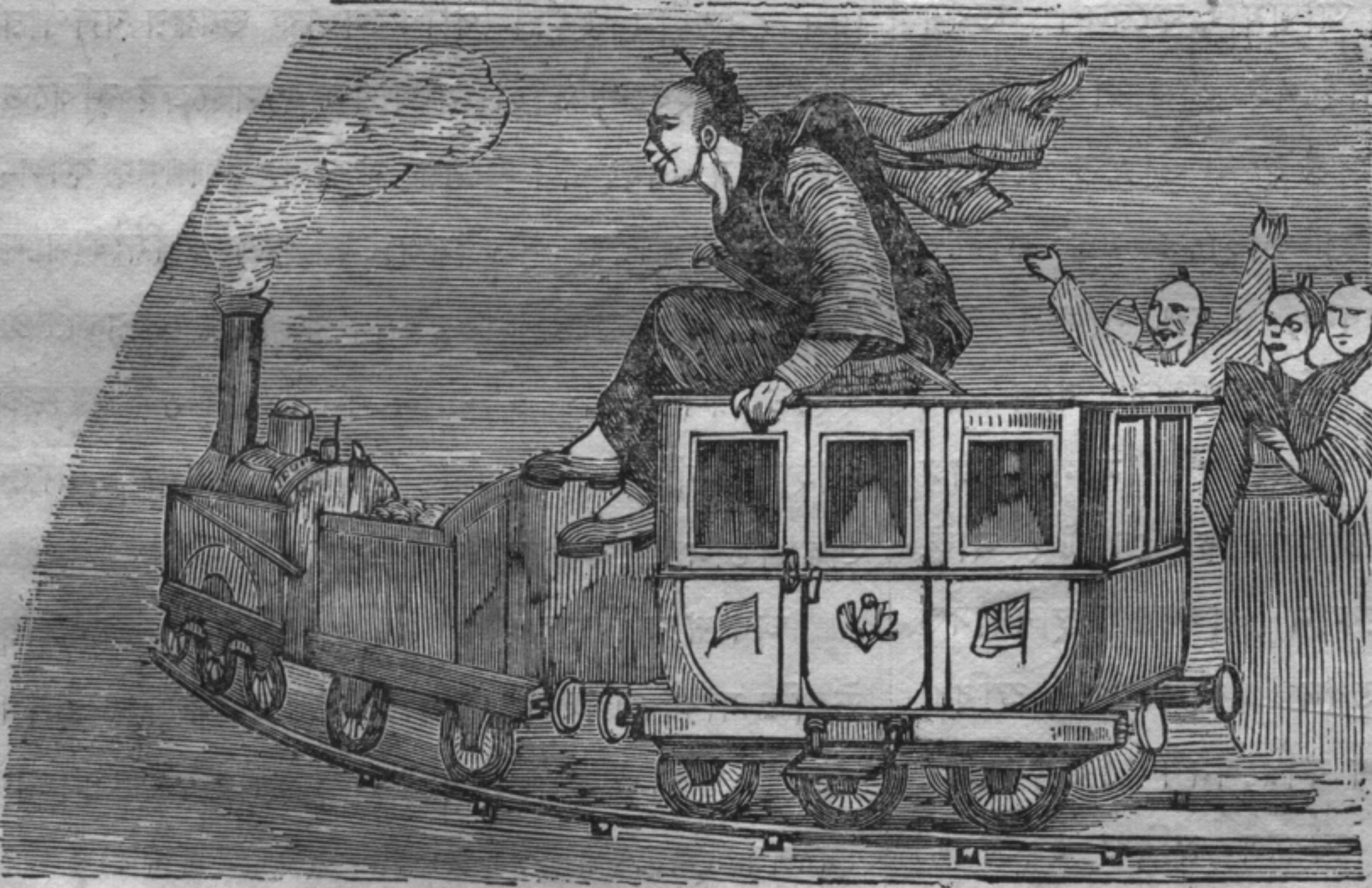
তোমরা বোধ হয় শুনিয়াছ, আর্য্যেরা হিন্দুকুশ পর্ব্বত হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং এখানকার আদিম অসভ্য অধিবাসী-দিগকে জঙ্গলে পর্ব্বতে তাড়াইয়া দিয়া দেশ অধিকার করিয়া বসেন। সূয্যি মামার দেশেও, আদিম অধিবাসীদিগকে জাপানের পূর্ব্ব-উত্তর কোণে তাড়াইয়া দিয়া, জাপানিরা দেশের সর্ব্বে-সর্ব্বা হন। এখানকার আদিম অধিবাসী-দিগকে "আইনো" বলে। পৃথিবীতে ইহাদের ন্যায় রোমশ জাতি আর নাই।

মধ্য এসিয়া হইতে কতকগুলি আর্য্য দক্ষিণ ও

পশ্চিমে যাইয়া দেশ জয় করিয়া বাস করিতে থাকেন, এবং কতকগুলি মঙ্গোলিয়ান উত্তর-পূর্ব্ব দিকে যাইয়া জাপান অধিকার করেন। জাপানীয়-দিগকে দেখিতে মোগলদিগের মত। ইহাদের শরীরের রং পীতাভ, চুল কাল, শ্মশ্রু অল্প এবং গণ্ডদেশের উপরকার হাড় উচু। আমাদের দেশে ছয় মাসের পূর্ব্বে ছেলে মেয়ের নামকরণ হয় না, কিন্তু সুয্যি মামার দেশে সাত দিনের ছেলের নামকরণ হয়। ত্রিশ দিন হইলেই শিশুদের মাথার চুল কামাইয়া ফেলা হয় এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মস্তকের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের চুল ভিন্ন ভিন্ন বৎসরে কামাইয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। পনর বৎসর পর্য্যন্ত এই প্রকার চলে। তোমাদের অনেকেরই "হাতে খড়ি" পাঁচ বৎসরে হইয়াছে। কিন্তু সুয্যি মামার দেশে ছেলেরা ষষ্ঠ বৎসরের ষষ্ঠ মাসের ষষ্ঠ দিবসে প্রথম স্কুলে যায়। শিক্ষক মহাশয় শিশুকে একটী অক্ষর কাগজে লিখিয়া দেন, বালক সেইটী ভাল করিয়া শিখে; তাহার পর আর একটী লিখিয়া দেন; সেইটী শিখিলে, আর একটী দেন; এই প্রকারে শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়।

জাপানিদের ভাষায় পৃথক পৃথক অক্ষর যোজনা করিয়া শব্দ হয় না। অধিকাংশ শব্দ চীনেদের ভাষা হইতে গৃহীত। এক একটী অক্ষরে এক একটী শব্দ। সুয্যি মামার দেশের বালক বালিকারা সাধারণতঃ ছয় বৎসরে এক হাজার অক্ষর শিখিতে পারে। উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে খুব ভাল ছেলেরা ঐ সময়ের মধ্যে কখন কখন দশ হাজার অক্ষর শিখিয়া থাকে। পূর্ব্বে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-মন্দিরে বালকেরা লেখা পড়া শিক্ষা করিত। খ্রিঃ ১৮৫৬ অব্দে, যখন ভারতবর্ষে সিপাহীদিগের বিদ্রোহে ইংরাজ-রাজত্ব টলমল করিতেছিল, তখন জাপানে প্রথম কালেজ স্থাপিত হয়। জাপানের সম্রাট্ ইংলণ্ড, জর্ম্মনি ও আমেরিকা হইতে এই কালেজের জন্য শিক্ষক আনয়ন করেন। সেই সময় হইতে এখানে শিক্ষা-কার্য্য উত্তমরূপে চলিতেছে। খ্রিঃ ১৮৮৮ অব্দ পর্য্যন্ত জাপানে ২৭৯২৩টী স্কুল কালেজ স্থাপিত হইয়াছে। জাপানি বালকেরা সাধারণতঃ শিষ্ট শান্ত এবং ধী-শক্তি-সম্পন্ন। এখানকার বালক বালিকারা ক্রীড়া কৌতুকে খুব মজবুত। কিন্তু তাহাদের একটা বড়ই দুর্নাম আছে। তাহারা শিক্ষকদের অপেক্ষা আপনদিগকে বেশী বুদ্ধিমান মনে করে। শিক্ষক হয় ত ইতিহাস পড়াইতেছেন, তখন একটী ছেলে বলিয়া উঠিল, "আমরা ইতিহাস পড়িতে চাই না। বেলুন কি প্রকারে তৈয়ার হয়, আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া বলুন।" তোমা-দের মধ্যে কেহ এই দলের আছ কি? ছেলেদের এরূপ অশিষ্টতা বড়ই দোষের কথা, তাহা কি আবার বলিয়া দিতে হইবে? তবে ইহা দেখিয়াই তোমরা স্থির করিও না যে ইহাদের বিদ্যাশিক্ষাও তথৈব চ। সুয্যি মামার দেশের ছেলে দলে দলে ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং জর্ম্মনি প্রভৃতি দেশে গিয়া শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া স্বদেশের প্রভূত উন্নতি সাধন করিতেছে। খ্রিঃ ১৮৭৪ অব্দে এখানে প্রথম রেলওয়ে লাইন খোলা হয়। ইহার পূর্ব্বে সাধারণ লোকে রেলওয়ের বিষয় কিছুই জানিত না, সুতরাং যেদিন প্রথম রেলওয়ের গাড়ী ছাড়িয়াছিল, সেদিন কত লোক উহা দেখিয়া থ হইয়া গিয়াছিল। উহা ভূত বা দৈত্যের কাজ বলিয়াই অনেকের ধারণা হইয়াছিল—বাষ্প বলিয়া একটী জিনিসের যে এত বড় ক্ষমতা আছে, প্রথমে তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই। (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার ছবি দেখ।)

তোমরা জান বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষা বাম দিক হইতে আরম্ভ করিয়া সরল রেখায় ডান দিকে লিখিতে হয়। কিন্তু আরবি, পারসি

প্রভৃতি কতকগুলি ভাষা ঠিক ইহার বিপরীত—ডান দিক হইতে আরম্ভ করিয়া বাম দিকে লিখিতে হয়। জাপানিদের ভাষা আবার অন্য রকম, ডান দিক হইতে নীচের দিকে লম্বভাবে লিখিত হয়। উপরের জাপানি লেখা দেখিলে ইহার কতকটা আভাস পাইবে। আমাদের বই যেখান হইতে আরম্ভ হয়, সুয্যিমামার দেশের লোকের বই সেখানে শেষ হয়।

স্মাইল্‌স্ সাহেব প্রণীত গ্রন্থগুলি অতি উপাদেয়। এই গ্রন্থের মধ্যে Self Help জাপানি ভাষায় অনুবাদিত হইয়া স্কুলে পড়ান হইয়া থাকে।

মৃত আত্মীয় বান্ধবের জন্য শোক প্রকাশার্থ জাপানিরা অনেক দিন পর্য্যন্ত নিরামিষ আহার ও শোক-পরিচ্ছদ পরিধান করে। পিতা মাতার মৃত্যুতে ইহারা তের মাস ধরিয়া শোক-পরিচ্ছদ পরিধান করে ও পঞ্চাশ দিন নিরামিষাহার করে। দুর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের মৃত্যুতেও অনেক দিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকে। শাদা কাপড় ইহাদের মধ্যে শোক-পরিচ্ছদ।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, সাহেবদের দেশের মত এ দেশেও জাতি ভেদ প্রথা প্রচলিত নাই। কিন্তু তা নয়। সুয্যি মামার দেশে জাতিভেদ প্রথা বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে অপবিত্র বোধে স্পর্শ করেন না।

জাপান সম্রাটকে "মিকাডো" বলে। তিনি অমাত্যগণের সাহায্যে রাজ্যশাসন করেন। বর্ত্তমান মিকাডো অনেকগুলি পুরাতন কুসংস্কার বিদূরিত করিয়াছেন। ইঁহার সময়ে দেশের অনেক উন্নতি হইয়াছে। এখানে ক্রমে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী অবলম্বিত হইতেছে। জাপানবাসীরা অধিকাংশ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী।

দাদা মশায়।

ও হো হো দাদা মশাই,
কাঁধে তোমার কে ?—
মণ্টু বুঝি বায়না করে'
ঘোড়ায় চড়েছে ?

আ মুখ্যু ! নেবে এসো
দোলায় খাবে দোল,
তোমার কেন ঘোড়ায় চড়া—
কাঁদ্‌চে মায়ের কোল।

বসে' সেথা, সোনা-মুখের
দাও একটি চুম,
ঢোল এনেছে বিধু, বাজাও
ডুম্ ডুম্ ডুম্—ডুম্।

নাও-না তুলে বাঁশী তোমার,
কাঁদ্‌চে পড়ে সে যে,
ফুঁ দাও তায়, উঠ্‌বে এখন
'পুঁ' করে' সে বেজে।

এত কথা বল্‌চি, তবু
নাই কো কথায় কাণ?
নিজের মনে কি,ভাব্‌চো
বসে’, হনুমান?

আমি তোমায় ভাল জানি
মণ্টু! পেটুক ধন,
দিবানিশি লাল ঝরে, আর
খাই-খাই-খাই মন।

দাদা বাবুর মাথা ধরে’
কি দেখ্‌চো চেয়ে,—
পাকা পাকা চুলগুলি কি
সব ফেল্‌বে খেয়ে?

তায় কাজ নাই, নেমে এস,
আম এনেছেন মামা,
খেতে গিয়ে দাও ভিজিয়ে
গাল মুখ আর জামা।

পুস্তকপাঠের নিয়ম।

মানুষ দুই প্রকারে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে। প্রথমতঃ মুখে বলিয়া, দ্বিতীয়তঃ লিখিয়া। যাহা মুখে বলা হয়, অল্পদিনের মধ্যেই শ্রোতা তাহা বিস্মৃত হইতে পারে, এবং তাহা হইলে সেইখানেই তাহা শেষ হইয়া যায়। কিন্তু লিখিয়া রাখিলে, উহা এত শীঘ্রই নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। যখন যে ঐ লিখিত পুস্তক পাঠ করিবে, তখনই সে লেখকের মনের ভাব অবগত হইতে পারিবে।

অতি প্রাচীন কালে পুস্তক মুদ্রিত হইত না, সকল পুস্তকই হস্তে লিখিয়া লইতে হইত। আমাদিগের দেশে ঐরূপে পুঁথি প্রভৃতি হস্তে লিখিয়া রাখিবার প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে; কিন্তু আর্য্যগণ লিখিয়া রাখা অপেক্ষা স্মরণ রাখাই অধিকতর গৌরবের কথা মনে করিতেন। তাঁহাদিগকে

অবশ্য শুনিয়া স্মরণ রাখিতে হইত। আমাদের পক্ষে বারম্বার পাঠ করিয়া স্মরণ রাখাই দুঃসাধ্য; শ্রবণ করিয়া স্মরণ রাখিতে তাঁহাদের যে কিরূপ ক্লেশ হইত, তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে। অভ্যাস দ্বারা এ কার্য্য কতকটা সহজ হইয়া আসিত বটে, কিন্তু অনেক বিষয় জানিতে ও শিখিতে হইলে, এ ব্যবস্থায় কেমন করিয়া চলে? এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, যে শ্রোতা বিস্মৃত হইলে, শ্রুত বিষয়ের চিহ্নমাত্রও বিলুপ্ত হইয়া যায়। প্রাচীন আর্য্যগণেরও তাহাই হইয়াছিল। এইরূপে তাঁহাদের অনেক উৎকৃষ্ট বিষয়ও নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা পুনঃপ্রাপ্তির আর কোনই উপায় নাই।

পূর্ব্বে যে সকল পুস্তক লিখিত হইত, তাহা লিখিবার জন্য তখন অনেক লোক ছিল। তাহারা পুস্তক লিখিয়া পারিশ্রমিক যাহা পাইত, তাহাতেই জীবিকানির্ব্বাহ করিত। কিন্তু হাতে লিখিয়া সুলভে পুস্তক যোগান সুবিধাজনক নয় বলিয়া তখন পুস্তকও এত বহুল পরিমাণে প্রচারিত ছিল না। অতি অল্প লোকের নিকটেই দুই চারি খানি পুস্তক দৃষ্ট হইত। এখন মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় জ্ঞানলাভের সুবিধা যে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু সুবিধার সহিত অসুবিধাও অনেক হইয়াছে, সমাজের উন্নতির সহিত ক্ষতিও হইয়াছে। পূর্ব্বে অধিক পুস্তক ছিল না বলিয়া লোকে একখানি পুস্তকই অতি যত্নের সহিত পাঠ করিত ও তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিত। কিন্তু এখন পুস্তকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায় এক খানি পুস্তকও লোকে তত যত্ন ও মনোযোগের সহিত পড়ে না। যাহা হউক, মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের সহিতই মানবের পাঠলালসা অনেক গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং উহা দ্বারা সমাজেরও অনেক হিতসাধন হইয়াছে।

এখন পুস্তকের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এক জনের পক্ষে সে সমস্ত পাঠ করা অসম্ভব। এই জন্য বিবেচনা করিয়া উৎকৃষ্ট পুস্তক বাছিয়া পাঠ-করাই উচিত, এবং তাহাতেই পাঠের প্রকৃত ফল লাভ হইতে পারে। ব্যস্ততার সহিত একখানি পুস্তক শেষ করিয়া আর একখানি আরম্ভ করিবার বাসনা অতিশয় ক্ষতিজনক। ঐরূপ করিলে, একখানিও ভাল করিয়া পড়া হয় না।

আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে পাঠ করিতে পারি। আমাদের উদ্দেশ্যানুসারে পাঠের ফলও ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। আমোদ অথবা ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনার জন্য পুস্তক পাঠ করা অপেক্ষা, যাহাতে প্রকৃত উন্নতি ও নীতিশিক্ষা হয়, সেইরূপ পুস্তক পাঠ করাই বিধেয়। আধুনিক অধিকাংশ উপন্যাস ও নাটকাদি, সৎশিক্ষা অপেক্ষা বিকৃত আমোদ ও উত্তেজনা প্রদানেই অধিকতর সহায়তা করে। ভাল উপন্যাস নাটকাদিতেও যে মহৎ উদ্দেশ্য থাকে, বালকদিগের তাহা বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহারা কেবল উপন্যাস বা নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগণের কথোপকথনই বুঝিতে পারে—আর কিছুই নয়। ইহাতেও অনেক সময় ভাল না হইয়া মন্দই হয়। এই জন্য অন্ততঃ পঠদ্দশায় উপন্যাসাদি পাঠ করা নিতান্ত অনুচিত। ঐ সময়ে যাহাতে পাঠ্য পুস্তক হইতে মন অন্য দিকে আকৃষ্ট না হয়, তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। মন শতধা বিচ্ছিন্ন হইলে, কোনও বিষয়ে গাঢ়রূপে আকৃষ্ট হয় না, এবং এরূপ হইলে কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হইতে পারে না।

কোনও বিশেষ ফল লাভার্থ পাঠ করিতে হইলে, কেবল যে উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ করিলেই হইল, এমন নহে। যত্নের সহিত সেই বিষয়ের উপযোগী পুস্তকই পাঠ করিতে হয়। আবার ভিন্ন ভিন্ন রকম

পুস্তক ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে পাঠ করা উচিত। গণিত-শাস্ত্রে নিপুণ হইতে হইলে, নানা প্রকার অঙ্ক অধিক সংখ্যায় কসা আবশ্যক। বিজ্ঞান শাস্ত্রাদিতে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, সর্ব্বদা পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণাদির প্রয়োজন। এইরূপ সাহিত্য ও ইতিহাসের বেলায় উহা পাঠ করিয়া নিজের কথায় উহার ভাবার্থ বা উহাকে সংক্ষেপ করিয়া লিখিলে, অধিক ফলোদয় হইতে পারে। কারণ, ঐরূপ লিখিলে যে কেবল পঠিত বিষয়গুলি স্মরণ থাকে, এমত নহে; উহা দ্বারা নিজের লিখিবার ক্ষমতাও জন্মে। প্রত্যেক পুস্তকই দুই তিন বার পাঠ করিলে ভাল হয়। প্রথম বার পাঠ করিয়া দ্বিতীয় বার পাঠ করিবার সময়, আবশ্যক বিষয়গুলি চিহ্নিত করিতে হয় এবং তৃতীয় বার পাঠের সময় ঐ চিহ্নিত অংশগুলি অধিকতর মনোনিবেশ করিয়া পড়িতে হয়। অন্ততঃ বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকাদি এই নিয়মে পাঠ করিলে অধীত বিষয়গুলি অধিকতর স্মরণ থাকিবার সম্ভব। কেবল পাঠ করিলেই যে উহা আমাদের আয়ত্ত হইল, এমত নহে। পাঠ সমাধা করিয়া পঠিত বিষয়গুলি মনে মনে চিন্তা করা উচিত, এবং কোনও স্থানে সন্দেহ থাকিলে, তাহা তৎক্ষণাৎ ভঞ্জন করা বিধেয়।

এইরূপে সকল পুস্তক দুই তিন বার পাঠ করিয়া এবং পঠিত বিষয়গুলি মনে মনে চিন্তা করিয়া লিখিয়া রাখিলে কদাচ উহা স্মৃতিচ্যুত হয় না। বিখ্যাত লেখক মেকলে বলেন,—"আমি বাল্যকালে পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া তাহার সারাংশ মনে মনে চিন্তা করিতাম। প্রথম প্রথম দুই তিন বার পাঠ না করিলে ঐরূপ পঠিত বিষয়ের সংক্ষেপ লিখিতে পারিতাম না, কিন্তু ঐ অভ্যাস আমি কখনও ত্যাগ করি নাই; যখনই যাহা পাঠ করিতাম, তখনই ঐ নিয়মের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিতাম। এখন যে পুস্তক একবার মাত্র পাঠ করি, তাহার প্রায় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মৌখিক বলিতে পারি।" অনেক বড় বড় লোকেই পুস্তক পাঠের বিষয়ে এইরূপ কথা বলিয়া গিয়াছেন।

বালকেরা এইরূপ নিয়মে পাঠাভ্যাস করিতে সহজে ইচ্ছা করে না। তাহারা মনে করে, পড়া ত তৈয়ার করিয়াছি, আবার মুখস্থ লেখালেখি প্রভৃতি হাঙ্গামা কেন? খেলিতে একটু বেশী সময় পাই, সেই ভাল; সে সময়টুকু আবার কেন পড়ায় দি? কিন্তু এটি তাহাদের বড়ই ভুল। ভাতগুলা তাড়াতাড়ি গিলিয়া ফেলিলে যেমন আপাততঃ ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু পেটে গিয়া হজম হয় না, তাড়াতাড়ি কোন রকমে পড়াটি প্রস্তুত করিয়া দিলেও, তেমনই মনের ভিতর উহার পরিপাক হয় না—শীঘ্রই ভুলিয়া যাইতে হয়। সুতরাং ঐরূপে পড়িলে, পড়ার যে মহৎ উদ্দেশ্য, তাহা সিদ্ধই হয় না। আবার, কিছুদিন যত্নের সহিত এই নিয়মে পড়া করিতে আরম্ভ করিলে, উহা এতই সহজ হইয়া আইসে, ও পড়াটিও এমন সুন্দররূপে প্রস্তুত হয়, যে তাহার কথাই নাই। আমরা আশা করি, বালকবালিকারা এই নিয়মে পড়িতে চেষ্টা করিবে; এবং তাহা হইলেই তাহারা পাঠের প্রকৃত ফললাভ করিতেও সমর্থ হইবে।

নু।

এই প্রস্তাবে যে পশুর চিত্র প্রদর্শিত হইতেছে, এই পশুর নাম নু। "নু" এক প্রকার হরিণই বটে, কিন্তু ইহাকে হরিণ বলিব, কি মহিষ বলিব, অথবা ঘোড়াই বলিব, তাহা ভাবিয়া পাই না। ইহার

হরিণের মত পা, মহিষের মত মাথা, এবং অশ্বের মত শরীর, স্কন্ধ ও পুচ্ছ। ইহারা বড় হইলে, উচ্চে প্রায় তিন হাত এবং দৈর্ঘে প্রায় ছয় হাত হইয়া থাকে। ইহাদের স্কন্ধে কেশর এবং সম্মুখের পদদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী বক্ষঃপ্রদেশে লম্বা লম্বা লোম হইয়া থাকে। "নু"র গায়ের রং কৃষ্ণমিশ্রিত কটা। কেশর ও পুচ্ছের রং পাংশুবর্ণ, এবং সম্মুখের পদদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানের লোম কাল। ইহাদের বাস আমাদের এ দেশে নয়—আফ্রিকা দেশে। আফ্রিকাতেও ইহারা জলা জায়গায় থাকে না,—দক্ষিণ আফ্রিকার শুষ্ক মাঠে দল বাঁধিয়া বেড়ায়। এক একটা দলে চল্লিশ পঞ্চাশটা বা তদপেক্ষাও বেশি পশু থাকে। প্রত্যেক দলে স্ত্রী-পশুই বেশি পরিমাণে থাকে, পুং-পশু প্রায় পাঁচ ছয়টা বই দেখা যায় না। ইহারা স্বভাবতঃ যুদ্ধপ্রিয় নহে, কিন্তু শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ক্রুদ্ধ হইয়া আক্রমণকারীদিগের প্রতি ধাবমান হয়। তখন ইহাদের মূর্ত্তি বড়ই ভয়ঙ্কর হয়। ইহাদের চক্ষু ভীষণ ক্রোধ-প্রকাশক এবং শৃঙ্গ মহিষের শৃঙ্গের ন্যায় বক্র ও ভীষণ। আমরা পুং-জাতীয় হরিণেরই শৃঙ্গ দেখিতে পাই, স্ত্রী জাতীয় হরিণের শৃঙ্গ হয় না। ইহাদের কিন্তু তা নয়—ইহাদের স্ত্রীপুরুষ উভয় জাতিরই শৃঙ্গ হইয়া থাকে। পূর্ণবয়স্ক কেশরধারী "নু"কে দেখিয়া অনেক সময় অনেক শিকারীর সিংহ বলিয়া ভ্রম জন্মিয়াছে। আর পরিণতবয়স্ক পুং-নু যখন গর্জ্জন করে, তখন সে গর্জ্জনও সিংহনাদ অপেক্ষা বড় কম ভয়ানক নহে।

স্ত্রী-নু এককালে একটী মাত্র সন্তান প্রসব করে। প্রসব-সময়ে শাবকের শাদাটে রঙ থাকে, ক্রমশঃ রঙটি বদলাইয়া কৃষ্ণমিশ্রিত কটা হইয়া যায়।

পর্য্যটনকারী বণিকসম্প্রদায়ের সম্মুখে পড়িলে ইহারা আশ্চর্য্যভাবে তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকে, এবং লেজ নাড়িতে নাড়িতে ভেকের ন্যায় এক প্রকার কর্কশ শব্দ করে। ইহারা অত্যন্ত দ্রুতগামী। বন্দুকের আওয়াজ করিলে, ভয় পাইয়া অতি দ্রুত পলাইয়া যায়। লাল কাপড় দেখিলে কিন্তু ভালুকের মত ইহারাও রাগিয়া উঠে।

ইহাদিগকে পোষ মানাইবার জন্য লোকে বিশেষ চেষ্টা করে নাই। তবে যে কয়টি পরীক্ষা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, যত্নপূর্ব্বক পালন করিলে, ইহারা পোষ মানে।

"নু"র মধ্যে আবার অনেক প্রকার-ভেদ আছে, তন্মধ্যে তিন রকম "নু"র কথাই প্রসিদ্ধ। আসাম প্রদেশে এই জাতীয় এক পশু আছে, তাহাকে তদ্দেশে "টাকিন্" বলে। উত্তর আফ্রিকায় যে সকল নু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারাও প্রায় দক্ষিণ আফ্রিকার "নু"রই মত। তবে তাহারা দক্ষিণ আফ্রিকার "নু"র মত অত চঞ্চল নয়, অত তেজীয়ান্‌ও নয়। ইহাদের মাংস আফ্রিকার লোকেরা সুস্বাদু বোধে প্রীতির সহিত ভক্ষণ করিয়া থাকে।

আদর।

দোল্ দোল্ দোল্—দোল্।

১

খোকন সোণা চাঁদের কণা একরত্তি ছেলে,
চায় না কিছু সোণার যাদু মায়ের সোহাগ পেলে।
উষার নীহার-নীরের মত বিমল সরল প্রাণ,
কাছে এলে হাতটি তুলে আহ্লাদে আটখান্।
আধ আধ "ইলি বিলি" মন-ভুলান ভাষা,
একটুখানি প্রাণের মাঝে কতই ভালবাসা।
আয় তবে আয় মাণিক আমার দিলেম্ পেতে কোল,
খোকন সোণা চাঁদের কণা
দোল্ দোল্ দোল্—দোল্।

২

ছোট ছোট মুখখানি তোর ফোট ফোট ফুল,
ওঠ ওঠ দাঁত দুটি তায় হীরার সমতুল।
চুলগুলি সব আলু থালু দুল্‌ছে কেমন ধারা,
কিরণ-মাখা নয়ন দুটি কোন্ গগনের তারা?
নাদুস নুদুস দেহখানি যেন সোণার ঘট,
ওর কাছেতে কোথায় আছে চিত্রকরের পট!
দিবানিশি হাসি খুসি নাইকো কোন গোল,
খোকন সোণা চাঁদের কণা
দোল্ দোল্ দোল্—দোল।

৩

চাঁদের হাসি অধর কোলে ভুবন করে আলো,
নিজের মতন হাসি-মাখা চাঁদকে বাসে ভালো।
ধীরে ধীরে ফিরে ফিরে চাঁদের পানে চায়,
হাতটি তুলে হেলে দুলে চাঁদকে বলে "আয়"।
দেখ্‌লে পরে প্রজাপতি খেলা ধূলো ভুলে,
চুপটি ক'রে বসে থাকে নয়ন দু'টি মেলে।
চুমো পেলে মাণিক ছেলে হর্ষে উতরোল,
খোকন সোণা চাঁদের কণা
দোল্ দোল্ দোল্—দোল্।

৪

"ঘুম-পাড়ানী মাসির" গানে মুদে আঁখির পাত,
ঘুমিয়ে পড়ে ধীরে ধীরে সোণার পারিজাত।
ঘুমের ঘোরে স্বপন্ দেখে কেমন কাঁদে হাসে,
দেবলোকের কথা বুঝি যাদুর মনে আসে!
"দুধ-পাশরা" এ ধন পেলেম কোন্ দেবতার বরে,
প্রাণ জুড়া'ল অভাগিনীর হেরে নয়ন ভ'রে।
কাণ জুড়া'ল শুনে বাছার "মা—মা" মধুর বোল,
খোকন সোণা চাঁদের কণা
দোল দোল্ দোল্—দোল্।

শ্রীমতী হেমপ্রভা দত্ত, কালীঘাট।

পত্রপ্রেরকদের প্রতি।

শ্রীতুলসীন্দ্রনাথ মিত্র, কোন্নগর, লিখিয়াছেন ঃ—"জুলাই মাসের সখায় প্রকাশিত ৩য় ধাঁধাটি —নামক পুস্তকের ১৮ পৃষ্ঠার ৪র্থ প্রশ্ন। প্রেরকের উক্ত ধাঁধাটি উদ্ধৃত বলিয়া বা উদ্ধৃত চিহ্ন দিয়াও প্রকাশ করা কর্ত্তব্য ছিল।" পত্রপ্রেরকের কথা সত্য। বালকদের এরূপ ব্যবহার দূষণীয়।

ধাঁধা।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

১। বারণ।

২। ভবন।

৩। ঘড়ি।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ জুলাই মাসের তিনটি ধাঁধারই ঠিক উত্তর দিয়াছেন ঃ—

শ্রীসুধীরচন্দ্র সান্যাল, পাবনা; শ্রীশরচ্চন্দ্র সেন, কালিয়া; শ্রীভোলানাথ কুণ্ডু, গিরিধি; শ্রীমতী নলিনীবালা রায়, চাইবাসা; শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রঙ্গপুর; শ্রীমতী সরলাবালা দেবী, বেগুসরাই; শ্রীললিতকুমার সেন, ঢাকা; শ্রীরসিককুমার রায়, বোয়ালিয়া; শ্রীশ্রীশচন্দ্র গুপ্ত, হুগলি; শ্রীসৈয়দ জান মিঞা, টেপা তারামোহন স্কুল; শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভাগলপুর; শ্রীরামদয়াল নন্দী, মঙ্গলকোট; শ্রীগণেন্দ্রনাথ দাস, মহিষাদল; শ্রীমতী মোক্ষদাসুন্দরী দেবী, যশাই; শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বসু, ঢাকা; শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ভাগলপুর; শ্রীসুশীলকুমার নাগ, কলিকাতা; শ্রীমতিলাল সেন, ছাপ্‌পারমুখ; শ্রীমতী জ্ঞানদাসুন্দরী চৌধুরী, কুকুটিয়া; শ্রীআব্দুল কাদের, গণ্ডামারা পাঠশালা; শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভাগলপুর; শ্রীঅখিলনাথ বসু, কলিকাতা; শ্রীএককড়ি দে, চুচুড়া; শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ছাপ্‌পারমুখ; শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস, কোন্নগর; শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, কালীঘাট; শ্রীসরোজনাথ ঘোষ, বেলতলা; শ্রীযাদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীহট্ট; শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, করিমগঞ্জ; শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চৌধুরী, কলিকাতা; শ্রীফকিরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, নারিট; শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নারিট; শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, নারিট; শ্রীশৈলবালা দাস, মাগুরা; শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাঁচি; শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন, গৌহাটি; শ্রীনীতীন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত, কালীগঞ্জ; শ্রীমতী সরোজিনী গুপ্তা, রাণীগঞ্জ; শ্রীঅনন্তকুমার সেন গুপ্ত, বরিশাল; শ্রীশ্রীশচন্দ্র সেন, রাণীগঞ্জ; শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়, ভাগলপুর; শ্রীপ্রসাদপ্রিয় বসু, কোন্নগর; শ্রীগিরিজাভূষণ বসাক, কলিকাতা; শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, ভবানীপুর; শ্রীদিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা; শ্রীপুরেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা; শ্রীমেহের উদ্দিন আহম্মদ, নওখিলা; শ্রীমতী ছালেমন্নেছা খাতুন, মালতীনগর; শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, ফরিদপুর; শ্রীকালাচাঁদ দত্ত, কাসিয়াডাঙ্গা; শ্রীকনকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ফকিরহাট।

নূতন ধাঁধা।

১। "ক খ" প'ড়ে যাও, তায় আছি অনুক্ষণ,
আমাদের রাজা হন বিষ্ণুর বাহন।
বায়ু মাঝে নিরন্তর দিতেছি সাঁতার,
বল দেখি, শিশু, শুনি কি নাম আমার?

শ্রীশচীশচন্দ্র গুপ্ত, করিমগঞ্জ স্কুল।

২। ত্র্যক্ষরে আমার নাম, কশ্যপ-তনয়,
সকলের ছোট, তবু লোকে বড় কয়।
আদি বর্ণ ত্যাগে মোর অর্থ হয় হিয়া,
দ্বিতীয় ত্যাগেতে দেশ দিই ভাসাইয়া।
তৃতীয় ত্যাগেতে হই বিরূপ সবায়,
দাও ত কি নাম মোর বলিয়া আমায়।

শ্রীক্ষেত্রনাথ দাস গুপ্ত, কালিয়া।

৩। হিমালয় মাঝে আমি থাকি সর্ব্বক্ষণ,
বিমানে মায়ায় আমি করি বিচরণ।
তোমা ছাড়া নই, তাই তোমাতেও থাকি,
তুমিও আমাতে ছিলে, ভুলেছ তা না কি?
যদি না ভুলিয়া থাক ওরে যাদুমণি,
কে আমি বল ত, বাছা তুষ্ট হই শুনি।

শ্রীউমেশচন্দ্র চাক্‌লাদার, ময়মনসিংহ।

সখা।
একাদশ ভাগ। ৯ম সংখ্যা।

সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩।

বিবিধ।
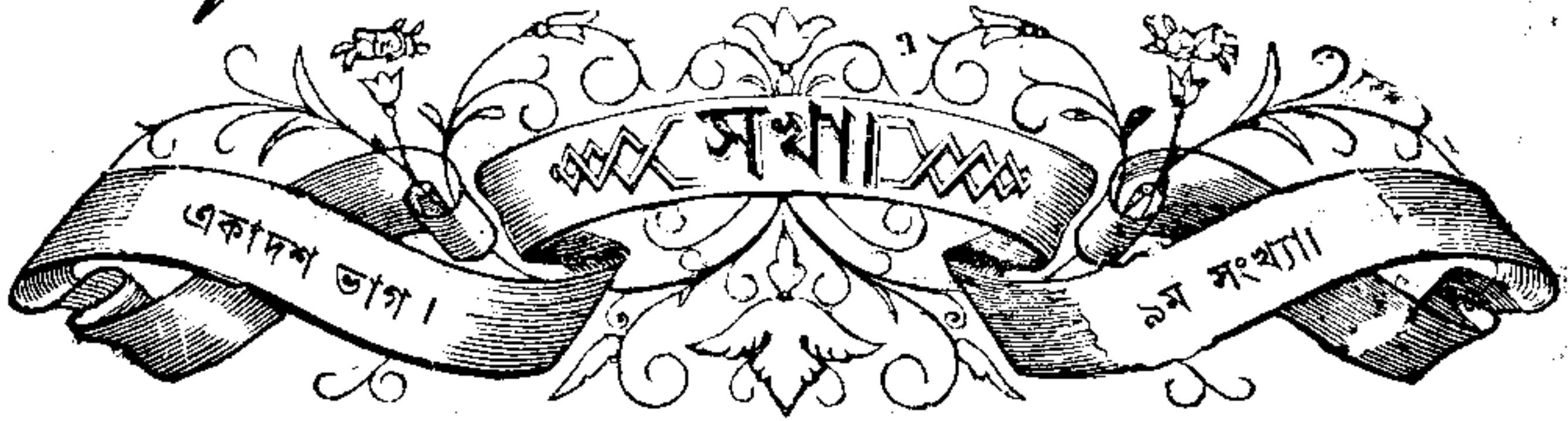
বালক-শিক্ষা।—বরদা-রাজ গুইকুমার স্বীয় রাজ্যের বালক বালিকাগণকে সরকারী খরচে লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করিতেছেন।

*
* *

সদ্গ্রন্থের আদর।—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের এক খানি ইংরাজি ইতিহাস লিখিয়াছেন। ইহা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

*
* *

স্মরণার্থ সভা।—গত ২৭এ সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর দিন উপলক্ষে সিটি-কলেজ গৃহে এক সভা হইয়া গিয়াছে। হাইকোর্টের জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

*
* *

জ্ঞানশিক্ষায় যত্ন।—ইংলণ্ডের যুবরাজ প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্‌স্ প্রতিদিন ৭০ খানা দেশী বিদেশী দৈনিক, সাপ্তাহিক ও সাময়িক পত্রিকার ভাল ভাল প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া থাকেন। খাইবার সংস্থান থাকিলে, লেখাপড়া করা কিন্তু আমাদের দেশে গালাগালি।

*
* *

সাধু উদ্দেশ্য।—ফিরোজপুরের বিখ্যাত সওদাগর লালা বনওয়ারি লাল দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দিবার একটি স্কুল স্থাপনের জন্য বিশ হাজার টাকা উইল করিয়া গিয়াছেন। দিল্লীতে না কি শীঘ্রই এরূপ একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। দাতার উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়।

*
* *

বড় লাটের পদ।—আমাদের বর্ত্তমান বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউন আগামী শীত ঋতুতে বিলাত যাই-বেন। তাঁহার পদে সার হেন্‌রি নরম্যান মনোনীত হইয়াছিলেন। ইনি খ্রিঃ ১৮৫৬ অব্দেরও পূর্ব্বে কলি-কাতায় সামান্য কেরাণীর কাজ করিতেন। সামান্য কেরাণীর পক্ষে বড় লাট হওয়া আকাশ-কুসুম। কিন্তু এ হেন বড় পদ পাইয়াও তিনি স্বচ্ছন্দে ইহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। মানুষ আপনার চেষ্টায় কি হইতে পারে দেখ। ইনি এক্ষণে অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্স্‌ল্যাণ্ডের গবর্ণর।

স্বর্গীয় কাশীনাথ ত্র্যম্বক তৈলঙ্গ।

বালক বালিকাগণ! তোমরা বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ বিচারপতি কাশীনাথ ত্র্যম্বক তৈলঙ্গের নাম শুনিয়াছ কি? সেই কাশীনাথ ১৭ই ভাদ্র শুক্রবার অপরাহ্ণ ২॥ টার সময় আত্মীয় স্বজনগণকে কাঁদাইয়া, ভারতবাসীকে শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া, ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন। কাশীনাথ অসাধারণ প্রতিভাশালী ও চরিত্রবান্ পুরুষ ছিলেন। তাঁহাকে হারাইয়া সমগ্র ভারত-বাসী একটি রত্নহারা হইলেন। যে দিন তাঁহার মৃত্যু হয়, সেই দিন বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় গভর্ণর লর্ড হারিস্ বাহাদুর বলিয়াছেন,—"মাননীয় বিচারপতি মিঃ তৈলঙ্গের মৃত্যুতে বোম্বাই হাইকোর্ট ও শিক্ষা-বিভাগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল। তাঁহার স্বদেশবাসিগণ তাঁহার জন্য যেমন শোকাকুল, গভর্ণমেণ্টও তাঁহার জন্য সেইরূপ শোকাকুল হইয়াছেন।" এরূপ সৌভাগ্য অতি অল্প লোকের অদৃষ্টেই ঘটিয়া থাকে।

কাশীনাথ খৃঃ ১৮৫০ অব্দে বোম্বাই নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বাবুজী রামচন্দ্র বোম্বাই নগরে একটি সওদাগরি আফিসে কেরাণী ছিলেন। থানা ইঁহাদের আদি বাসস্থান, কর্ম্মোপলক্ষে বোম্বাই নগরে আসিয়া বাস করেন।

কাশীনাথের বয়স যখন সাড়ে চারি বৎসর, তখন তাঁহার পিতৃব্য রামচন্দ্র ত্র্যম্বক নিজে নিঃসন্তান বলিয়া কাশীনাথকে দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ করেন।

অমরচাঁদ-ওয়াদী-স্কুলে শৈশবশিক্ষা সমাপন করিয়া কাশীনাথ খৃঃ ১৮৫৯ অব্দে, ৯ বৎসর বয়সে এলফিন্‌ষ্টোন্ স্কুলে ইংরাজি শিক্ষার জন্য প্রেরিত হন। বাল্যকাল হইতেই লেখা পড়ায় তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। অল্পকালের মধ্যেই তিনি একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। মানসিক গুণে তিনি যেমন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, শারীরিক বলেও তেমনই ন্যূন ছিলেন না। ব্যায়ামক্রীড়ায় তাঁহার বিলক্ষণ নৈপুণ্য ও আনন্দ ছিল। খৃঃ ১৮৬৪ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কাশীনাথ এলফিন্‌ষ্টোন্ কলেজে প্রবেশ করেন। তথায় উপযুক্ত অধ্যাপকগণের সাহায্যে, এবং নিজ অসাধারণ প্রতিভাবলে কাশীনাথ ঐ কলেজের অনেকগুলি পুরস্কার ও বৃত্তি লাভ করেন। ইহার দুই বৎসর পরে ইনি এফ্ এ এবং ইহারই পর বৎসর বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বি, এ পরীক্ষা দিয়াই কাশীনাথ কয়েক মাসের জন্য এলফিন্‌ষ্টোন্ কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের কার্য্য করেন। কাশীনাথের জ্ঞানতৃষ্ণা অতিশয় বলবতী ছিল। তিনি কলেজের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকগুলি অধ্যয়ন করিয়া কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন না। অবসর মত কলেজের লাইব্রেরি হইতে নানাবিধ পুস্তক লইয়া পাঠ করিতেন। এই পুস্তকালয়ে এমন কোন নূতন কিম্বা ভাল পুস্তকই ছিল না, যাহা কাশীনাথ বিশেষরূপে অধ্যয়ন করেন নাই। বি এ পরীক্ষায় প্রস্তুত হইবার সময় কাশীনাথ পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র ও অর্থনীতিশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু কলেজের তেমন পড়ায় তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। এজন্য কলেজ ছাড়িয়া সেই সকল পুনরায় অতি যত্ন পূর্ব্বক অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। মনোবিজ্ঞান ও ধর্ম্মবিজ্ঞানেও তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ও অনুরাগ ছিল। খৃঃ ১৮৬৮ অব্দে কাশীনাথ এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময় তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ইংরাজিতে অনুবাদিত করেন। এরূপ চমৎকার ইংরাজি কবিতায় গীতার অনুবাদ করিয়াছেন যে, ইহা একজন বিদেশীয়ের লেখনী-প্রসূত ভাবিয়া অনেক ইংরাজ পণ্ডিতও বিস্মিত হন।

ইংরাজির ন্যায় সংস্কৃতেও কাশীনাথ একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। খৃঃ ১৮৬৯ অব্দে ইনি "ভগবান দাস ও পুরুষোত্তম দাস" নামক সংস্কৃত বৃত্তি লাভ করেন, এবং এল, এল, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বোম্বাই হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। তাহার পর কাশীনাথ খৃঃ ১৮৭২ অব্দে এড্‌ভোকেট্‌দিগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময় হইতেই ইঁহার রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ হয়। সকল প্রকার সভা সমিতিতে তিনি হৃদয়ের সহিত যোগদান করিতেন। তাঁহার বক্তৃতাশক্তিও অসাধারণ ছিল। ইনি জাতীয় মহাসমিতির একজন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ছিলেন।

সংস্কৃতভাষার ন্যায় সংস্কৃত শাস্ত্রেও গভীর জ্ঞান থাকায় কাশীনাথ অচিরকাল মধ্যেই হিন্দু আইন সম্বন্ধে একজন সুনিপুণ ব্যবহারবিৎ বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। একটি জটিল মোকদ্দমায় হিন্দু আইন

সম্বন্ধে ইনি এরূপ গভীর গবেষণাপূর্ণ তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলেন যে, তাহাতেই মাননীয় প্রধান বিচারপতি সার মাইকেল ওয়েষ্ট্রপ্ মহোদয় ব্যবহারশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হন। প্রধান বিচারপতি মহোদয় প্রায়ই বলিতেন, "এমন একদিন আসিবে যখন এই যুবক কাশীনাথ বিচারাসন শোভিত করিবেন।"

খ্রিঃ ১৮৭৭ অব্দে কাশীনাথ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলারের পদেও বরিত হন। খ্রিঃ ১৮৮২ অব্দে শিক্ষা-কমিশনের সভ্য নিয়োজিত হইয়া, নিজের স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ছয় মাস কাল কষ্ট স্বীকার করিয়া মফঃসলে অবস্থিতি করেন। এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট ইঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া, সম্মান প্রদর্শনার্থ ইঁহাকে সি, আই, ই উপাধি প্রদান করেন। খ্রিঃ ১৮৮৪ অব্দে বোম্বাইয়ের তৎকালীন গবর্ণর সার জেম্স্ ফার্গুশন্ মহোদয় ইঁহাকে তত্রত্য ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত করেন।

খ্রিঃ ১৮৮৯ অব্দে প্রধান বিচারপতি সার মাইকেল ওয়েষ্ট্রপের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়। বোম্বাই হাইকোর্টের অন্যতম জজ্ নানা ভাই হরিদাসের মৃত্যু হইলে কাশীনাথ বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতির আসনে আসীন হন। ইঁহাকে বিচারপতির আসনে উপবিষ্ট দেখিয়া কি স্বদেশী কি বিদেশী সকল লোকেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

অনবসরের মধ্যেও অবসর করিয়া লইয়া, সংস্কৃত সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধে ইংরাজি ও মহারাষ্ট্রীয়াদি ভাষায় ইনি এতগুলি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যে অদম্য অধ্যবসায়, অসীম কার্য্যানুরাগ, অসাধারণ পরিশ্রম ও অমানুষিক চরিত্রবলে কাশীনাথ সকলের বরণীয় হইয়া সম্মানের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, উহা সকলেরই অনুকরণীয়। তিনি মৃত হইয়াও অমর, তাঁহার সুনাম তাঁহাকে চিরকাল জীবিত রাখিবে।

পিতার ভবিষ্যৎ বাণী।

(১০২ পৃষ্ঠার পর।)

(৫)

ইহার কিছুদিন পর হইতে বিদ্যালয়ের বালকেরা তাহার একটি ভয়ানক পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইল। এত দিন জিম্ সকলের সঙ্গে না মিশিলেও, খাইবার সময় একসঙ্গে বসিয়া খাইত। এখন তাহাও ছাড়িয়া দিল। তাহার খাদ্য নিজের ক্ষুদ্র কামরাটিতে লইয়া যাইত, পরে দ্বার বন্ধ করিত। বালকেরা ইহাতে তাহার উপর বড়ই রাগান্বিত হইল। কেহ তাহার নাম রাখিল "পেচকরাজ", আর কেহ বা তাহার নাম দিল "ভূত বালক।" কিন্তু তাহারা জিম্‌কে তাহার সাক্ষাতে সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারিত না; কারণ জিমের তেজস্বিতাকে সকলেই ভয় করিত।

আরও দিন গেল। বালকেরা জিমের আরও একটি কাণ্ড দেখিয়া ঘৃণায় ম্রিয়মাণ হইল। তাহারা দেখিল, জিম্ কেবল তাহার নিজের খাদ্য ঘরে লইয়া গিয়া খায়, তাহা নহে। সকলের খাওয়া হইলে

পাতে যে ভুক্তাবশিষ্ট থাকে, তাহাও লইয়া যায়। বালকেরা কাণাকাণি করিতে লাগিল। কেহ বলিল—"এটাকে ভূতে পাইয়াছে," আবার কেহ বা মৃদু হাস্য করিয়া বলিল—"ভিখারীর ছেলে কি না, আর কত ভাল হবে!" কোন কোন তেজীয়ান্ প্রভু বলিলেন—"একদিন মার লাগাও, সব ঠিক হইয়া যাইবে।" কিন্তু সে কার্য্যে কাহারও সাহস হইল না।

অবশেষে ঠিক হইল, এ সব নিয়া জিম্ কি করে একদিন লুকাইয়া দেখিতে হইবে। হ্যারি নামক একটি চতুর বালকের উপর অনুসন্ধানের ভার পড়িল। হ্যারি, জিমের অলক্ষ্যে তাহার ঘরের দরজায় একটি ছিদ্র করিয়া রাখিল। পরে জিম্ তাহার নিজের খাদ্য ও বালকগণের ভুক্তাবশিষ্ট লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলে, হ্যারি আড়ি পাতিয়া দেখিতে লাগিল। জিম্ প্রথম নিজের খাদ্য একটি বাক্সে রাখিল, পরে পাত্রে সেই উচ্ছিষ্ট দ্রব্যগুলি লইয়া খাইতে লাগিল। খাওয়া শেষ হইলে জিম্ বাক্সটি হাতে করিয়া দরজার দিকে আসিতে লাগিল। হ্যারি ইহা দেখিয়া একটু দূরে সরিয়া গেল। জিম্ বাক্সটি লইয়া ঘরের বাহিরে আসিল। আসিয়া দরজা বন্ধ করিল—এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিল জনপ্রাণীর সাড়া নাই। তখন সেই বাক্সটি লইয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া গেল। হ্যারি ঘৃণার এবং আহ্লাদের হাসি হাসিয়া মনে মনে বলিল, "আর যাবে কোথা বাবু, তোমার চালাকি ধ'রেছি—এইবার ভাল করিয়া শিক্ষা দেওয়াইব।" জিমের সর্ব্বনাশ করিবে ভাবিয়া, হ্যারির আজ এই আনন্দ! এ আনন্দ কি পৈশাচিক নহে?

(৬)

ইহার পর ছেলেরা হ্যারির নিকট সব শুনিল—তাহাদের মুখে আর হাসি ধরে না। সকলেই বলিল—"এইবার এটাকে জব্দ করা যাবে।" কিন্তু আরও অনুসন্ধান চাই। ঠিক হইল, জিম্ এই খাদ্য লইয়া কি করে দেখিবার জন্য হ্যারি পর দিন জিমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবে।

পর দিন রাত্রে হ্যারি জিমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। দেখিল জিম্ সেই বাক্স লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিল। হ্যারিও হাঁপাইতে হাঁপাইতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। এবং মনে মনে বলিতে লাগিল, বাপ্ রে, জিমটা যেন ঘোড়া।"

ক্রমে তাহারা প্রায় দুই মাইল পথ গেল। পরিশেষে জিম্ একটি ভগ্ন কুটীরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দরজায় আঘাত করিল এবং একটি বৃদ্ধা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলে তাহাতে প্রবেশ করিল। হ্যারি ভাবিল—"বুঝেছি, এই বুড়ীটাকে খাবার বেচিয়া জিম্ পয়সা রোজগার করে। ভাল, এইবার দেখা যাবে!"

দেখা ত যাবে, কিন্তু এদিকে যে বড় বিপদ! এতক্ষণ যেন জিম্ ছিল, এখন এই আঁধারে—জনপ্রাণীর সাড়াটি নাই—হ্যারির যে এমন সময় ভূতের ভয় করে? বেচারি কি করে, সেই অন্ধকারে একটি পাতা নড়িলেই চমকিয়া উঠিতে লাগিল—একা যাইতে সাহসে কুলাইল না। অবশেষে বুদ্ধি করিয়া অন্ধকারে একটি ধারে চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; জিম্ ফিরিলে—আবার জিমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

স্কুলের নিকটে আসিয়া, হ্যারি একটু বুদ্ধি খাটাইয়া বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের প্রাচীর উলঙ্ঘন করিয়া জিমের পূর্ব্বেই ভিতরে প্রবেশ করিল। জিম্ পার হইয়াই দেখিল সম্মুখে হ্যারি। হ্যারি তখন যো পাইয়া জিম্‌কে বিদ্রূপ করিয়া বলিল,—"বলি, মহাশয়! এত রাত্রে গিয়াছিলেন কোথা? জিম্ বলিল—"তোমার তাহাতে প্রয়োজন কি?"

হ্যারি বলিল—"প্রয়োজন আছে কি না কাল তাহা বুঝিতে পারিবে।" পরে যথাসময়ে কলেজের অধ্যক্ষের নিকট নালিস হইল, এবং স্কুল হইতে রীতিমত অনুসন্ধানও আরম্ভ হইল। ছেলেরাও দেখিয়া শুনিয়া ভাবিতে লাগিল জিম্ যেমন ভূত, এবার তাহার তেমনই শিক্ষা না হইয়া আর যায় না।

(৭)

আজ ছেলেদের গায়ে আহ্লাদ ধরে না। জিমের শাস্তি আজ হইবে। তিনটার সময় বিদ্যালয়গৃহ লোকে লোকারণ্য হইল; নগরের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও আসিলেন। ছেলেরা ভাবিল, "ব্যাপার কি? কাহারও শাস্তির সময় ত এত বড় বড় লোক আসে না!" তাহার পর তাহারা ভাবিল, "বেশ ত, পেঁচাটা আচ্ছা জব্দ হবে!"

ক্রমে জিম্‌কে সেথানে আনয়ন করা হইল। জিম্ যখন সেই বালকদলের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিল—সকলেই তাহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কেহ বলিল, "কি হে পেচকরাজ! এই বার দেখা যাবে," কেহ বলিল, "যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল।" আবার কেহ বা জিমের মুখের দিকে চাহিয়া একটু একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিতে লাগিল। কিন্তু জিম্ স্থির নির্ব্বাক্। সে কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিল না।

জিম্ উপস্থিত হইলে, কলেজের অধ্যক্ষ উঠিয়া বলিতে লাগিলেন:—"একটি বালকের কথা বলি। আজ প্রায় আট বৎসর হইল, একটি ছাত্র কোন একটি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছে। সে যে লেখাপড়ায় মন্দ তাহা নহে, কিন্তু বালকদিগের সহিত বড় মিশিতে ভালবাসে না। বাড়ীতে তাহার বৃদ্ধ পিতা এবং মাতা আছেন। যখন তখন তাঁহাদিগের কথা ভাবিতেই সে ভালবাসে।

"বালকটির পিতা মাতার অবস্থা একদিন বড় মন্দ ছিল না। কিন্তু সকল দিন কাহারও সমান যায় না। কোন দৈব দুর্ঘটনায় সেই বৃদ্ধ জনক জননী সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। ইহার উপর আবার তাঁহাদিগের পীড়া উপস্থিত হইল। সুতরাং উপবাস করা ব্যতীত আর তাঁহাদিগের কোনই উপায় রহিল না।

"সেই ঈশ্বরপরায়ণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বালক কিন্তু ইহাতেও বিচলিত হইল না। সে নিজের প্রাণ দিয়া পিতা মাতার প্রাণরক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিল। তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে যে, সে নিজে প্রতিদিন সকলের ভুক্তাবশিষ্ট খাইয়া জীবনধারণ করিত, আর নিজের আহার্য্য লইয়া, কোন বিঘ্ন না মানিয়া প্রতিদিন রাত্রিতে বৃদ্ধ পিতামাতাকে দিয়া আসিত। এবং এইরূপেই সেই কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র পিতা মাতার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি জিমের দিকে চাহিয়া বলিলেন—'জিম্, তুমি কাঁদিও না, ঈশ্বর তোমার প্রতি সদয় হইয়াছেন। এই দেখ সাহায্যের বহি—তোমার পিতা মাতার যাহাতে স্বচ্ছন্দে দিনপাত হয়, তোমার এই সাধুতার পুরস্কার স্বরূপ, তাহার উপায় হইয়াছে। আর বিদ্যালয়ে এক শত টাকা মূল্যের একটি পুরস্কার আছে—সৎকার্য্যের জন্য সেটি বিতরিত হইয়া থাকে। দশ বৎসর কাল তাহা কেহ পায় নাই—আজ তুমি তাহা পাইলে।"—এই বলিয়া জিমের গলায় সেই স্বর্ণনির্ম্মিত মেডেলটি ঝুলাইয়া দিলেন।

বালকগণ অবাক্ হইয়া গেল, এবং লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া পড়িল। অধ্যক্ষ আবার বলিলেন—"যে সমুদয় বালক জিমের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিয়াছে, আমি আদেশ করিতেছি, তাহারা তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।" জিম্ কি বলিবে? জিম্ কাঁদিয়া আকুল হইল।

সাধারণের চাঁদায় এত টাকা উঠিল যে, স্বচ্ছন্দে তাঁহাদের দিনপাত হইতে লাগিল। ইহার কিছুকাল পরে,জিমের পিতার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল—জিম দেশের একটি রত্ন বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

(প্রাপ্ত।)

ছুটোছুটি খেলা।

একদিন সন্ধ্যা বেলা,
করে ছুটোছুটি খেলা,
সুকুমার শিশুগুলি মিলে,
এক খুকি বুড়ী হল,
তার চারিদিকে এল,
সকল শিশুরা দলে দলে!
এক জন হল আঁদি,
ভাঙ্গিল ছেলের গাঁদি,
ছুটোছুটি ঘরের কোণায়,
ছোট ছোট ছেলেগুলি
কচি কচি হাত তুলি,
ফাঁকি দিয়ে বুড়ি ছুঁয়ে যায়।
আকাশে গ্রহের মেলা,
সেখানেও এই খেলা,—
তাদের খেলিতে সাধ যায়,
আঁদি সেথা সুয্যিমামা,
কভু গায় রাঙ্গা জামা,
কভু বা গা ঢাকিয়া দাঁড়ায়।
ধরণী বেড়ায় ঘুরে,
চাঁদ ঘোরে তারে ঘিরে,
ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া সারা হ'ল,
যুগ যুগান্তর ধরে,
ছুঁতে নারে কেহ কারে,
কে এবার বুড়ী হ'ল বল।

হনুমান ও বানর।

সেদিন কচিমেয়েদের বাড়ীতে এক দল হনুমান আসিয়াছিল। বারান্দায় দাইলের বড়ী শুকাইতেছিল, কতকগুলি হনুমান আসিয়া টপাটপ্ খাইয়া বড়ী প্রায় শেষ করিয়া ফেলিয়াছিল। কচিমেয়ে দেখিতে পাইয়া "দাদা" "দাদা" করিয়া ডাকিতে লাগিল; দাদাও আসিয়া একটা ছোট বাঁশ হাতে করিয়া হনুমানগুলাকে তাড়াইতে গেল। কিন্তু হনুমানগুলার একটু ভয় নাই, কিছুতেই নড়িল না। সমুদয় বড়ী ফুরাইলে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

কচিমেয়ের দাদা বিষণ্ণমুখে ফিরিয়া আসিয়া বাবাকে বলিল—"কতকগুলা হনুমান আসিয়া সমস্ত বড়ী খাইয়া গিয়াছে; আমি তাড়াইতে গেলাম, একটা হনুমান শাদা দাঁত বাহির করিয়া আমাকে কামড়াইতে আসিল।"

বাবা।—তোমাদের মত ছোট ছেলে মেয়েদের হনুমানের নিকট যাওয়া উচিত নয়। এক একটা এমন দুষ্ট থাকে যে, সুবিধা পাইলে, খুব জোরে চড় চাপড় মারে। খুব ছোট ছেলেগুলিকে অনেক সময় গাছে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে এমনও শুনা যায়। কিন্তু হনুমান অপেক্ষা বানর আরও দুষ্ট।

কচিমেয়ে।—বানর কোন্ গুলা, বাবা?

দাদা।—দেখ নাই? বানরগুলার মুখ লাল।

বাবা।—মুখ লাল কেন, বানর ও হনুমানের মধ্যে অনেক প্রভেদ। বানরের দুই পাশের গালের নীচে দুইটা থলি আছে। কিছু খাবার পাইলে, উহা তাড়াতাড়ি ঐ গালের থলিতে পূরে। খাওয়া শেষ হইলে, অবসর মত সেই সমস্ত আবার মুখে আনিয়া

ভাল করিয়া চিবায়। হনুমানদের এরূপ থলি নাই।

দাদা।—গরু ছাগলেও এক বার ঘাস খাইয়া পুনর্ব্বার তাহা চিবায়।

বাবা।—হাঁ, বানরগুলাও প্রায় ঐরূপই করে। তবে প্রভেদ এই, গরু ছাগল প্রভৃতির থলিটি তাহাদের পেটে, বানরদের থলিটি তাহাদের গালে। অনেক জন্তুর এইরূপ একটা থলি আছে। সব সময় খাবার পায় না; যখন পায়, তাহা যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র আত্মসাৎ হয়, তাহারই জন্য থলি। আমাদের দেশে যত রকম লেজওয়ালা বানর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে এই রূপ দুই ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। হনুমানদের গালে থলি নাই, বানরদের গালে থলি আছে। হনুমানদের লেজ দীর্ঘ, বানরদের লেজ প্রায়ই ছোট।
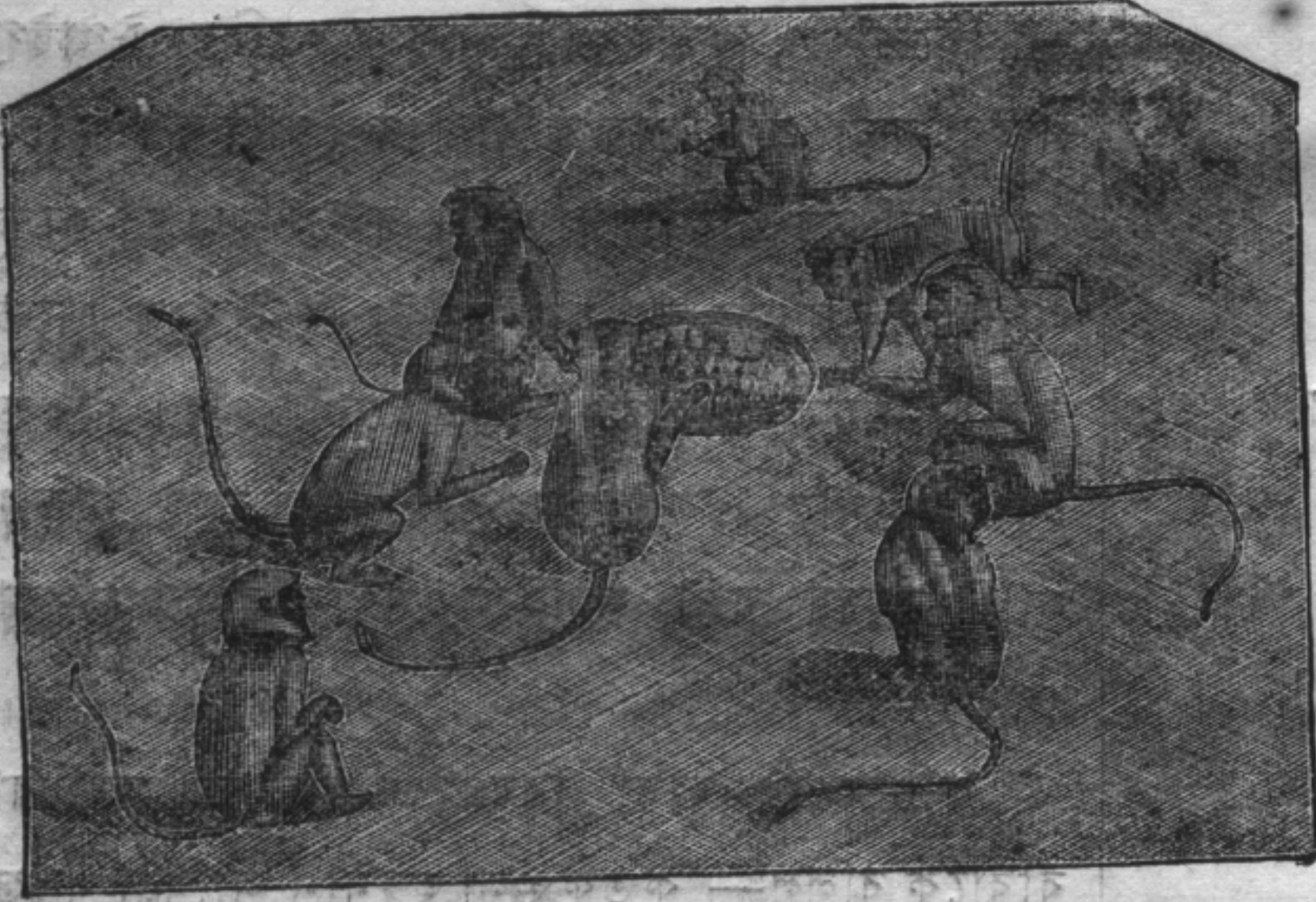
দাদা।—লেজ নাই এমন বানর আছে?

বাবা।—আছে বৈকি। আসাম, শ্রীহট্ট, কাছাড় চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানের বনে এক জাতীয় বানর আছে, তাহাদের লেজ নাই। হিন্দি ভাষায় ইহাদিগকে উলুক বলে। তাহারা মানুষের মত সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে এবং তাহাদের পা অপেক্ষা হাত লম্বা। বনমানুষ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। হনুমান ও বানর আর এক শ্রেণীর অন্তর্গত। হনুমান ও বানরদের লেজ আছে, এবং ইহারা কখনও দুই পায়ে ভর দিয়া চলে না।

দাদা।—আমাদের দেশে বনমানুষ নাই?

বাবা।—না; এখন আমাদের দেশে বনমানুষ নাই। বহু পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশে বনমানুষ ছিল। তাহাদের হাড় মাটির নীচে পাওয়া গিয়াছে। এমন অনেক প্রাণীর কথা জানা যায়, যাহারা পূর্ব্বকালে পৃথিবীতে ছিল, এখন একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহাদের হাড় ও অপরাপর চিহ্ন দেখিয়া তাহারা কোন এক সময় ছিল বলিয়া জানিতে পারি।

দাদা।—মুখ কালো হনুমান ও মুখ লাল বানর, এই দুই রকম দেখিয়াছি। অন্য রকম হনুমান ও বানরও তবে আছে?

বাবা।—হাঁ, আমাদের ভারতবর্ষেই ৮।৯ রকম বানর আছে। আমরা সচরাচর যে লালমুখ বানর দেখি, তাহাকে কোথাও কোথাও "মাকড়" বলে। "মর্কট" হইতে "মাকড়" শব্দ হইয়াছে। এই নয় রকম বানরের মধ্যে, কোনটার মুখ রক্তবর্ণ, কোনটার কৃষ্ণবর্ণ, কোনটার পাংশুবর্ণ, কোনটার বা ঈষৎ লাল। মুখের ও গায়ের বর্ণ ছাড়া তাহাদের অন্যান্য প্রভেদও আছে। এই কয়েক প্রকার বানর, হিমালয় প্রদেশ, দক্ষিণ ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও সিংহল দ্বীপে দেখা যায়।

দাদা।—মাকড়ের পাছার দিকটাও লাল?

বাবা।—হাঁ। পাছা লাল ও তাহাতে লোম নাই, কাণেও লোম নাই।

কচিমেয়ে।—বাবা, বানরে কি বড়ী খায়?

বাবা।—খুব খায়। ইহারা গাছের ফল ও বীজ খায়। তা ছাড়া, মাকড়সা ও অন্যান্য পোকাও ধরিয়া খায়। ইহারা প্রায়ই জঙ্গলে থাকে। কোন কোন গ্রামে দলে দলে বাস করে। পুকুরের ধারে বাগান পাইলে ইহাদের খুব আনন্দ। দুষ্ট ছেলেদের মত সর্ব্বদাই ঝগড়া ও চেঁচামেচি করে। কোন কোন লোক বানরের বাচ্চা ধরিয়া পোষ মানায়। কত রকম কৌশল দেখাইয়া ছেলেদের মনস্তুষ্টি করে।

কচিমেয়ে।—আমি সুরবালাদের বাড়ীতে বাঁদর-নাচ দেখিয়াছি। বানরটার নাকে নোলক ছিল, গায়ে কেমন জামা ছিল! সুরবালা একটা কাগজ দিয়াছিল, সেই কাগজটা পাইয়া এদিক্ ওদিক্ দেখিতে লাগিল, যেন কি আছে তাই দেখ্‌ছে!

বাবা।—বানরের কৌতূহল বড় বেশী, এবং দুষ্টামিতেও ইহারা খুব পাকা। হনুমানদের এত কৌতূহলও নাই এবং তাহারা এত দুষ্টও নয়। হনু-মানের আকার যেমন গম্ভীর, আচরণও তেমনই গম্ভীর।

কচিমেয়ে।—হনুমানের মুখটি কেমন কালো!

বাবা।—শুধু মুখটি কেন, হনুমানের কাণ ও হাতের ও পায়ের তলাও কালো। গায়ের পাঁশুটে রঙ্গের জন্য হাত মুখ অত কালো দেখায়। বানর যেমন অনেক রকম, হনুমানও তেমনই অনেক রকম আছে। দক্ষিণ ভারতবর্ষের নানা পাহাড়ে ও জঙ্গলে এক রকম হনুমান আছে, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ কালো। সিংহল দ্বীপে এক রকম বানর আছে, ইহাদিগকে দূর হইতে দেখিলে কতকটা ভালুকের মত দেখায়। কোন কোন হনুমানের মুখ নীলবর্ণ, কাহারও পেটটা গিরিমাটির মত লাল। মান্দ্রাজ প্রদেশে এক রকম হনুমান আছে, তাহাদের মাথার লোমগুলি এরূপ উচ্চভাবে আছে যে, দেখিলে মনে হয় যেন, টুপী পরিয়াছে।

দাদা।—কত জাতি হনুমান আছে, বাবা?

বাবা।—ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রায় ১০।১২ রকম হনুমান আছে। আমরা সচরাচর যে হনুমান দেখি, তাহা বঙ্গদেশে ব্যতীত উড়িষ্যা, বোম্বাই, রাজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন, গঙ্গার উত্তর কিম্বা পূর্ব্বদেশ হনুমানের বাসস্থান নহে। পূর্ব্ব বঙ্গে হনুমান দেখা যায় না। গঙ্গার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোন স্থানে এই পশু দেখা যায় সত্য, কিন্তু বোধ হয় তথায় কেহ এই জাতীয় পশু লইয়া গিয়া থাকিবে। হনুমান জল বড় ভয় করে। জলপান করিতে হইলে ইহারা পুষ্করিণী বা নদীর ধারে বসিয়া সশঙ্কচিত্তে মুখ নামাইয়া জলপান করে। বানরগুলা এরূপ নহে। তাহারা জলকে ভয় করে না। কোন কোনটা জলে সাঁতারও দেয়।

কচিমেয়ে।—বানরের মত হনুমান পোকা খায়?

বাবা।—না। ইহারা গাছের ফল, কচি ডাঁটা, কচি পাতা প্রভৃতি খাইয়া প্রাণধারণ করে। আম-বাগানে, তেঁতুল, তাল, বাঁশ প্রভৃতি গাছে, ঘরের চালে দলে দলে বেড়াইয়া লোকের বড় অনিষ্ট করে। কোন হিন্দু হনুমানকে মারিবে না, বরং মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানে লোকে কলাই, কলা প্রভৃতি নানা রকম খাবার জিনিস দিয়া হনু-মানের আদর ও সম্মান করে। হনুমান বড় সামান্য জন্তু নয়। পশ্চিমাঞ্চলে ও উড়িষ্যায় হনু-মানকে "বীর অবতার" ভাবিয়া লোকে পূজা পর্য্যন্ত করে। দোকানের সামগ্রী হনুমান নষ্ট করিয়া ফেলে, দোকানি মনে কষ্ট পাইলেও হনুমান বধ করে না।

দাদা।—হনুমানের এত সম্মান কেন হইল?

বাবা।—রামায়ণ পড়িয়াছ? হনুমান নামে এক বানর রামের বড় ভক্ত ছিল। রামের ভক্ত বলিয়া লোকে হনুমানকে এত ভক্তি করে। কিন্তু লোকেরা বুঝে না যে, যে হনুমানের কথা আমরা রামায়ণে পড়ি, তাহা এই সকল হনুমান নয়। কোন কোন গ্রামে হনুমান এত উপদ্রব করে যে, ধান্য ব্যতীত কোন শস্যই জন্মিতে পারে না। পূর্ব্বে ইহারা ইক্ষু খাইত না। সে বৎসর দেখিলাম, এক দল হনুমান আকের ক্ষেতে বসিয়া শিয়ালের মত আক্ চিবাইতেছে। বেল ভাঙ্গিয়া খাইতে শিখিয়াছে। আবার উড়িষ্যায় দেখিয়াছি, কুঁচিলা ফল খাইয়া অনায়াসে হজম করে। কুঁচিলা ফল কিন্তু ভয়ানক বিষাক্ত জিনিস, একটু-মাত্র খাইলে বিষে প্রাণবিনাশ ঘটে। কাঁচা তেঁতুল, কাঁচা আম, ডাঁটা, পাতা, শাক, প্রভৃতি যা তা জিনিস হনুমান সোণামুখ করিয়া খায়। সেই জন্যই যে ছেলে খাদ্যাখাদ্য বিচার না করিয়া যা পায় মুখে তুলিয়া দেয়, লোকে তাহাকে লক্ষ্য করিয়াও বলে, 'ছেলেটির যেন হনুমানের মুখ'। হনুমান এক গাছ হইতে অন্য গাছে সোজাসুজি ১৫।১৬ হাত লাফ দিয়া পড়িতে পারে।

কচিমেয়ে।—বড়ী খাইবার সময় একটা হনুমান দাঁত দেখাইতেছিল। দাঁতগুলি যেন মানুষের দাঁত!

বাবা।—মানুষের ৩২টি দাঁত আছে। বানর ও হনুমানেরও ৩২টি দাঁত। মানুষের চার রকম দাঁত, ইহাদেরও সেই চারি রকম। আবার, তোমার যেমন এখন "দুধে দাঁত" আছে, পরে পড়িয়া গিয়া আমার মত দাঁত হইবে, সেইরূপ বানর কেন, অনেক চতুষ্পদ জন্তুর প্রথমে "দুধে দাঁত" হয়। মানুষ ও বানর অনেক বিষয়েই এক রকম। মানুষ কথা কহিয়া নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে। কথা কহিতে কেবল মানুষই পারে, পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল। কিছু দিন হইল পণ্ডিত গার্ণার সাহেব সপ্রমাণ করিয়াছেন, বানরদেরও একটা ভাষা আছে—বানরেরাও তাহাদের স্ব স্ব ডাকের দ্বারা মানুষের ন্যায় মনের ভাব প্রকাশ করে। মানুষেরাই যে কেবল ভাষা দ্বারা কথাবার্ত্তা কহে, এখন আর এমন বলা যায় না।
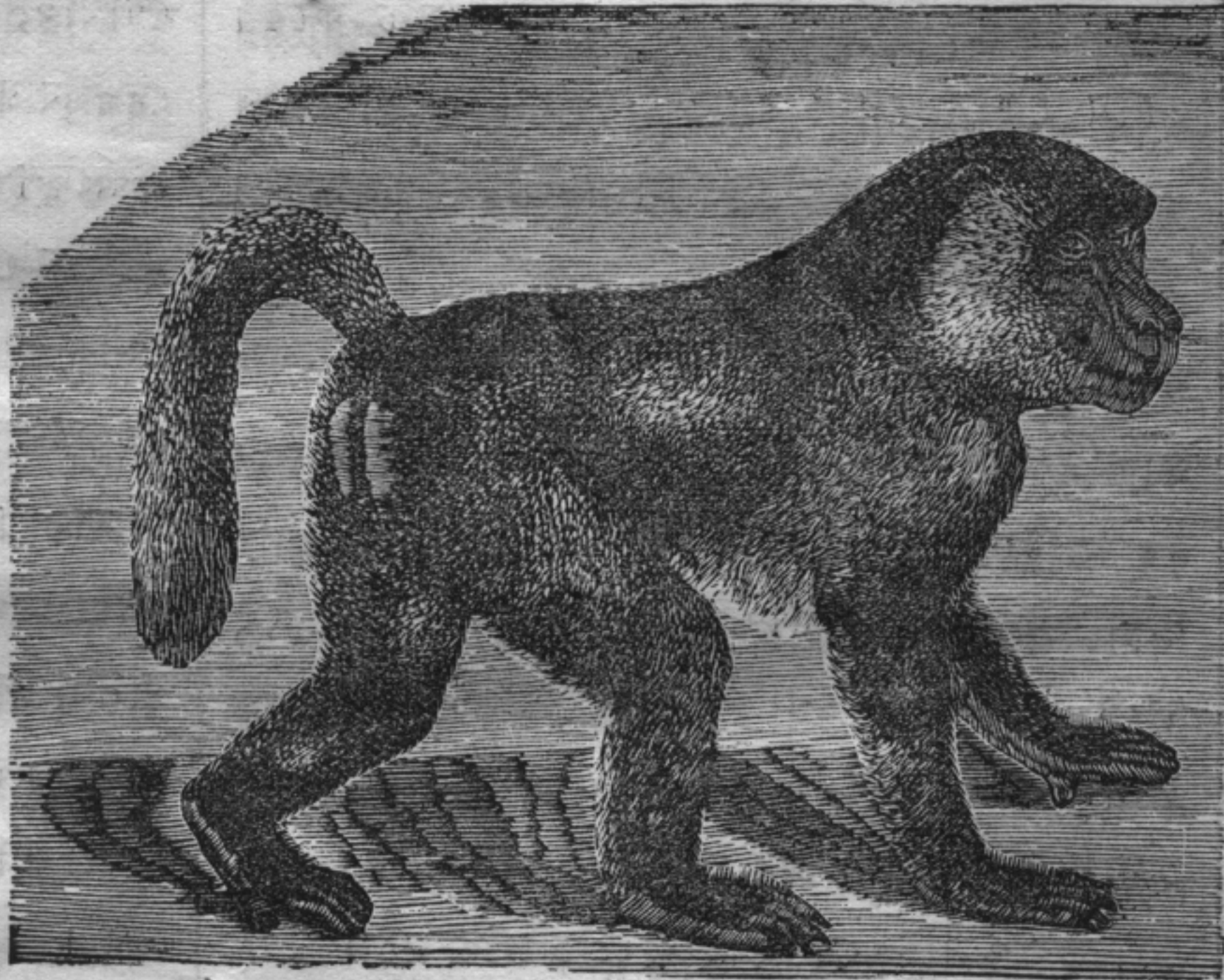
দাদা।—তবে মানুষ আর বানর এক না কি?

কচিমেয়ে।—মানুষের লেজ কই?

বাবা।—মানুষ আর বানর এক কেন হবে? উভয়েই এক হইলে যে তাহাদের এক নাম হইত। রাম, শ্যাম, যদুর মধ্যে কত প্রভেদ! তুমি রামকে কখন শ্যাম বলিয়া মনে কর না, অথচ তাহারা তুই-জনই মানুষ। যেমন রাম, শ্যাম, যদুর মধ্যে কতকগুলি সাদৃশ্য দেখিয়া তাহাদিগকে মানুষ বলিতেছে,

আবার যেমন তাহাদের মধ্যে কতকগুলি প্রভেদ দেখিয়া তাহাদিগকে পৃথক্ ব্যক্তি মনে করিতেছ, তেমনই বানরের সহিত মানুষের অনেকগুলি বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও তাহারা পৃথগ্জাতীয় জীব। আর কচিমেয়ে, তুমি কি ভুলিয়া গেলে যে, বনমানুষ নামক বানরের লেজ নাই? আর লেজ থাকা না থাকাতেই বা কি? বুদ্ধি চিন্তা, স্মৃতি, ভাষা শরীরের গঠন প্রভৃতি বিষয়ে মানুষে ও বনমানুষে অনেকটা এক। পূর্ব্বে মানুষ ও বনমানুষের মধ্যে যতটা প্রভেদ দেখা যাইত, বাস্তবিক সেই প্রভেদ তত যে নয়, তাহাই বলা যাইতেছে। জগদীশ্বরের প্রতি ভক্তি কেবল মানুষেই করিতে পারে, পরের দুঃখ দূর করিতে কেবল মানুষেই পারে, নিজের প্রাণ দিয়া পরের উপকার মানুষ ভিন্ন অন্য কোন প্রাণীকে করিতে দেখা যায় না। এই সকল আছে বলিয়াই মানুষ, "মানুষ" নাম পাইয়াছে। তোমরা যাহাতে বানর না হইয়া মানুষ হও, সতত প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতে থাকিবে।

এলিজাবেথ কার্টার।

যে বালিকাদের বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ, তাহারাই যে লেখা পড়া শিখিয়া অধিক বয়সে খ্যাতি লাভ করে, এমন নহে। এমন অনেক স্ত্রীলোক দেখা গিয়াছে, বাল্যকালে যাহাদের বুদ্ধির কিছুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় নাই, কিন্তু অধিক বয়সে লেখা পড়া শিখিয়া, তাঁহারা জনসমাজে খ্যাতি-ভাজন হইয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, যদিও বুদ্ধি বিষয়ে তাঁহাদের ন্যূনতা থাকে, পরিশ্রম ও যত্নের গুণে, তাঁহারা সে ন্যূনতার পরিপূরণ করিয়া লন। সুতরাং যাহাদের বুদ্ধি প্রখর নয়, তাহারাও পরিশ্রম ও যত্ন করিলেই বিলক্ষণ লেখা পড়া শিখিতে পারিবে সন্দেহ নাই। এলিজাবেথ কার্টার এ বিষয়ের উৎকৃষ্ট উদাহরণস্থল। ইঁহার এমন বুদ্ধি ছিল না, যদ্দ্বারা হঠাৎ কোনও পাঠাভ্যাস করিবেন। কিন্তু ইহা বলিয়া কি তিনি লেখা পড়ায় ক্ষান্ত হইয়াছিলেন? না। তিনি এত অধিক পরিশ্রম করিতে লাগিলেন যে, পাঠাভ্যাস না হইলে ক্ষান্ত হইতেন না। তিনি এইরূপে যে পাঠ অভ্যাস করিতেন, তাহা জন্মাবচ্ছিন্নে বিস্মৃত হইতেন না। তাঁহার বুদ্ধি অল্প বলিয়া, তাঁহার পিতা বিরক্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে কহিতেন, এলিজাবেথ! যাহার বুদ্ধি নাই, তাহার লেখা পড়ার বাসনা পরিত্যাগ করা উচিত। কিন্তু পিতার বাক্যে এলিজাবেথ কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুব্ধ বা নিরুৎসাহ না হইয়া, বরং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন যে, যত দিনে হয়, এবং যেরূপে হয় লেখা পড়া শিখিবেন। তাঁহার এক দৃঢ় সংস্কার ছিল, পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন এবং ধর্ম্মনিয়ম প্রতিপালন ব্যতীত, পৃথিবীতে বিদ্যা-চর্চ্চা অপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম আর কিছুই নাই। যাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রবল, তাহারা অল্প সময়ের মধ্যেই পাঠ অভ্যাস করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা হয় ত সকল সময় বহুদিন স্থায়ী হয় না; এলিজাবেথের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল না, কিন্তু তিনি অসাধারণ পরিশ্রম সহকারে যাহা অভ্যাস করিতেন, তাহা কখনই ভুলিতেন না। তিনি এত দূর পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার শিরঃপীড়া জন্মিল, এবং যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, সে রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়,

সুতরাং, তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার পিতার উপরেই ন্যস্ত হইল। কিন্তু জননী তনয়ার বিষয়ে যেমন দৃষ্টি রাখিতে ও যত্ন লইতে পারিতেন, পিতা তাহাতে সমর্থ হইলেন না।

রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে এলিজাবেথ নিদ্রা যাইতেন না। পাছে নিদ্রা আইসে, এজন্য তাম্রকূটচূর্ণের ঘ্রাণ লইতেন। জাগিয়া থাকিবার জন্য এ অভ্যাস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এ অতি গর্হিত অভ্যাস। ইহার ঘ্রাণ লইলে স্বাস্থ্যের হানি জন্মে। তাঁহার জননী জীবিত থাকিলে, অবশ্যই তাঁহাকে এ কু-অভ্যাস হইতে বিরত করিতেন। তাঁহার পিতা সর্ব্বদা নিকটে থাকিতেন না, সুতরাং এ বিষয়ের বিন্দুমাত্রও জানিতে পারিতেন না।

তিনি প্রথমতঃ গ্রীকভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন, তৎপরে লাটিন, এবং সর্ব্বশেষে হিব্রু শিখিয়াছিলেন। হিব্রু তাঁহার খুব ভাল লাগিত, এজন্য প্রত্যহ একবার করিয়া হিব্রু ভাষার গ্রন্থ আবৃত্তি করিতেন। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জন্‌সন্ কহিতেন যে, তাঁহার পরিচিত গ্রীকভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে তাঁহার নিজেরই গ্রীকভাষায় ব্যুৎপত্তি ছিল; কিন্তু এলিজাবেথ কার্টার উক্ত ভাষায় তাঁহা অপেক্ষা পণ্ডিত, এ কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। এলিজাবেথের বাটীর নিকটে একজন ফরাসী পণ্ডিত বাস করিতেন। এলিজাবেথ, তাঁহার নিকটে ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিলেন। ইহার অল্প দিন পরে, আপন যত্নে ইটালী, জর্ম্মন্ ও স্পেনদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিলেন। তিনি পিতার নিকট বসিয়া জর্ম্মন ভাষার গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতেন। ক্রমশঃ তিনি পোর্টুগিজ ভাষাও শিখিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে, তাহা তত উত্তমরূপে শিখিতে পারিলেন না।

সর্ব্বশেষে তিনি আরবী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। নিজের ব্যবহারের জন্য,তিনি ঐ ভাষার এক অভিধান প্রস্তুত করেন। অতঃপর তিনি জ্যোতিষ ও ভূ-বিদ্যা শিক্ষা করিলেন। ইতিহাস বিষয়েও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। প্রচলিত যে সমস্ত বিষয় স্ত্রীলোকের শিক্ষা করা আবশ্যক, এলিজাবেথ সে সকল বিষয়ে সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন। তিনি লেখা পড়া ব্যতীত শিল্পকার্য্যেরও অনুশীলন করিতেন। অনেক স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখিয়া, সমান বয়সের অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, কিন্তু এলিজাবেথ তাহাদিগের সহিত অতি ভদ্র ব্যবহার করিতেন। এক মুহূর্ত্তও তিনি আলস্যে অতিবাহিত করেন নাই। প্রতি দিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় শয়ন করিতেন, এবং অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিতেন। যত দিন বাঁচিয়াছিলেন, এই অভ্যাস পরিত্যাগ করেন নাই। শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, কিঞ্চিৎ ভ্রমণের পর পড়িতে বসিতেন; যতক্ষণ পড়িতেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না, কেবল আহারের সময় সকলের সহিত কথোপকথন করিতেন। তিনি কতকগুলি পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন; পাঠ সমাপ্ত হইলে, সেই সকল বৃক্ষে জলসেচন করিতেন। অবশিষ্ট সময়, সাংসারিক কার্য্যে অতিবাহিত হইত।

তিনি অতিশয় দয়াবতী ছিলেন। ডীল নগরে লোকেরা তাঁহার সদয় ব্যবহারে তাঁহার উপর বড় প্রীত ছিল। সামান্য লোকে তাঁহাকে অসামান্যা স্ত্রী মনে করিত, ভদ্র লোকেরাও তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতেন। যে পল্লীতে তিনি বাস করিতেন, তত্রত্য সমুদয় লোকে তাঁহার প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিত।

লেখাপড়ার অনুশীলন ব্যতীত, তাঁহার আরও অনেক প্রশংসনীয় গুণ ছিল। দরিদ্রগণের দুঃখ-

মোচনার্থ তিনি একটি সমাজ সংস্থাপন করিয়া তাহার কার্য্য সাধনের জন্ত বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার এক ভ্রাতা কেম্ব্রিজ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। তথায় অল্প দিন পড়িয়া, তিনি উত্তমরূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি এত অল্প দিন পড়িয়া কিরূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, এবং পূর্ব্বে কাহার নিকট পড়িয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করায়, তিনি শিক্ষকদিগকে কহিলেন যে, পূর্ব্বে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নিকট শিক্ষা পাইয়াছিলেন। সকলে শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। এলিজাবেথ কার্টার ৯০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিলেন। চিরজীবন পর্য্যন্ত কেবল লেখাপড়ার অনুশীলনে তিনি কালযাপন করিয়া গিয়াছেন।

লজ্জাবতী।

লজ্জাবতী গাছ দেখিয়াছ? যাঁহাদের পাড়াগাঁয়ে ঘর, তাঁহারা নিশ্চয়ই লজ্জাবতী দেখিয়াছেন। কেন না লজ্জাবতী গাছ আমাদের দেশে দুষ্প্রাপ্য নহে। স্থানে স্থানে উহার ডাঁটা ও পাতায় অনেক স্থান জুড়িয়া থাকে।

"ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না উটি লজ্জাবতী লতা।"—লজ্জাবতী ছুঁইলে উহার পাতাগুলি বুজিয়া গিয়া ডাঁটাটি নুইয়া পড়ে। যেন লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়ে। শামুককে চলিতে দেখিয়াছ? তাহার মুখের সম্মুখে চারিটা লম্বা শুঁড় আছে। চলিবার সময় ঐ শুঁড়গুলি এদিক্ ওদিক্ নাড়িতে থাকে। কোথাও কিছু আছে কি না, তাহাই নিরূপণ করিবার জন্য শুঁড়। শুঁড়টি কাঠির দ্বারা স্পর্শ কর, অমনই উহা গুটাইয়া যায়; স্পর্শ কিছু অধিক হইলে, শামুকটি তাহার হাড়ের ঘরে প্রবেশ করে। এইরূপ, প্রজাপতি, চিংড়িমাছ প্রভৃতি অনেক প্রাণীর স্পর্শেন্দ্রিয় স্বরূপ শুঁড় আছে।

লজ্জাবতীর সঙ্কুচিত অবস্থা দেখিলে মনে হইতে পারে, শামুক, কচ্ছপ প্রভৃতির সঙ্কোচের সঙ্গে হয় ত উহার সাদৃশ্য আছে। কাইকুতি দিলে তুমিও গুটাইয়া জড়সড় হইয়া পড়। লাজুক ছেলে মেয়েদিগকে কোন কথা বলিলে, একেবারে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। কিন্তু লজ্জাবতীর লজ্জার ভাবের সঙ্গে এই সকল সঙ্কোচভাবের কোন সাদৃশ্য নাই। লজ্জাবতীর লজ্জাভাবটা কিরূপ, আগে দেখা যাউক।

তোমরা যদি লজ্জাবতী গাছ কোথাও দেখিতে পাও, তাহা হইলে নিম্নলিখিত কয়টী বিষয় মনোযোগ পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। নিজে কোন জিনিস না দেখিলে কেবল পরের কথা শুনিলে বিষয়টি ভাল জানা যায় না। দ্রষ্টব্য বিষয়, যখনই সুবিধা পাইবে, স্বয়ং যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, পরের কথায় নির্ভর করিবে না।

প্রথমতঃ, লজ্জাবতীর পাতা কিরূপ দেখা যাউক। উহার পাতা তেঁতুলপাতার মত, একটি ডাঁটার দুই পাশে সারি সারি বসান। এইরূপ চারিটি পাতা আবার একটি বোঁটা হইতে বাহির হইয়াছে। বোঁটাটি গাছের যেখান হইতে উঠিয়াছে, সেখানে বোঁটাটি কিঞ্চিৎ স্থূল।

দুপুর বেলায় লজ্জাবতীর পাতা দেখিলে, দেখিবে ঃ—
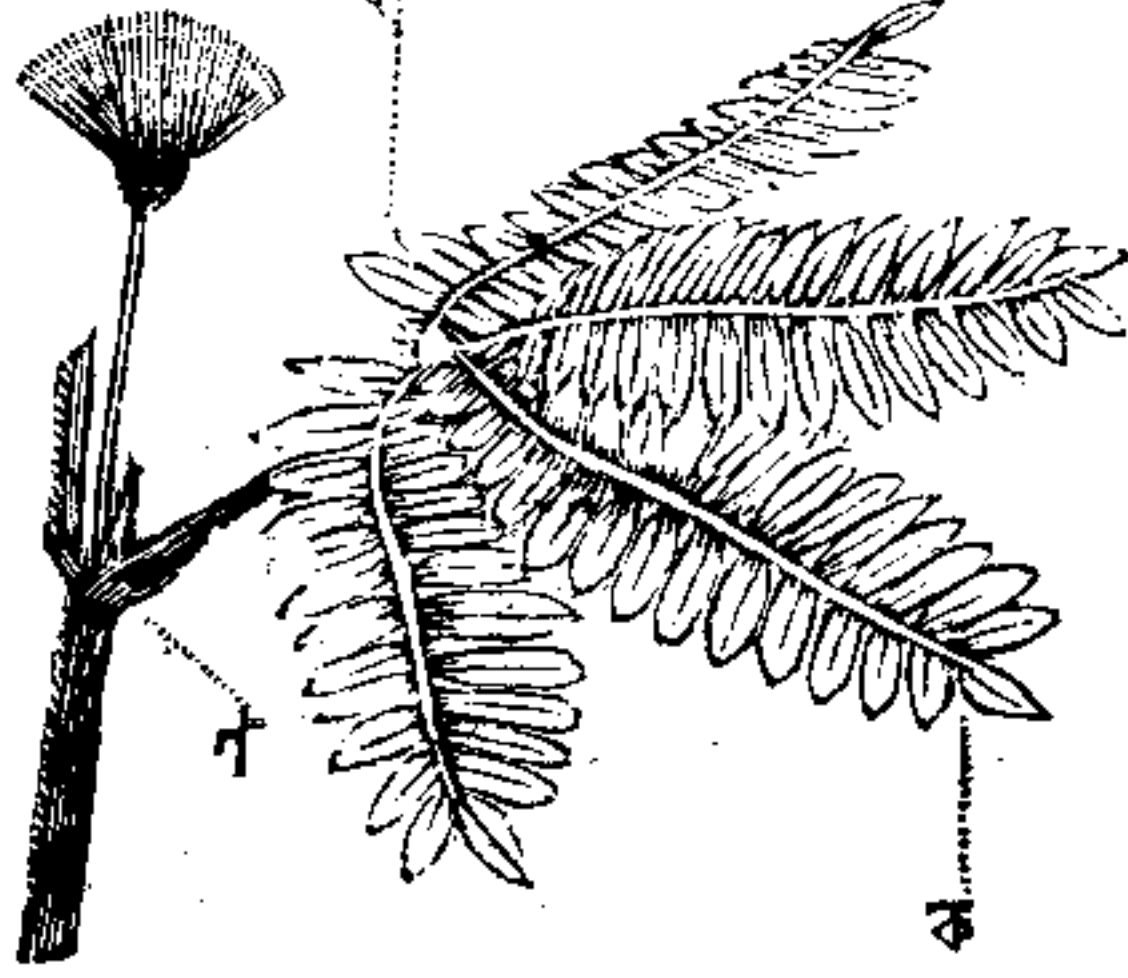
(১) সমস্ত পাতার বোঁটাটি গাছের উপর দিকে কিঞ্চিৎ বাঁকিয়া আছে।

(২) চারিটি ডাঁটা ফাঁক ফাঁক হইয়া আছে।

(৩) জোড়া জোড়া ক্ষুদ্র পাতাগুলি বিস্তৃত হইয়া আছে। আবার সন্ধ্যার সময় দেখ, দেখিতে পাইবে ঃ—

(১) পাতার বোঁটাটি নুইয়া পড়িয়াছে।

(২) চারিটি ডাঁটা একত্র হইয়াছে।

(৩) জোড়া জোড়া ক্ষুদ্র পাতাগুলি যেন সম্মুখে ও উপর দিকে জোড় হাত করিয়া আছে। এই ভাবেই লজ্জাবতী রাত্রিযাপন করে।

আবার প্রাতঃকাল হইতে, অল্প অল্প করিয়া পাতা ডাঁটা বোঁটা পুনর্ব্বার মধ্যাহ্নের অবস্থা ধারণ করে। এই ভাবেই ইহার দিনযাপন হয়। মনে কর দিনের বেলার অবস্থার "জাগ্রৎ দশা" ও রাত্রির অবস্থার "সুপ্তদশা" নাম দেওয়া গেল। উপরের দুইটি চিত্র দেখিলে এই দুইটি দশা বুঝিতে পারিবে।

দিনের বেলায় খোলা বিস্তৃত অবস্থা, রাত্রিকালে মুদ্রিত অবস্থা। আলোক ও আঁধারের সঙ্গে ঐ দুই অবস্থার কোন সম্বন্ধ আছে কি? একটা গাছকে কয়েক দিন পর্য্যন্ত অন্ধকার ঘরে রাখা হইয়াছিল। তাহাতে দেখা যায়, তিন চারি দিন পর্য্যন্ত উহা ১২ ঘণ্টা অন্তর জাগ্রৎ ও সুপ্তদশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার পর, সময়ের বা দশার কোন স্থিরতা থাকিল না। অবশেষে পাতাগুলি যেন অবশ হইয়া গেল, আদৌ নুইত না, বা বাঁকিয়া পড়িত না। সেইরূপ, কয়েকদিন ধরিয়া একটা গাছকে দিন রাত আলোকে রাখা হইয়াছিল। রাত্রিকালে খুব প্রখর আলোক জ্বালিয়া তাহার নিকট রাখা হইত। ইহাতেও দেখা যায় যে, দিন কয়েক জাগ্রৎ ও সুপ্তদশা গ্রহণ করিয়া অবশেষে পাতাগুলি অবশ ও অসাড় হইয়া পড়ে। তার পর সর্ব্বদাই জাগ্রদ্দশায় থাকিত।

লজ্জাবতীর পাতা ছুঁইলে, উহা উহার সুপ্ত বা ঘুমন্ত দশা প্রাপ্ত হয়। লজ্জাবতীর পাতার যেখানে যেখানে বাঁকে, জানিও সেখানে সেখানে কব্‌জা আছে (চিত্রের ক, খ, গ)। তাহা, হইলে দেখা যায় যে, উহার তিন স্থানে কব্‌জা আছে। কোন্ কোন্ তিন স্থানে?

লজ্জাবতীর পাতার যেখানে ছুঁইবে, সেখানে ত উহা বাঁকিয়া কিম্বা নুইয়া পড়িবে। কিন্তু তা ছাড়া, সেখান হইতে আরম্ভ করিয়া পাতার অন্যান্য অংশও বাঁকিয়া বা নুইয়া পড়ে। দেখ, লজ্জাবতীর জোড়া জোড়া ছোট পাতার সর্ব্বশেষের পাতা দুটি ছুঁইলে, সে দুইটি পাতা হাত যোড় করার মত যুড়িয়া যায়। কিন্তু তাহার পর আর আর ছোট পাতাগুলিও একে একে বুজিয়া যায়। যদি শেষের পাতা দুটিকে জোরে রগড়াও, তাহা হইলে সে ডাঁটার পাতা ছাড়া অন্য তিনটি ডাঁটার পাতাগুলিও বুজিয়া যাইবে। এমন কি বড় বোঁটাটী পর্য্যন্ত নুইয়া পড়িবে। আবার দেখ, বোঁটার গোড়ার মোটা অংশের নীচের লোমগুলি ছুঁইলে বোঁটাটি নুইয়া পড়ে, কিন্তু উপরের লোমগুলি ছুঁইলে সেরূপ

হয় না। কিন্তু মনে রাখিও যে, যে কারণে লজ্জাবতীর জাগ্রৎ বা সুপ্তদশা ঘটে, ছুঁইলে সে কারণে উহা মুদ্রিত হয় না। লজ্জাবতী লইয়া এ সব পরীক্ষা না করিলে কথাগুলি তেমন বুঝিতে পারিবে না। সুবিধা পাইলেই, তোমাদের এ সকল বিষয় নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

জাগ্রৎ ও সুপ্তদশা বুঝিলে? এখন এমন কতকগুলি গাছ মনে কর, যাহাদের পাতায় ঐ দুই দশা বেশ স্পষ্ট দেখা যায়।

ফট্‌কিরি দ্বারা জলশুদ্ধি।

আজ কালকার ডাক্তারগণের মত এই যে, ওলাউঠা, আমাশয়, বসন্ত, ক্ষয়কাশ প্রভৃতি অনেক রোগ এক এক প্রকার অতীব ক্ষুদ্র জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন হয়। রোগোৎপাদক জীবাণু, শরীরের রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হইলে এবং শরীর সে সময় দুর্ব্বল থাকিলে, তদ্দ্বারা রোগ জন্মিবে। রোগীর মলমূত্র শ্লেষ্মা প্রভৃতিতে এই সকল জীবাণু বিদ্যমান থাকে। এবং এইরূপ ক্লেদযুক্ত বস্ত্রাদি ধৌতকরণ দ্বারা ও অন্যান্য কারণে পুষ্করিণী প্রভৃতির জল দূষিত হইয়া উঠে, আবার সেই জল পান করিয়া, সহস্র সহস্র লোক রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এই সকল কারণেই পানীয় জলের বিশুদ্ধি রক্ষা বিষয়ে সকলেরই যত্নবান্ হওয়া কর্তব্য। এই সকল রোগোৎপাদক জীবাণু যাহাতে পানীয় জলে না থাকে, তজ্জন্য নানাবিধ উপায়ও আবিষ্কৃত হইতেছে। কয়েক বৎসর হইল ফট্‌কিরির জীবাণুবিনাশক গুণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফট্‌কিরি ব্যবহার দ্বারা যেমন সহজে বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায়, এমন আর কিছুতেই নয়। দশ সের জলে এক গ্রেণ ফট্‌কিরি দিয়া দেখা গিয়াছে যে, সেই জলের জীবাণু শতকরা নিরানব্বইটি বিনষ্ট হইয়াছে। এজন্য আমেরিকার কোন কোন স্থানে লোকদিগের ব্যবহারের জন্য এই উপায়ে জল পরিষ্কৃত করা হইতেছে। কাদা জলে ফট্‌কিরি দিলে জল নির্ম্মল হয়, ইহা সকলেই জানেন। সুতরাং ফট্‌কিরি ব্যবহার দ্বারা জল নির্ম্মল ও জীবাণু শূন্য হওয়াতে পানের বিশেষ উপযুক্তই হয়। অনেকে, জলে অনেকখানি ফট্‌কিরি মিশাইয়া দেন, তাহাতেই জল বিস্বাদ বোধ হয়। দশ তোলা জলে এক তোলা ফট্‌কিরি-চূর্ণ মিশ্রিত করিলে প্রতি দশ ফোঁটা জলে এক গ্রেণ ফট্‌কিরি থাকিবে। ঐ ভাগ মত ফট্‌কিরি-জল প্রস্তুত করিয়া পরিষ্কৃত বোতলে রাখিয়া দিলে, প্রতিদিন আর ফট্‌কিরি পরিমাণ করিতে হয় না। যদি জল স্বচ্ছ দেখ, তাহা হইলে, যত সের জল, তত ফোঁটা ফট্‌কিরি-জল ঐ বোতল হইতে দিয়া জল নাড়িয়া দিলেই হইল। জল কর্দ্দমাক্ত হইলে, যত সের জল, তাহার দ্বিগুণ সংখ্যক ফোঁটা দিলে শীঘ্র ঐ জল পানের উপযুক্ত হইবে। ফট্‌কিরির এত বড় জীবাণুবিনাশক গুণের কথা এ দেশের লোকে জানিতেন কি না জানি না, কিন্তু ফট্‌কিরি দিয়া জল পরিষ্কার করিয়া পান করিবার প্রথা এ দেশেও বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

পত্রপ্রেরকদের প্রতি।

কানপুর হইতে একটি বালকের একখানি পত্র তাঁহার অভিভাবকের স্বাক্ষর সহ পাইয়াছি, পত্রে বালকের সরলতা দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি, এজন্য সামান্য সংশোধন করিয়া পত্রখানির অধিকাংশই উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

"মহাশয়, জুলাই মাসের সখার ধাঁধার মধ্যে দুইটি প্রশ্নের উত্তর এই ক্ষুদ্র পত্রেতে লিখিতেছি। যদি উত্তর ঠিক হয়, তাহা হইলে আগষ্ট মাসের সখায় আমার নাম ছাপা হইলে আমি আমার সখার সহিত দুই জনে আহ্লাদে মাতিয়া যাইব। প্রথম ধাঁধাটির উত্তর—বারণ, তৃতীয় ধাঁধার উত্তর—ঘড়ী। দ্বিতীয়টির উত্তর আমার বুদ্ধিতে আসিল না জানিবেন। আমার সখা ১১ বৎসরের, আমি ১০ বৎসরের, ইহাতে সখা আমার চেয়ে ১ বৎসরের বড়। আমি আপন সখাকে বড়ই ভালবাসি এবং যত্নতে রাখি। বার মাসের সখাকে একত্রে পুস্তকাকারে বাঁধাইয়া আপন পুস্তকাদির মধ্যে অতি যত্নে রাখিয়া থাকি জানিবেন। অতএব আগষ্ট মাসের সখার মধ্যে আমার নাম দেখিতে পাই, ইহা জ্ঞাত কারণ নিবেদন করিলাম। ইতি।

সখার সখা, শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।

ধাঁধা।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

১। খগ। ২। বামন। ৩। মা।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ গতবারের তিনটী ধাধাঁরই ঠিক উত্তর দিয়াছেন।

শ্রীত্রিপুরাচরণ সেন, কলিকাতা; শ্রীদিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া; শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাঁকিপুর; শ্রীরটন্তীলাল রায়, বাঁকিপুর; শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা; শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, কালীঘাট; শ্রীআশুতোষ দত্ত, কালীঘাট; শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রঙ্গপুর; শ্রীরমণীলাল মৈত্র, রঙ্গপুর; শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়, হুগলী; শ্রীঅত্রিকুমার রায়, ভবানীপুর; শ্রীসুধীরচন্দ্র সান্ন্যাল, পাবনা; শ্রীমতী কিরণবালা সরকার, যশোহর; শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চৌধুরী, কলিকাতা; শ্রীপুরেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা; শ্রীসুভেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা; শ্রীঅনন্তকুমার সেনগুপ্ত, ভট্টপ্রতাপ; শ্রীমতী অন্নপূর্ণা ঘোষ, দ্বারভাঙ্গা; শ্রীমতী তরলা সুন্দরী, কলিকাতা; শ্রীজগদানন্দ দাস গুপ্ত, বরিশাল; শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বসু, দ্বারভাঙ্গা; শ্রীবিজয়শঙ্কর রায়, বরিশাল; শ্রীআবদুল খালেক, শ্রীউলা; শ্রীমতী হেমপ্রভা দত্ত, কালীঘাট; শ্রীমতী হিরণপ্রভা বসু, কালীঘাট; শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ময়মনসিংহ; শ্রীকেদারনাথ সেনগুপ্ত, কালিয়া; শ্রীহেমেন্দ্রকুমার বিশ্বাস, ফরিদপুর; শ্রীমতী নলিনীবালা রায়, চাইবাসা; শ্রীবিধুরঞ্জন লাহিড়ী, কুচবিহার; শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, খুলনা; শ্রীমতী হেমনলিনী বসু, ফরিদপুর; শ্রীহরিচরণ মিত্র, মহিষাদল; শ্রীসরোজনাথ ঘোষ, বেলতলা; শ্রীকালীমাধব চক্রবর্ত্তী, দুর্গাপুর; শ্রীপ্রমথনাথ সান্ন্যাল, রূপসী; শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগলপুর; শ্রীবাঁশীরাম দাস, টেপাতারা মোহন, স্কুল; শ্রীকালীকৃষ্ণ চৌধুরী, চুঁচুড়া; শ্রীক্ষেত্রনাথ চৌধুরী, দাঁতুন; শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, দ্বারভাঙ্গা; শ্রীমতী কিরণবালা সেন, জাহানাবাদ; শ্রীসুশীলকুমার নাগ, কলিকাতা; শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার, ময়মনসিংহ; শ্রীবিনয়ভূষণ ঘোষ, কলিকাতা; শ্রীঅখিলনাথ বসু, কলিকাতা; শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, করিমগঞ্জ; শ্রীবরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কীর্ত্তিপাশা; শ্রীদণ্ডধর মালো, বাগেরহাট; শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, যশোহর; শ্রীআর্ত্তনাথ মিশ্র, কুস্থাপাল; শ্রীনিশীথমোহন মুখোপাধ্যায়, নারিট; শ্রীমতী সরযূবালা দেবী, নিমতা; শ্রীমতী সৌদামিনী চক্রবর্ত্তী, বাঘৈর; শ্রীধ্রুবকুমার পাল, রাঁচি; শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়, রঙ্গপুর; শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, তমলুক; শ্রীশরৎচন্দ্র সেন গুপ্ত, কালিয়া; শ্রীমতী চারুবালা দেবী, বোদা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

অক্টোবর মাসের সখা, অক্টোবরের শেষে বাহির না হইয়া, পূজার পূর্ব্বেই বাহির হইবে। আমাদের ছোট ছোট পাঠকপাঠিকাগণ, ইতিমধ্যে স্থানপরিবর্ত্তন করিলে, আমাদিগকে আর না লিখিয়া, স্থানীয় পোষ্ট আফিসেই পরিবর্ত্তিত ঠিকানা লিখিয়া দিয়া যাইবেন।

১১শ ভাগ, ১০ম সংখ্যা।

সখা।

অক্টোবর, ১৮৯৩।

সখা

একাদশ ভাগ। ১০ম সংখ্যা।

অক্টোবর, ১৮৯৩।

নূতন পোষাক।

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার লিথোগ্রাফ ছবি দেখ।]

প্রমোদ বেড়েছে বড় পূজো এসে দেশে,
খোকা খুকী বাড়ী মাত করিল রে হেসে!
তুমিও হাসিবে যদি,—দেখ প্রাণ খুলি'
কেমন হাসিছে হোথা ভাই বোনগুলি!

বাহবা রে ভাঁড়ু বাবু, বাহবা কি জুতো!
এমন সরেস জুতো কারো দেখি নে তো।
কিনিবারো কালে কই ভাবি নে তো মোরা,
জুতোর ভিতরে ছিল এত হাসি পোরা।
ভাঁড়ু! তুমি সোণামণি বুদ্ধিমান যাই,
বাহির করিলে হাসি, বুদ্ধি ক'রে তাই!
এত হাসি পাই যদি জুতোর ভিতরে,
জুতোয় জুতোয়, ভাঁড়ু, ছেয়ে ফেলি তোরে!

এ পাশে বাড়া'য়ে কে গো কচি মুখ উটি,
দু হাতে কাপড় চেপে হেসে কুটি কুটি।
ফেলে রেখে ফুল ফিতে জুতো বডি চুড়,
কাপড়ের উপরেই হ'য়েছ উপুড়।
দূরে থেকে জাঁকাল যে দেখি মুখপাত,
তুমিই করিবে, বুড়ী, পূজোবাড়ী মাত।

ও রে ভাঁড়ু, ও রে বুড়ী, দেখ্ না চাহিয়া,
কে হাসে পিছনে ওই, তোদের দেখিয়া।
দাদার ত জামা জুতো নাই কিছু পাশে,
কেমন করিয়া তবে অত হাসি হাসে?
কেউ তা জান না; শুধু দাদা জানে আর
আমি জানি; বলে' দিব?—শুন হেতু তার:—
"বাবু এসেছেন"—কাল রেতে হ'ল রব,
ফোঁস্ ফোঁস্ নাক ডাকে তোমাদের সব।
উনিই ছিলেন শুধু ফ্যাট্ ফ্যাট্ চেয়ে,
"জুতো কোথা বাবা" ব'লে দাঁড়ালেন যেয়ে।
জামা জুতো মোজা সব এক এক ক'রে,
বাবাও দিলেন ওঁর বুঝাইয়া ওঁরে।
একে একে বুঝে নিয়ে উনিও সেগুলি,
ভাল ক'রে বেঁধেছেন আগেই পুঁটুলি।
মনে খুসী, ব'সেছেন তাই পাশে আসি,
নাকে মুখে জিবে গালে এক তাল হাসি।

ও পাশে কে হাসে?—এ যে আর এক বাবু,
দু হাতে কাপড় ধ'রে ক'রেছেন কাবু।
আর নয়—রাখ বাবু—কোঁচায়েছ বেশ,
কাপড়ের পরমায়ু হ'য়ে এল শেষ।

কে গো বাবু, মহা খুসী জুতো হাতে ধ'রে,
একমনে একধ্যানে চাহিয়া হাঁ ক'রে?
এমন করিয়া যদি ব্যাকরণ খানি,
এক দিন দেখ, বাবু, তবে ধন্য মানি!

দুরাকাঙ্ক্ষ ব্রাহ্মণ।

(উপকথা।)

এক নদীর তীরে, নিরালয় স্থানে, শিমুল গাছে 'সোণার পাখী' থাকিত। সোণার পাখীর মাথায় হীরার ফুল। পাখী সারাদিন বনের ফল, নদীর জল খাইয়া, মনের সুখে নীল আকাশের কোলে গাহিয়া বেড়াইত,—সন্ধ্যা হইলেই, শিমুল গাছে নিজের বাসাটিতে আসিয়া শুইয়া পড়িত। একদিন সন্ধ্যা হয়-হয় হইয়াছে, এমন সময় পাখী নিজের বাসায় ফিরিয়া আসিতে দেখিতে পাইল, একটি দুঃখী মানুষ সেই শিমুল গাছের তলায় পড়িয়া ঘুমাইতেছে। মানুষটির শরীর শীর্ণ, মাথা রুখু, পরিধান একখানি ছেঁড়া ময়লা কাপড়। ঘুমাইতেছে—চোখের জল চোখের পাতার উপর শুকাইতেছে। পাখীর বড় দয়া হইল। পাখী মনে মনে ভাবিতে লাগিল, অভুক্ত কাতর লোক আমার আশ্রয়ে আসিয়া, না খাইয়া রাত্রি কাটাইবে, ইহা আমার মঙ্গলের কথা নয়; অতএব অতিথিকে ভোজন করান আমার উচিত। এইরূপ চিন্তা করিয়া নিকটস্থ একটি বৃক্ষ হইতে একটি ফল আনিয়া মানুষটির কাছে ফেলিয়া দিল। ফলটি পড়িলেই, শব্দে মানুষটি জাগিল। জাগিয়াই দেখিল সূর্য্য অস্ত গিয়াছে—সন্ধ্যা হইতে আর বিলম্ব নাই। লোকটি তখন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল, এবং নদীতীরে গিয়া, নির্ম্মল জলে মুখ হাত ধুইয়া, ভগবানের উপাসনা করিতে লাগিল। দেখিয়া, পাখী বড় সন্তুষ্ট হইল; মনে মনে স্থির করিল, ইহার দুঃখ ঘুচাইব।

উপাসনা শেষ হইলে, মানুষটি আবার গাছ-তলায় আসিয়া বসিল। ফলটি পড়িয়া আছে দেখিয়া কুড়াইয়া লইল, এবং ভগবানকে নিবেদন করিয়া দিয়া আপনি ভক্ষণ করিল। পাখী তখন বৃক্ষশাখা হইতে মানুষটিকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"ব্রাহ্মণ! আজ তোমাকে আমার অতিথি রূপে পাইয়াছি, এবং তোমার আচরণে বড়ই তুষ্ট হইয়াছি। তোমার দুঃখ দেখিয়া কষ্ট হইতেছে। কিরূপ হইলে তুমি সুখী হও, বল; আমি তোমার দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিব।"

ব্রাহ্মণ, পাখীকে কথা কহিতে শুনিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইল। পাখীটি বড় সহজ পাখী নয় বুঝিয়া, বিনয়পূর্ব্বক বলিল,—"বিহঙ্গবর! তোমার অনুগ্রহ-বচনে কৃতার্থ হইলাম। সংসারে আমার পত্নী মাত্র আছেন। তিন মুষ্টি তণ্ডুল ভিন্ন তাঁহাকেও আজ কিছু দিয়া আসিতে পারি নাই। তুমি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছ, তবে এই বিষম অন্নকষ্ট হইতে যাহাতে পরিত্রাণ পাই, তাহাই কর—আমাকে কিছু ধন দাও।"

পাখী বলিল,—"তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম। তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও—গেলেই ধন পাইবে।"

ব্রাহ্মণ পাখীর কথায় বড়ই খুসী হইল। পাখীকে অভিবাদন করিয়া আপনার কুটীরের দিকে চলিল। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময় অতি কষ্টে প্রান্তরের মধ্যস্থলে আপনার কুটীরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দুয়ারগোড়ায় আসিয়া দেখিল, দুয়ারের সম্মুখেই স্তূপাকার কতকগুলা কি জিনিস অন্ধকারে চক্ চক্ করিতেছে। হাত দিয়া নাড়িয়া দেখিতে গেল, অমনই জিনিসগুলা কল্ কল্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। "এ যে টাকা, মোহর!—উঃ, পাখী এত টাকা দিয়াছে!"—তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণীকে ডাকিয়া জাগাইল, সকল কথা বলিল,—উভয়ের আনন্দের সীমা রহিল না। পাছে কেহ জানিতে পারে, এজন্য খরচের মত কিছু টাকা বাহিরে রাখিয়া, বাকী টাকা মোহর গুলা তাড়াতাড়ি ঘরের কোণে দুই তিন জায়গায় পুতিয়া ফেলিল। তাহার পর দিন হইতে তাহাদের আর কষ্ট রহিল না—পাখীর কৃপায় দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে লাগিল।

দুঃখ ঘুচিয়াছে, ব্রাহ্মণের সুখে থাকিবারই কথা; কিন্তু ব্রাহ্মণ সুখী হইতে পারিল না। কিছুদিন গেলে, ব্রাহ্মণের মনে একটু একটু করিয়া আবার অসন্তোষ দেখা দিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ভাবিতে লাগিল,—"টাকা পাইলাম বটে, কিন্তু সাধ মিটাইয়া খরচ করিবার যো নাই,—লোকে জানাজানি হইলেই, চোর ডাকাইতে লইবে। অতএব আর একবার পাখীর কাছে যাই, ভাল বাড়ী ঘর, চাকর দরওয়ান প্রভৃতির একটা ব্যবস্থা করিয়া আসি।"

মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ আবার পাখীর উদ্দেশে চলিল। সন্ধ্যার সময় সেই নদীতীরে গিয়া উপস্থিত হইল, এবং শিমুলতলায় দাঁড়াইয়া বলিল—

"শিমুল গাছে সোণার পাখী, মাথায় হীরের ফুল,
আমার সাথে কও-না কথা হ'য়ে অনুকূল।"

পাখীও বৃক্ষ হইতে উত্তর দিল—

"নীল আকাশে গেয়ে গেয়ে—ঘুরে বনভুমি,
কাতর হ'য়ে এই এসেছি, কে ডাক গো তুমি?"

ব্রাহ্মণ বলিল,—"আমি ব্রাহ্মণ—আমি সেই একদিন তোমার এই শিমুলতলায় শুয়ে প'ড়ে ছিলুম—তুমি সেই আমাকে ধন দিয়েছিলে।"

পাখী বলিল,—"ভাল, বুঝিলাম। আজ কি মনে করিয়া আসিয়াছ, ব্রাহ্মণ?"

ব্রাহ্মণ বলিল,—"আমাকে ধন দিয়াছ, কিন্তু আমার পাতার কুঁড়ে। চোর ডাকাতের ভয়ে ধন বাহির করিতেও পারিতেছি না, ভোগ করিতেও পারিতেছি না। অতএব আমাকে ভাল বাড়ী আর চাকর দরওয়ান দাও।"

পাখী বলিল,—"তাহাই হইল, বাড়ীতে যাও।"

ব্রাহ্মণ, বিলম্ব না করিয়া, বাড়ীর দিকে ঝড়ের মত ছুটিল। শেষরাত্রে বাড়ীর নিকট আসিয়া দেখিল, মাঠের মাঝে তাহার কুটীর নাই, বাগানের ভিতর এক সুন্দর অট্টালিকা দেখা যাইতেছে। দেউড়ীতে দরওয়ান, চারি দিকে দাস দাসী,—তাহারা ব্রাহ্মণকে দেখিয়া মস্তক অবনত করিল এবং একজন দাসী ব্রাহ্মণকে বাড়ীর মধ্যে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। ব্রাহ্মণীর নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহার বড়ই আদর অভ্যর্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণের সুখে দিন কাটিতে লাগিল।

কিন্তু, দিন কাটিতে লাগিল—আর সুখ কমিতে লাগিল। ব্রাহ্মণের মনে আবার অসন্তোষ দেখা দিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ভাবিতে আরম্ভ করিল, "বড়মানুষ হইয়া সুখ কি? রাজা হইতাম, তবে সুখ

হইত বটে।” কয়েক দিন এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ বড়ই অসুখী হইল, এবং একদিন আবার সেই নদীতীরে শিমুল গাছের উদ্দেশে চলিল। সেখানে পঁহুছিতে সন্ধ্যা হইল। ব্রাহ্মণ তখন শিমুল গাছের তলায় আসিয়া পূর্ব্বের মত বলিল,—

“শিমুল গাছে সোণার পাখী, মাথায় হীরের ফুল,
আমার সাথে কও-না কথা হ'য়ে অনুকুল।”

পাখীও বলিল,—

“নীল আকাশে গেয়ে গেয়ে—ঘুরে বনভূমি,
কাতর হ'য়ে এই এসেছি, কে ডাক গো তুমি?”

ব্রাহ্মণ বলিল,—“আমি সেই ব্রাহ্মণ—”

পাখী বলিল,—“বুঝিয়াছি। কি বল?”

ব্রাহ্মণ বলিল,—“আমাকে ধন সম্পত্তি সকলই দিয়াছ। রাজা করিয়া দাও, আর কিছু চাহিব না।”

পাখী বলিল,—“তাহাই হইল—গৃহে যাও।”

ব্রাহ্মণ গৃহাভিমুখে চলিল। এ দিকে এক রাজা মরিয়াছে, রাজার হাতী ছুটিয়াছে, যাহাকে পিঠে তুলিবে, সেই রাজা। হাতী শুঁড় দোলাইতে দোলাইতে ব্রাহ্মণের দিকে আসিতে লাগিল।

হাতীকে শুঁড় দোলাইয়া নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণ প্রাণভয়ে চীৎকার করিয়া পলাইতে উদ্যত হইল; কিন্তু পারিল না। হাতী ব্রাহ্মণের খুব নিকটেই আসিয়া তাহার পায়ের কাছে শুঁড় নামাইল এবং শুঁড়ে করিয়া আপনার পিঠে তুলিয়া বসাইল। ব্রাহ্মণ শুনিলেন, তিনি রাজা হইলেন। তখন তিনি বেশ জাঁকাইয়া বসিলেন। হাতী সুন্দর সুসজ্জিত রাজধানীতে প্রবেশ করিল। সভাসদ্গণ ব্রাহ্মণকে সসম্মানে লইয়া গিয়া রাজ-সিংহাসনে বসাইল। ব্রাহ্মণী আসিয়া রাণী হই-লেন। পরমসুখে রাজার দিনপাত হইতে লাগিল। রাজা ভাবিলেন, আর আমার কিছুরই অভাব নাই।

অভাব নাই—কিন্তু অভাব শীঘ্রই আসিয়া জুটিল। রাজার উপরও রাজা আছে, অতএব সমস্ত পৃথিবীর রাজা হইতে না পারিলে আর সুখ নাই—এই চিন্তা তাঁহার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। সুতরাং তাঁহার মনে আবার অসন্তোষ দেখা দিল। পাখীর কাছে যাইতে আবার প্রবৃত্তি হইল। ভাবিলেন, সমস্ত পৃথিবীর উপর রাজা হইলেই, আকাঙ্ক্ষার আর তাঁহার কিছুই থাকিবে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি রাজধানী হইতে বহির্গত হইলেন, এবং অনেক দূর গিয়া নদীর তীরে শিমুল গাছ দেখিতে পাইলেন। সন্ধ্যা হইতে তখনও একটু বিলম্ব ছিল—সুতরাং পাখী তখনও বাসায় আসে নাই বুঝিয়া, নদীতীরে একটু বিশ্রাম করিয়া, সন্ধ্যার সময় শিমুল গাছের তলায় উপস্থিত হইলেন, এবং পূর্ব্বের ন্যায় পাখীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

“শিমুল গাছে সোণার পাখী, মাথায় হীরের ফুল,
আমার সাথে কও-না কথা হ'য়ে অনুকুল।”

পাখী উত্তর দিল—

“নীল আকাশে গেয়ে গেয়ে—ঘুরে বনভূমি,
কাতর হ'য়ে এই এসেছি, কে ডাক গো তুমি?”

ব্রাহ্মণ কহিল,—

“আমি ব্রাহ্মণ—এখন রাজা। আমি সেই—”

পাখী বলিল,—"বুঝিয়াছি। কি বলিবে?"

ব্রাহ্মণ তখন মনের কথা বলিল। পাখী বলিল,—"ভাল, তাহাই হইল—গৃহে যাও।"

ব্রাহ্মণরাজ গৃহে চলিলেন। যথাসময়ে রাজ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সুপ্রশস্ত রাজপথ, শোভাময় উদ্যান, সুবিশাল দীর্ঘিকা, মনোহর পণ্যশালায় তাঁহার রাজধানী সুশোভিত ও শতগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। নদীতীরে পরিখাবেষ্টিত দুর্গমধ্যে তাঁহার সমুচ্চ রাজভবন ঐশ্বর্য্যগরিমায় যেন ইন্দ্রালয়কেও উপহাস করিতেছে। রাজা উপস্থিত হইলে, শত শত করপ্রদ রাজা, সহস্র সহস্র রাজকর্ম্মচারী, দণ্ডবৎ হইয়া অভিবাদন করিল এবং রাজাধিরাজের সুন্দর আসনে তাঁহাকে লইয়া গিয়া বসাইল। ব্রাহ্মণরাজ বড়ই আনন্দিত হইলেন। এবং জগতে আর তাঁহার কিছুই অপ্রাপ্য রহিল না ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

নিশ্চিন্ত হইলেন,—কিন্তু সে কত কাল? কয়েক মাসের মধ্যেই আবার তাঁহার মনে অসন্তোষের উদয় হইতে লাগিল—আবার আকাঙ্ক্ষার আগুনে মন পুড়িতে লাগিল। এখন পৃথিবীতে তাঁহার অলব্ধ বস্তু নাই, সুতরাং আকাশে দৃষ্টি পড়িল। সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রের দিকে চাহিয়া, তাঁহার অসন্তোষ জন্মিতে লাগিল—তিনি তাহাদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে উৎসুক হইয়া উঠিলেন। শীঘ্রই তাঁহার এই দুরাকাঙ্ক্ষা এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে, তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না,—শীঘ্রই পাখীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। নদীর তীরে উপস্থিত হইয়াই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া শশব্যস্তে শিমুল গাছের তলায় আসিয়া পাখীকে ডাকিলেন,—

"শিমুল-গাছে সোণার পাখী, মাথায় হীরের ফুল,
আমার সাথে কও-না কথা হয়ে অনুকূল।"

পাখীও বলিল,—

"নীল আকাশে গেয়ে গেয়ে—ঘুরে বনভূমি,
কাতর হ'য়ে এই এসেছি, কে ডাক গো তুমি?"

ব্রাহ্মণরাজ বলিলেন,—

"আমি ব্রাহ্মণ—সমগ্র পৃথিবীর রাজা। আকাশের রাজা হইব—আমাকে আকাশের রাজা করিয়া দাও।"

পাখী অতিশয় অসন্তুষ্ট হইল। বলিল,—

"তোমার আকাঙ্ক্ষা অপরিমিত। সন্তোষ কি বস্তু, তাহা তুমি বুঝিলে না। দুরাকাঙ্ক্ষার বশে, তুমি আকাশের রাজা ভগবানকেও ভুলিয়াছ—তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা আমার সাধ্য নহে। অতএব আমি তোমার সেই পূর্ব্বের কুটীরই ব্যবস্থা করিলাম; আর দুরাকাঙ্ক্ষার দণ্ড স্বরূপ তোমার হাঁ-টা বড় করিয়া দিলাম। এখন আর আমি তোমার কোন কথাই শুনিব না,—তোমার জালায় আজি হইতে আমি শিমুল গাছ ছাড়িলাম।"

পাখী আর শিমুল গাছে নাই। ব্রাহ্মণ কিন্তু এখন আবার সেই পুরাতন কুটীরেই। নূতনের মধ্যে—হাঁ-টি তাঁহার বড় হইয়া গিয়াছে।

———

দাও সন্দেশ।

কাকাবাবু! আস্‌চো শুনে দৌড়ে এলেম তাই,
দাও সন্দেশ, কাকাবাবু, আমরা সবাই খাই।
বেশ এনেছ ঝুড়ি ভ'রে,
নিয়ে গিয়ে কাজ্‌ নে ঘরে,
যা দেবে দাও বখ্‌রা ক'রে, গোল মিটিয়ে যাই,—
দাও সন্দেশ, কাকা বাবু, আমরা সবাই খাই।

কাকা বাবু, দেখ্‌বে চলো ঠাকুর এবার কি!
সিঙ্গি চোরা কত তেজী, কেমন ময়ূরটি!
আবার চলো দেখ্‌বে কাকা,
চালে কত পুত্‌লো আঁকা,
অর্দ্ধেক তার রক্তমাখা ডগ্‌ডগে সিপাই,—
দাও সন্দেশ, কাকা বাবু, আমরা সবাই খাই।

কাকা বাবু, দেখ্‌বে চলো পূজোর কেমন ঘটা,
তাক্‌ডুম্‌ ডুম্‌, নাক্‌ডুম্‌ ডুম্‌, ঢোল এসেছে ন'টা;
কাঁই কাঁই কাঁই বাজে কাঁশী,
পোঁ পোঁ পোঁ বাজে বাঁশী,
কেবল বাজে, কেবল নাচি, একটু বিরাম নাই,—
দাও সন্দেশ, কাকা বাবু, আমরা সবাই খাই।

কাকা বাবু, চল্‌চো কেন গুটি গুটি ক'রে,
কেমন পোষাক দেখা'ব সব, দৌড়ে চলো ঘরে;
রাঙা, শাদা, সব্‌জে কালো,
কাপড়, জামা ভালো ভালো,
ঘর ক'রেছে আলো,—এমন জন্মে দেখি নাই,—
দাও সন্দেশ, কাকা বাবু, আমরা সবাই খাই।

কাকা বাবু, পরশু এবার চণ্ডীর গান রদ,
সন্ধ্যা থেকে যাত্রা হ'বে, পালা—রাবণবধ;
দশমুণ্ড নাচ্‌বে রাবণ,
বীর হনুমান আস্‌বে কেমন,

রাম-লক্ষ্মণ বাণ বরিষণ কর্‌বে যে সাঁই সাঁই,—
দাও সন্দেশ, কাকা বাবু, আমরা সবাই খাই।

ওই গো!—ওই শোন কাকা, বাজ্‌না আবার বাজে,
যাই বাড়ীতে, আর দাঁড়া'তে হেথায় পারি না যে;
ক'র্‌বো না কো হুড়োহুড়ি,
দাও-না তুমি নামিয়ে ঝুড়ি,
সভ্য এখন আমরা, কাকা,—ঝগড়ার ভয় নাই,—
দাও সন্দেশ, কাকা বাবু, খেতে খেতে যাই!

পেটুক গণেশ।

রাম বাবুদের বাড়ী নরোত্তমপুর গ্রামে। রামকান্ত ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে এবার প্রথম মা দুর্গার পূজা হইল। দেশে গুজব, "ঘোষেরা দীঘির পাড়ে বটতলায় তিন কলসী টাকা পেয়েছে, তাই পূজায় এত ধূমধাম।" অলসেরা ধারণা করিতে পারে না যে, কর্ম্মিষ্ঠ ও মিতব্যয়ী লোকেরা ধীরে ধীরে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিতে পারেন।

রাম বাবু সপ্তমী পূজার দিন গ্রামের সকল ছেলেকেই খুব খাওয়াইলেন। প্রতিবেশিপুত্র গণেশচন্দ্র রায়ও বাদ পড়িল না। লোকে ইহাকে পেটুক গণেশ বলে। গণেশের অনেক গুণ; লেখা পড়ায় ইনি সরস্বতীর ত্যজ্যপুত্র, কিন্তু বাবুগিরিতে স্বয়ং কার্ত্তিক! আবার সবার উপর বড় গুণ, তিনি নিজের পেটটীকে দুই আনা মুল্যের থলিয়া মাত্র মনে করেন। কোথাও কিছু খাবার পাইলে এই থলিয়ার মধ্যে যতদূর সম্ভব পূরিতে চেষ্টা করেন।

রাম বাবুদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইয়া সকলেই বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া নিজের নিজের কাজকর্ম্ম করিতেছেন। গণেশ বাবু কিন্তু এখনও পথে। তাঁহার পথ আর শেষ হয় না। পেটে জলবিন্দু ধরিবে এমন স্থান নাই। কাঠের পুতুলের মত আড়ষ্ট হইয়া চলিতেছেন—বাড়ীর পথ যেন দশগুণ লম্বা হইয়াছে।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, এমন করিয়া আর কখনও খাইব না। মনে এরূপ করিতেছেন বটে, কিন্তু কাজে এরূপ করিবেন বলিয়া কখনই বিশ্বাস হয় না। কেন না খাওয়ার সময় তাঁহার এ প্রতিজ্ঞা মনে থাকে না। বালক বালিকাগণ যদি আমাদের কথার প্রমাণ দেখিতে চাও, ত কাল, পরশু দুইটা দিন গণেশ বাবুর উপর একটু নজর রাখিও। আজ সপ্তমী পূজার খাওয়ান চুকিল বই ত নয়—অষ্টমী, নবমী ত এখনও হাতে।

মা।

মা আমার কত ভাল বাসেন আমায়,
আছে কি তুলনা মোর মায়ের দয়ায়!
সকল শকতি-হীন
জনমিনু যেই দিন,
নিলেন মা কোলে তুলে আদরে আমায়—
মা আমার কত ভাল বাসেন আমায়!

শিশুকালে নিশিদিন ধুক্ ধুক্ বুক,
পলে পলে শুকাইত পিপাসায় মুখ;
তখন করুণা দানে,
সদা শত সাবধানে,
মা আমারে বাঁচালেন বুকের সুধায়—
মা আমার কত ভাল বাসেন আমায়!

তখন না ছিল মোর নড়িবার বল,
অভাব হইলে কিছু কেঁদেছি কেবল;
মাছিটি বসিলে গায়,
কাতর হয়েছি তায়,
সে দায় মা তারিলেন কত মমতায়—
মা আমার কত ভাল বাসেন আমায়!

আমার অসুখে, বুকে বিষাদ সহিয়া
কত নিশি জাগিলেন শিয়রে বসিয়া;
কত দিন উপবাসে,
যাপিলেন অনায়াসে,
মার মত কার দুখ মোর যাতনায়—
মা আমার কত ভাল বাসেন আমায়!

কাঁদিলে—মা ভুলা'তেন কত কথা ক'য়ে,
হাসিলে—মা হাসিতেন কত সুখী হ'য়ে;
শৈশবে সে মার কোলে
বসি' আধ আধ বোলে
শিখিনু মায়ের ভাষা—মধু মাখা যায়—
মা আমার কত ভাল বাসেন আমায়!

এখনো মা কত বার মোর মুখ চান,
দেখিলে আমারে সুখী কত সুখ পান;
যখন পড়িতে যাই,
তখনো বিরাম নাই,
দেহ তাঁর ঘরে, মন মোর পাছু ধায়—
মা আমার কত ভাল বাসেন আমায়!

ধরায় কি আছে কেহ মার মত আর?
নাহি যে তুলনা মোর মায়ের দয়ার।
জীবনে কি আমি তাঁর,
শুধিতে পারিব ধার,
তত ভাল বাসা দিতে পারিব কি মায়?—
মা আমার কত ভাল বাসেন আমায়!

ফুট্‌বল-খেলা।

বিলাতি খেলাও আজ কাল আমাদের দেশে অনেক চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। ফুট্‌বলও (Foot-ball) বিলাতি খেলা। ইহাও কলিকাতার বালকগণের মধ্যে খুব প্রচলিত হইয়াছে। এই খেলায় সমস্ত অঙ্গের চালনা হওয়ায় ইহা অতি উত্তম ব্যায়াম, এবং ইহাতে বেশ নির্দ্দোষ আমোদও আছে।

এ কারণ আজ কাল ফুট্‌বল, ক্রিকেট্, লন্ টেনিস্ প্রভৃতি আমোদজনক অথচ স্বাস্থ্যপ্রদ খেলা যাহাতে অধিকতররূপে প্রচলিত হয়, রাজপুরুষেরা

তদ্বিষয়ে উৎসাহ দান করিতেছেন। প্রতি বৎসর শীতকালে ছোট লাট বাহাদুর, কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সভাপতি মহোদয় প্রভৃতি বড় বড় রাজপুরুষগণের সাহায্যে ও সহানুভূতিতে কলিকাতাস্থ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্কুল কালেজের ছাত্রবর্গের মধ্যে নানা প্রকার ক্রীড়ার প্রদর্শনী হয়। এই উপলক্ষে ছাত্রদিগকে অনেক মেডেল ও পারিতোষিকও প্রদত্ত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন স্কুল কালেজের ছাত্রগণ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহকারে ফুটবলের ম্যাচ্ করেন। তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন স্কুল কালেজের ছাত্রবৃন্দের মধ্যে পরিচয় ও সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হয়। অনেক সময় কেল্লার গোরাদিগের সঙ্গেও কালেজের বাঙ্গালি ছাত্রগণ ম্যাচ্ খেলিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছে।

ফুট্‌বল খেলার অনেক গুণ থাকিলেও, একটী দোষ এই যে, অত্যন্ত গোঁয়ারের মত খেলিলে, কখনও কখনও পরস্পর জুতার আঘাতে পা কাটিয়া বা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারেন। কিন্তু সাবধানে খেলিলে, এ খেলায় বিশেষতঃ এসোসিয়েশন নিয়মের খেলায় কিছুমাত্র বিপদের আশঙ্কা নাই। গুলি-দাঁড়া বা ক্রিকেট্ খেলায় অনেকের দন্ত, চক্ষু বা হাত পা নষ্ট হয়। কিন্তু সাবধানে ফুট্‌বল খেলিলে তদ্রূপ কোন বিপদেরই আশঙ্কা নাই।

এক্ষণে ফুট্‌বল খেলার নিয়মাদি সম্বন্ধে কিছু বলিব। ফুট্‌বল দুই প্রকারে খেলা হয়। এক প্রকার খেলার নাম, এসোসিয়েসন, এবং অন্য প্রকার খেলার নাম রগ্‌বি। নিম্নে কেবল এসোসিয়েশন খেলার কথাই বলিতেছি।

ফুট্‌বল খেলা মানে পায়ে করিয়া বল (ball) খেলা। ফুট্‌বল কি তাহা জান? ফুট্‌বল একটী চামড়ার গোলাকার বল—একটী বড় নারিকেল অপেক্ষাও বড়। ঐ বলের উপরে চামড়া, কিন্তু ভিতরে রবারের থলি। এই থলিটীকে চামড়ার গোলাকার খোলে পুরিয়া বাতাস দিয়া থলিটীকে ফুলাইতে হয়। বেশ ফুলিয়া উপরের চামড়াটীতে সংলগ্ন হইলে, উহার মুখটী বন্ধ করিয়া দিলেই বলটী খেলিবার উপযুক্ত হয়। বলটীকে পায়ে করিয়া আঘাত করিলে অনায়াসেই খুব দূরে চলিয়া যায় এবং খুব উৰ্দ্ধেও উঠে।

ফুট্‌বল খেলিতে হইলে একটী সমতল জায়গা আবশ্যক। জায়গাটী ২০০ শত হাত হইতে ৪০০ হাত
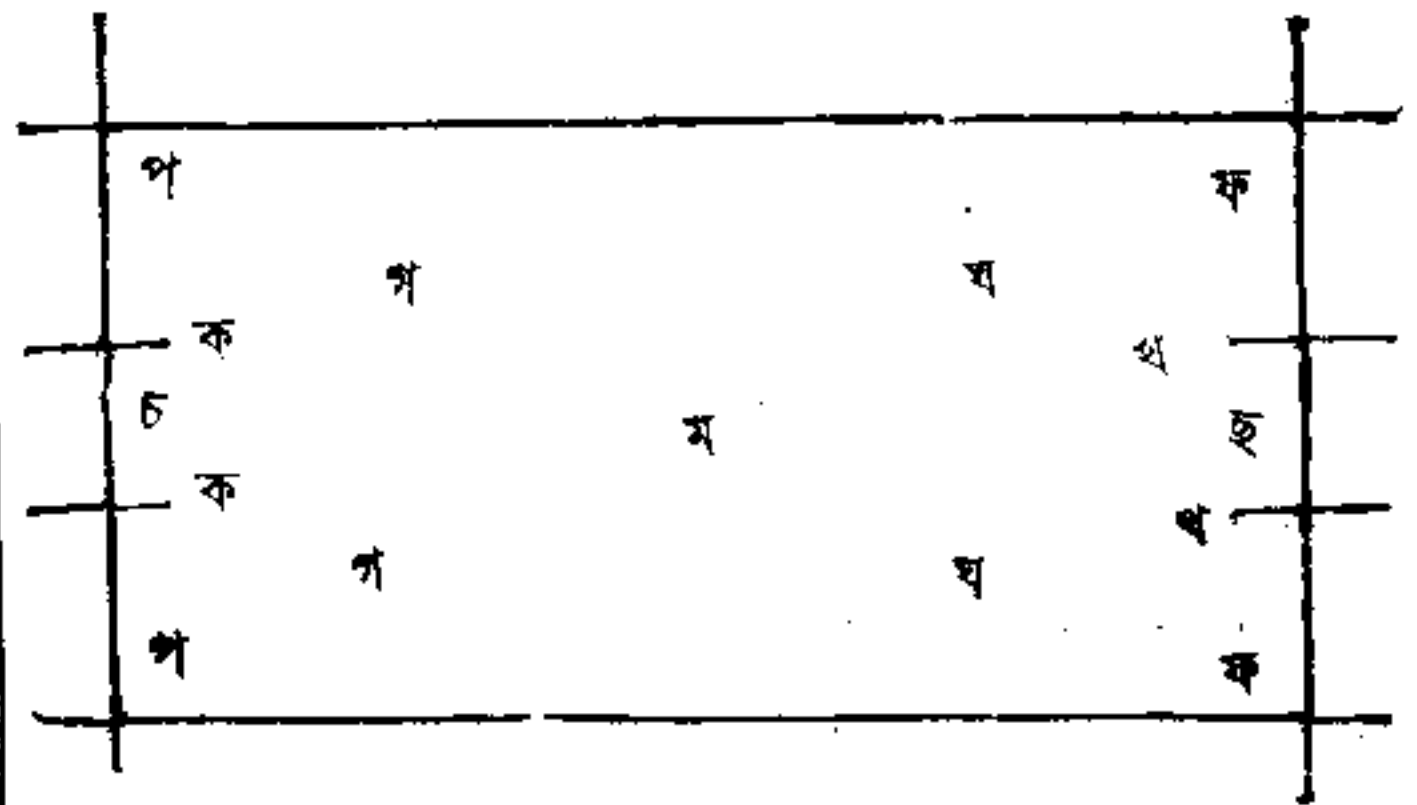
পর্য্যন্ত লম্বে এবং ১০০ হাত হইতে ২০০ হাত প্রস্থে হইবে। খেলিবার স্থানটীর চতুর্দ্দিকে দাগ দিয়া সীমাবদ্ধ করিতে হয়। এবং উভয় দিকের প্রস্থসীমার মধ্যস্থলে ষোল হাত পরিসরবিশিষ্ট এক একটী দরজা প্রস্তুত করিতে হয়। দুই পাশে দুই দুইটী পাঁচ বা সাড়ে পাঁচ হাত করিয়া উচু বাঁশ পুতিয়া এবং তাহাদের মাথায় একটী করিয়া বাঁশ আড় দিয়া অথবা দড়ি বাঁধিয়া দিয়াই এই দরজা প্রস্তুত হয়। ক্রীড়াভূমির একটী চিত্র দেওয়া গেল।

ইহার ক ক, ও খ খ সাড়ে পাঁচ হাত করিয়া উচু চারিটি খুঁটী। ম ক্রীড়াভূমির মধ্যস্থল। চ ও ছ দুই দিকের দুই জন দুর্গরক্ষকের (Goalkeeper) দাঁড়াইবার স্থান।

গ গ ও ঘ ঘ উভয় পক্ষের দুই জন করিয়া অগ্রবর্ত্তী রক্ষকের স্থান।

পূর্ব্বে যে এড়ো বাঁশের কথা বলিয়াছি, তাহা এই ক ক ও খ খ-খুঁটার উপরই দিতে হয়। ফুট্‌বল খেলায় দুই দিকে দুইটী পক্ষ থাকে। প্রতি দলে এগার জন করিয়া লোক হইলেই ভাল হয়; কম হইলেও ক্ষতি নাই। এক দলের লোক অপর দলের ক ক বা খ খ খোঁটার মাথার এড়ো বাঁশের নিম্ন দিয়া বলটী পার করিয়া দিলেই জয়লাভ হইল। এই খেলায় নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করিতে হয়ঃ—

১। ক ক ও খ খ তে দুই পক্ষের দুই জন অধ্যক্ষ থাকিবে।

২। অধ্যক্ষ ব্যতীত অপর কেহই বলটীকে হাত দিয়া ধরিতে পারিবে না। কেবল পা দিয়া আঘাত করিয়া খেলিতে হইবে।

৩। খেলা আরম্ভ করিবার সময় মধ্যস্থলে বলটী রাখিয়া একপক্ষ লাথি মারিবেন।

৪। সম্যক্‌রূপে দুর্গরক্ষা করিবার জন্য গ গ ও ঘ ঘ চিহ্নিত স্থানে নিজের নিজের দলের এক এক জন করিয়া রক্ষক রাখিলে ভাল হয়। রক্ষকগণ মধ্যস্থল অতিক্রম করিয়া অপর পক্ষের জমীতে দৌড়িয়া না গেলে, বলটী হঠাৎ দুর্গদ্বারের নিকটস্থ হইতে পারে না, সুতরাং নির্ব্বিঘ্নে বাহির হইয়া যাইবারও বড় ভয় থাকে না। গ গ ও ঘ ঘ স্থানের লোক উন্মত্ত হইয়া বলের সঙ্গে সঙ্গে অপরের সহিত দৌড়িয়া গেলে অনেক সময়ে হঠাৎ বলটী অরক্ষিত স্থানে আসিয়া পড়িতে পারে, এবং তাহা হইলে, একা দুর্গরক্ষক দুর্গদ্বার রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন।

৫। অধ্যক্ষ ব্যতীত কেহ বলটীতে হাত দিলে বা বলটী আসিয়া কাহারও কনুইয়ের নিম্নে হাতের যে কোন স্থানে লাগিয়া গেলে 'হ্যাণ্ড্‌বল' হওয়া বলে। হ্যাণ্ড্‌বল হইলে, যে পক্ষের হাতে লাগিবে, অপর পক্ষীয়েরা হ্যাণ্ড্‌বলের স্থান হইতে প্রতিপক্ষ দলকে ৪।৫ হাত সরাইয়া দিয়া ফুট্‌বলে পা দিয়া একটী আঘাত করিতে পারিবে। ক ক বা খ খ, যাহাকে দুর্গদ্বার বলা যাইতে পারে, তাহার সন্নিকটে হ্যাণ্ড্‌বল হইয়া এইরূপ লাথি মারিতে পাইবার সুযোগ হইলে জিত হইবার সম্ভাবনা হয় বলিয়া যাহাতে হ্যাণ্ড্‌বল না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

৬। খেলিবার সময় কেহ কাহাকেও হাতে করিয়া ঠেলিবে না, বা হাতে করিয়া ধরিয়া রাখিবে না; এরূপ করিলেও হ্যাণ্ড্‌বল হইবে।

৭। হ্যাণ্ড্‌বল হইলে, সকলকে তফাৎ করিয়া, বলে যে লাথি মারা হয়, তাহাতে যদি একেবারেই বলটী ক ক বা খ খ-র মধ্য দিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে জিত হইবে না। যে পক্ষেরই হউক অন্ততঃ আর এক জনের গায়ে ঠেকিয়া যাওয়া উচিত।

৮। এক দলের জমীতে বল থাকিলে সেই দলস্থ কোন খেলুড়েই জমীর মধ্যস্থল ছাড়াইয়া অপর পক্ষের জমীতে আসিতে পারিবে না।

৯। খেলিতে খেলিতে বলটী ক ক বা খ খ দরজার ভিতর দিয়া না গিয়া অন্য স্থান দিয়া বাহির হইয়া গেলে, উহাকে আউট্‌ (out) হওয়া বলে। এইরূপে, প ফ সীমানা দিয়া আউট্‌ হইলে, যে পক্ষের পায়ে বা গায়ে শেষে লাগিয়া বলটী সীমানা অতিক্রম করিবে, তাহার প্রতিপক্ষীয় একজন অতিক্রান্ত হইবার স্থান হইতে হাতে করিয়া বলটী ছুড়িয়া দিয়া খেলিবে। আর যদি প ফ সীমানা দিয়া আউট্‌ না হইয়া প প বা ফ ফ সীমারেখায় ঐরূপে অতিক্রম করে, তবে যে পক্ষের ঐ সীমানা তাহারাই যদি আউট্‌ করিয়া থাকে, তবে অপর পক্ষ প প বা ফ ফ-র কোণে বল রাখিয়া সকলকে সরাইয়া দিয়া, পায়ে করিয়া লাথি মারিতে পারিবে। আর অপর পক্ষীয়েরা খেলিতে খেলিতে প প বা ফ ফ সীমানা দিয়া বল আউট্‌ করিলে, যাহাদের ঐ সীমানা, তাহারা প প বা ফ ফ হইতে ৫ ফুট দূরে বল রাখিয়া লাথি মারিতে পারিবে।

১০। কোন পক্ষ হারিয়া গেলে দুর্গ বদ্‌লাইতে হয়, এবং পরাজিত পক্ষ মধ্যস্থান ম হইতে বলে লাথি মারিতে পারে।

১১। দুর্গরক্ষক বলে হাতও যেমন দিতে পারেন, পায়ে করিয়াও তেমনই আঘাত করিতে পারেন। তাহাতে দোষ হয় না।

ফুট্‌বল খেলার উপকারিতার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; কিন্তু ইহা সকলের পক্ষে হইয়া উঠে না।

কারণ একটী বল পাঁচ ছয় টাকার কম পাওয়া যায় না। খেলিবার সময় গোড়তুলা বা বুট জুতা পরিয়া খেলা করা উচিত; নচেৎ হুড়াহুড়িতে পায়ে ও নখে বিষম আঘাত লাগিতে পারে। এই খেলা জুতা ছিঁড়িবার যম। অনেক বালক আপন আপন পিতা মাতার অবস্থার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া খেলার চাঁদায় ও জুতা ছেঁড়ায় পিতামাতাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। অনেকে আবার অতি রৌদ্র বা বৃষ্টির সময় এই খেলায় উন্মত্ত হইয়া পীড়িত হয়। বিকালে রৌদ্রের তেজ কমিলে, বিস্তৃত মাঠে নিয়মিতরূপে এই খেলা খেলিলে, স্বাস্থ্যের বিলক্ষণ উপকার হয়। এই খেলা দেখায় দর্শকবৃন্দেরও বেশ আমোদ আছে।

আধা-আধি।

আধ্‌খানা তুমি খাও, আধ্‌খানা আমি খাই,
থাক্ ভাই তিনটা জমা,
যারা খেতে পায় নাই, তাহাদের দিব তাই,
কেমন?—কি বল মনোরমা?
আমরা ত কত পাই, আমরা ত কত খাই,
তবুও কি আমরাই খা'ব,
আহা, যারা খায় নাই, খেতে কভু পায় নাই,
তাহাদের পানে নাহি চা'ব?
কাল এক ভিখারিণী এসেছিল, তারে চিনি—
সেই মনো! কাটা যার হাতটা,
লোফালুফি কর্‌ছিলো, সে সময় নিয়ে ভুলো,
সন্দেশ ছটা কি সাতটা।
ছেলেটি তা দেখে তার, যেতে নাহি চায় আর,
মাঝে মাঝে চায় মার পানে,
শুকাইল মার মুখ, যেন তার বড় দুখ,
যেন তার বড় ব্যথা প্রাণে!
ভুলোয় সে ধীরে কয়,— "হোক্ বাপ জয় জয়,
ছেলেটিকে একটি দাও, বাপ",
"এই নে গো, নে মুলী!" ব'লে তুলে সবগুলি,
গালে ফেলে দিলে ভুলো গপ্‌গাপ্!

সবগুলো ভুলো খায়, ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চায়,
ছেলেটিও তার মুখ পানে,
উঃ, সে কি নীচ কাজ. দেখে বড় হ'ল লাজ,
বড় ব্যথা পাইলাম প্রাণে।
যারা খেতে পায় নাই, তাহাদেরই দিতে চাই,
কেমন?—কি বল, মনোরমা?—
আধ্‌খানা তুমি খাও, আধ্‌খানা আমি খাই,
থাক্ ভাই তিনটা জমা।

পূজাবাড়ী।

পূজাবাড়ীতে বড় জাঁক। থাকিয়া থাকিয়া বাজনা বাজিয়া উঠিতেছে, আর জাঁক যেন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে! ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের আজ কতই আনন্দ! আত্মীয় স্বজন যিনি যেথানে ছিলেন, সকলেই বাড়ী আসিয়াছেন,—তাঁহাদিগকে দেখিয়া, তাঁহাদের, সঙ্গে কথা কহিয়া কত সুখ! আবার বাবা, দাদা কাকা বিদেশ হইতে তাহাদের জন্য কত সুমিষ্ট ভোজ্য, সুন্দর বস্ত্রাদি আনিয়াছেন, সে সকল খাইয়া পরিয়াই বা কত আনন্দ! ঐ দেখ ছেলে মেয়েগুলি কেমন সুন্দর পোষাক পরিয়া সাজিয়া, এবং আপন আপন ছোট ছোট ভাই বোনগুলিকে সাজাইয়া সঙ্গে লইয়া আনন্দময়ীর প্রতিমা দেখিতে ছুটিয়াছে।

আনন্দময়ীর আগমনে দেশে আনন্দ ধরে না, তাই আজ অন্ধ, খঞ্জ, আতুরও কত আশা করিয়া তোমাদের আনন্দে আনন্দ মিশাইতে তোমাদের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তোমরা কি আপনাদের আনন্দে মত্ত থাকিয়া তাহাদিগের প্রতি একবার চাহিবারও অবকাশ পাইবে না? ঐ যে অন্নাভাবে ক্ষীণ, বস্ত্রাভাবে দীন, যত্নাভাবে মলিন,—ঐ যে রোগে পীড়িত, শোকে জর্জ্জরিত, দুঃখে বিড়ম্বিত, অথচ তোমাদেরই মত হস্তপদবিশিষ্ট কত মানুষ তোমাদের দিকে কাতরনেত্রে চাহিয়া একটু করুণা ভিক্ষা করিতেছে, তোমরা কি তাহাদের সে আশা পূর্ণ করিতে পারিবে না? আজিকার দিনেও কি তোমরা ক্ষুধার্ত্তকে কিঞ্চিৎ অন্ন, বস্ত্রার্থীকে একটু বস্ত্র, শোকার্ত্তকে দুইটি মিষ্ট কথা বলিয়া তুষ্ট করিতে পারিবে না? যদি তাহা না পার, তবে ত তোমাদের এ উৎসবই বৃথা—এ আনন্দই বৃথা!

দুষ্টদমন।

দুধারে পাহাড়ে ঢল, মাঝখানে স্থির জল,
দুষ্ট বেঙ থাকিত সে জলে,
মাঝে মাঝে লাফাইয়া, ডাঙ্গায় উঠিয়া গিয়া,
ভ্রমণ করিত কুতূহলে।
এক দিন তীরে উঠি, লাফাইয়া গুটি গুটি,
যেতে যেতে দেখিতে সে পায়,
ক্ষুদ্রকায় এক অতি, ইন্দুর আনন্দমতি,
সেইখানে খেলিয়া বেড়ায়।

করি' তাহা দরশন, ভাবে ভেক মনে মন,
"বাছাধন! বড় খুসি আজি,
যদি তোমা কোন ছলে, নিয়ে যেতে পারি জলে,
দেখি তবে হাবু-ডুবু বাজি।"
ইহা ভাবি' কাছে গিয়া, ইন্দুরের সম্বোধিয়া,
কহে বেঙ সুমধুরভাষে,—
"মিছে কেন ভাই ভাই, ভ্রমি মোরা ঠাঁই ঠাঁই,
বদ্ধ হই এস সখ্য-পাশে।
তুমি মূষ, আমি ভেক, আকারে উভয়ে এক,
ওজনেও হইব সমান,
এই মাঠে দুই জনে, ভ্রমিব আনন্দমনে,
গাইব আনন্দে সুখ-গান।"

ভেকের কথায় ভুলি' ইন্দুর দু হাত তুলি,
আলিঙ্গন করে আসি ভেকে,
ভেক বলে,—"এস ভাই, আজি বড় সুখ পাই,
পবিত্র এ মিত্র-ভাব দেখে।
কিন্তু এক কথা ভাই, ছাড়াছাড়ি নাহি চাই,
অন্তরেতে অভেদ যখন,
এক সূত্রে বদ্ধ হ'য়ে, মিত্রতার চিহ্ন ল'য়ে,
এস দোঁহে ভ্রমি কিছুক্ষণ।"
কহি হেন প্রিয় কথা, কুড়াইয়া ল'য়ে লতা,
কৌশলের মায়াজাল ফাঁদি',
ইঁদুরের সাথে ব্যাং, বাঁধিল নিজের ঠ্যাং,
মিত্রতার বড় বাঁধাবাঁধি।
এরূপে ইঁদুরটিকে ল'য়ে, ঘুরি চারি দিকে,
জলের নিকটে ক্রমে চলে,
ক্রমে আরো কাছে গিয়া, পড়ে জোরে লাফাইয়া,
তড়াক্ করিয়া বেঙ জলে।
হেসে বলে,—"মিত্রতার, বাঁধন কি চমৎকার,
এইবার বুঝ মিত্রবর!"

বলি' জোরে দেয় ডুব, ইঁদুরটি টুব টুব্
ভাসে ডোবে জলের উপর।
উপরেতে ছিল বাজ, প্রাণিহত্যা তার কাজ,
ছোঁ মেরে ইঁদুরে শূন্যে তোলে,
ভারি দেখে ফিরে চায়, অমনি দেখিতে পায়,
লতা-বাঁধা বেঙ নীচে ঝোলে!
মহা খুসি মনে বাজ, বলে,—"সুপ্রভাত আজ,
ভেকরাজ! চ ল মম বাসে,
ইঁদুরটি গেছে ম'রে, তুমি আছ প্রাণ ধ'রে,
মোর হাতে মুক্তিলাভ আশে।"
এই বলি' বাজ তাঁকে ল'য়ে বসে তরুশাখে,
চঞ্চু দিয়া উপাড়ে নয়ন,

তুলিয়া চারিটি ঠ্যাং, চিৎপাত হ'য়ে ব্যাং,
ভেক-লীলা করে সংবরণ।

অন্যে ফেলিবারে ফাঁদে, মন্ত্রণা যে করে,
জড়ায়ে নিজের ফাঁদে নিজেও সে মরে।

আত্মারাম সরকারের খেলা।
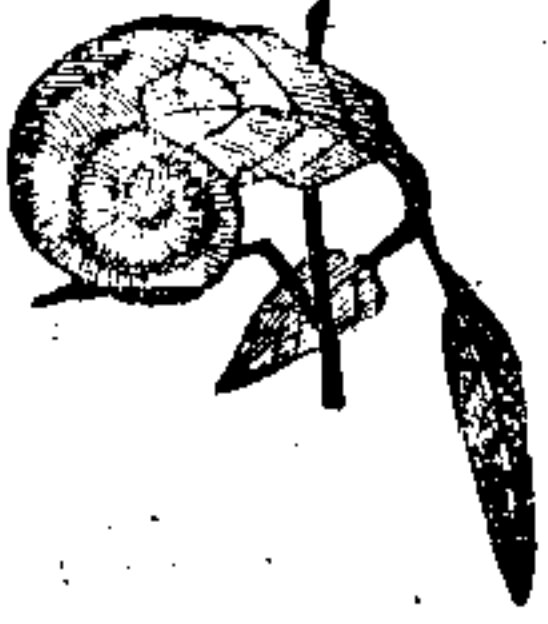
আত্মারাম সরকারের খেলা দেখায় কেমন মজা, বালক বালিকাগণ! তোমরা সকলেই তাহা জান। আমরা নীচে যে কয়টী কৌশলের কথা লিখিলাম, ইহা যত্নপূর্ব্বক সম্পন্ন করিতে পারিলে, পূজার সময় তোমরা নিজে নিজেই বন্ধু বান্ধবদিগকে আত্মারাম সরকারের খেলা দেখাইতে পারিবে।

১। একটী কড়াইকে দুইটী করা।

তোমার বন্ধুর বাম হাতের চেটোর উপর একটী মটর, ছোলা, অথবা মটর বা ছোলার মত ছোট একটী গোল জিনিস রাখিয়া দাও। তাহার পর তাঁহার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা—দুইটী অঙ্গুলি উহার উপর রাখিয়া উহাকে গড়াইতে থাক —স্পষ্টই বোধ হইবে একটী মাত্র কড়াই আছে। কিন্তু ঐ দুইটী অঙ্গুলির একটীকে আর একটীর উপর দিয়া বাঁকাইয়া, পার্শ্বের চিত্রের ন্যায় করিয়া, কড়াইটী নাড়িলে, ঠিক বোধ হইবে যে দুইটী কড়াই। তোমার বন্ধুর হস্তের উপর চাদর বা কাপড় চাপা দিয়া অথবা তাঁহাকে চক্ষু বুজিতে বলিয়া এইরূপ করিলে, তিনি বড়ই বিস্মিত হইবেন। যাই তিনি বলিবেন—“দুইটা”, অমনি চক্ষু চাহিতে বলিলে, তিনি দেখিবেন—একটী মাত্র!
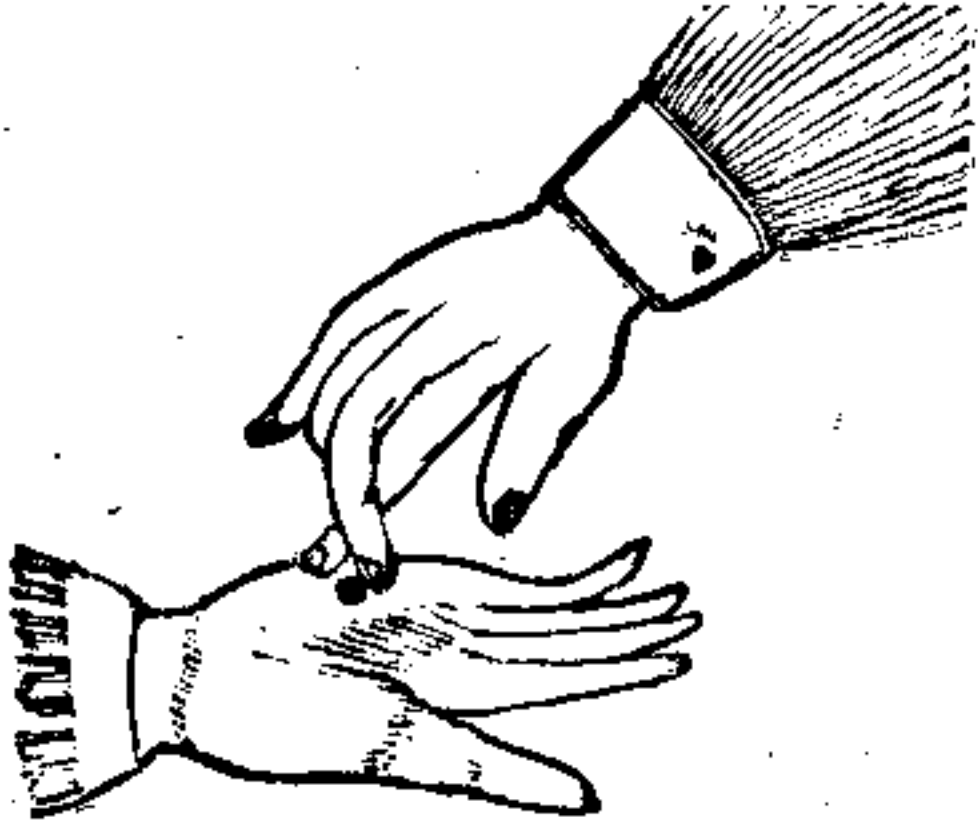
২। দুইটী বা তিনটী খড়িকাকে একটী করা।

ছোট ছোট ছুঁচের মত দুই তিনটী খড়িকা লইয়া কাছাকাছি ধরিয়া তোমার বন্ধুর পৃষ্ঠে ছোঁয়াইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর,—“কয়টী খড়িকা কাঠি দিয়া তোমার পিঠ ছুঁইয়া আছি, বল।” তিনি বলিবেন— “একটী”; কেন না তাঁহার একটী বলিয়াই বোধ হইবে। কিন্তু অপর সকলে দেখিবে, দুই বা তিনটী খড়িকাই বটে। গণ্ডদেশে ঐ ভাবে ছুঁইলে বুঝা যায় যে, দুইটী বা তিনটীই বটে। ইহার কারণ—শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ত্বকের স্পর্শানুভব-শক্তির তারতম্য আছে।

৩। কাচের গ্লাসে বেহালার শব্দ।

একটী কাচের গ্লাসের (পাতলা হইলেই ভাল হয়) কাচের উপর, অঙ্গুলি ভিজাইয়া মৃদুভাবে বুলাইলে, অতি মনোহর বেহালার মত শব্দ হইবে। গ্লাসে কিঞ্চিৎ জল দিলে শব্দের প্রভেদ হইবে এবং গ্লাসে ক্রমশঃ বেশী জল দিতে থাকিলে, তদনুসারে শব্দের গভীরতারও তারতম্য হইবে। গ্লাসের কানা যতই সরু হইবে, ততই মনোহর শব্দ বাহির হইবে। অনেক বেহালার শব্দ ইহার কাছে হার মানিয়া যায়।
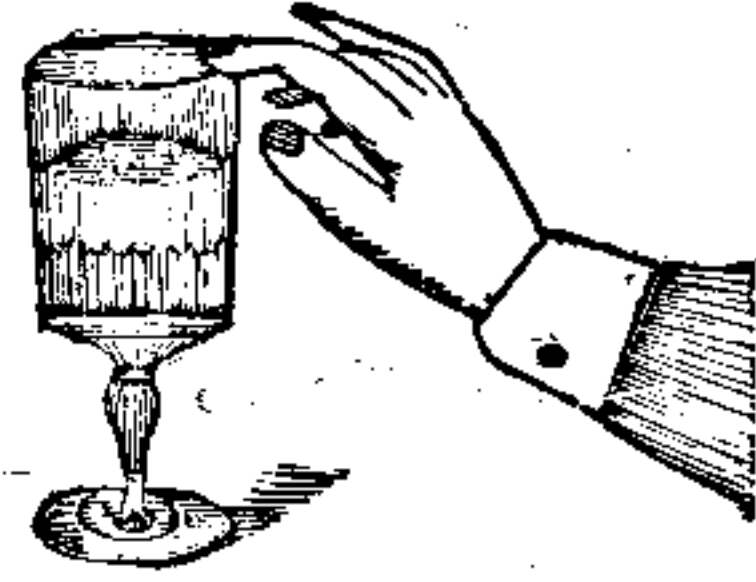
৪। তাসটী যায়, পয়সাটী থাকে।

একটী গ্লাসের উপর একখানি তাস রাখিয়া তাহার উপর একটী পয়সা রাখ। তাহার পর

তাসের এক পার্শ্বে খুব জোরে টুস্‌কি মারিয়া তাস খানিকে গ্লাসের মুখ হইতে ঠিক সোজাসুজি বাহির করিয়া দিতে পারিলে, পয়সাটী বাহিরে পড়িবে না—গ্লাসের মধ্যেই পড়িবে, কিন্তু তাসখানি আর এক জায়গায় গিয়া পড়িবে।—একটু বড় ছেলেরা, অর্থাৎ যাহাদের হাত বশ আছে, টুস্‌কিটীও সাবধানে একেবারে টুক্ করিয়া মারিতে পারে, তাহারা এই কৌতুকটী আবার আরও একটু বেশী রকম বিস্ময়জনক করিয়া ব্যবহার করিতে পারে। বাঁ হাতের তর্জ্জনীর উপর তাস-খানি সমান করিয়া বসাইয়া, আঙ্গুলটীর মাথা বরাবর তাসের উপর একটী টাকা বা পয়সা রাখিয়া, ঠিক সোজাসুজি জোরে টুস্‌কি মারিলে, দেখিতে পাইবে তাসখানি চলিয়া যাইবে—টাকা, বা পয়সাটি আঙ্গুলের মাথায় বসিয়া থাকিবে।
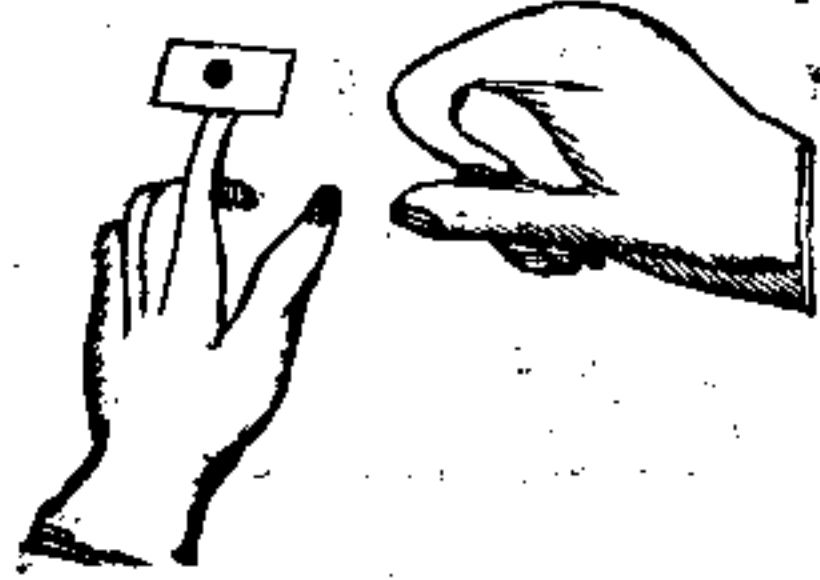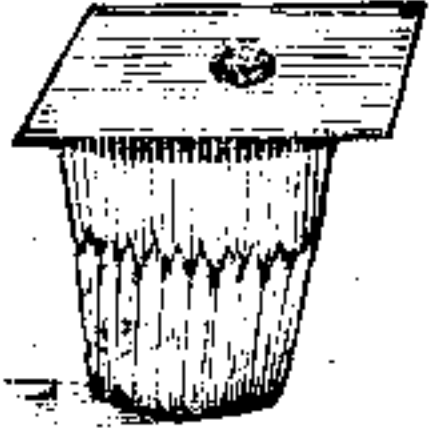
৫। মাঝের পয়সা সরিবে না—শেষেরটী সরিবে।

টেবিলের উপর সারি সারি গায়ে গায়ে ঠেকা-ঠেকি করিয়া চারি পাঁচটী পয়সা রাখ, এবং তোমার বন্ধুগণকে বল যেন পয়সাগুলি টিপিয়া ধরিয়া রাখেন। কেবল এক পার্শ্বের একটী পয়সা কেহ টিপিয়া না থাকে। যে পাশে এই পয়সাটী থাকিবে, তাহার বিপরীত পার্শ্বের পয়সাটীতে টুস্‌কি মারিলে বা পেনসিল দিয়া ঘা দিলে, অন্য পয়সাগুলি যদিও নড়িবে না, কিন্তু শেষের পয়সাটী সরিয়া যাইবে।
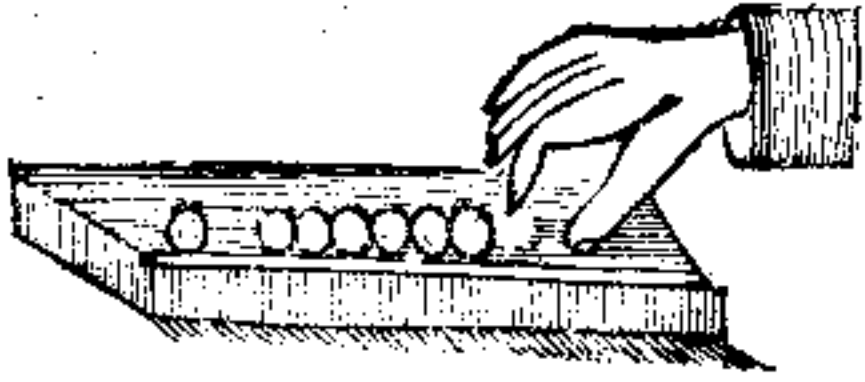
৬। একটী সলিতায় এক কাঁসী জল খায়।

একটী সলিতার আলোতে এক কাঁসী জল খাইয়া ফেলে শুনিয়াছ? আচ্ছা, এবার পূজার সময় বাড়ীতে বসিয়া এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখাইয়া তোমার বন্ধু-দিগকে চমৎকৃত করিও। ইহা বড়ই সহজ ও বড়ই আনন্দদায়ক। একটী ছোট মাটীর কলসী লও। তাহার পেটের ফাঁদটীর ভিতর এরূপ ভাবে একটী কাঠি লাগাইয়া দাও যে, কাঠিটী যেন পড়িয়া না যায়। এখন ঐ কাঠিটীর মধ্যদেশ হইতে নেকড়ার একটী মোটা পলিতা তেলে ভিজা-ইয়া ঝুলাইয়া দাও। তার পর একটী থালা বা কাঁসী জলপূর্ণ করিয়া, ঐ কলসীর ভিতরকার পলিতা দিয়াশালাই দ্বারা জ্বালাইয়া, কলসীটী জলপূর্ণ পাত্রের উপর বসাইয়া দাও। তৎক্ষণাৎ কাঁসী বা থালার সমস্ত জল ঐ কলসী শুষিয়া লইবে—এক বিন্দুও অবশিষ্ট থাকিবে না। কলসীটি উঠাইলেই কিন্তু হুস্ করিয়া আবার সব জল পড়িয়া যাইবে, তখন দেখিবে কলসীটীর ভিতরে জল লাগে নাই।—উপরে যেরূপ বলা হইল, ইহাতে কলসীটীতে কাঠি লাগাইতে, পলিতা ঝুলাইতে একটু ব্যাপার আছে। যদি এতটুকু ব্যাপার করিতে না চাও, তবে কেবল একখানি কাঁসীতে একটী টোটা বাতী বসাইয়া জ্বালিয়া দিয়া কাঁসীতে জল ঢালিয়া দাও, আর তাহার উপরে একটী কলসী উপুড় করিয়া বসাইয়া দাও; তাহা হইলেও, জল ঐরূপ উপরে উঠিবে। তবে কলসীটী কোথাও যেন ফাটা ফুটা না হয়, কানাটীতেও যেন ভাঙ্গা চুরা না থাকে দেখিয়া লইও।
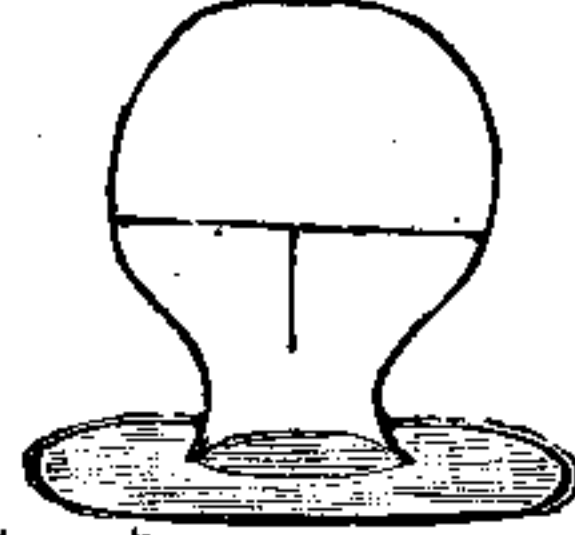
সোণামণির রাগ।

যায় রে যায় সোণামণি মামার বাড়ী যায়,
মায়ের উপর রাগ হ'য়েছে থাক্‌বে না হেথায়।
দিন রাত দুরন্তপনা ক'রে ক'রে ঘুর্‌বে সোণা,
বল্‌তে কিছু পাবে না ত তোমরা তবু তায়,—
যায় রে যায় সোণামণি মামার বাড়ী যায়।

যায় রে যায় সোণামণি মামার বাড়ী যায়,
পোষাক প'রে, পাল্কী চ'ড়ে সখের বেহারায়।
মামা মামী আদর ক'রে সোণায় তুলে নেবে ঘরে,
সোণার মুখে সকল শুনে ব'ক্‌বে কত মায়—
যায় রে যায় সোণামণি মামার বাড়ী যায়।

যায় রে যায় সোণামণি মামার বাড়ী যায়,
আয় সঙ্গে, কুনো বেরাল, যাবি যদি আয়।
মাছের মুড়ো দেবে তোরে, দুধ খাওয়াবে বাটী ভ'রে,
তুই বেড়াবি গরব ক'রে সোণামণির ছায়,—
যায় রে যায় সোণামণি মামার বাড়ী যায়।

ধাঁধা।

১। একটা বাতীর (চর্ব্বি বা মোমের) দুই মুখের পলিতা বাহির করিয়া দিয়া বাতিটির মধ্যস্থল স্থির কর। পরে ঐ মধ্যস্থলের দুই পাশে দুইটি ছুঁচ বা আলপিন বিদ্ধ কর। একটা কিছু লম্বা সরু ছুঁচ গরম করিয়া বাতির মধ্য দিয়া চালাইয়া দিলেও চলিতে পারে। এখন, দুইটি সমান উচু গেলাসের কানার উপর ঐ দুইটি ছুঁচ বসাইয়া দিলে বাতিটি সমতল থাকিবে। তার পর দুই দিকের পলিতা জ্বালিয়া দাও (চিত্র দেখ)। এখন বাতিটি ঢেঁকিকলের ন্যায় একবার এক দিক, পরে অন্য দিকে উঠিতে ও নামিতে থাকিবে। কিছুক্ষণ পরে এই উঠা নামার বেগ এত বেশী হইবে যে, বাতিটি প্রায় লম্বভাবে আসিয়া পঁহুছিবে।
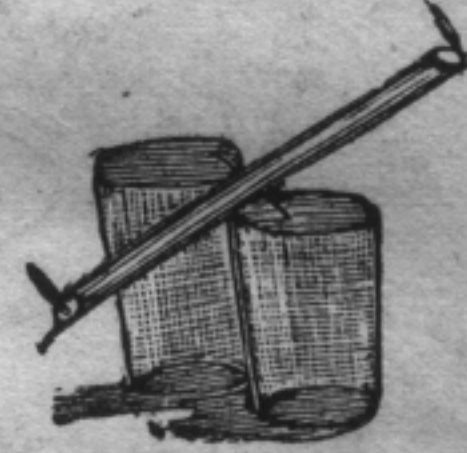
এরূপ হইবার কারণ বল।

২। এক ব্যক্তির, পাশের চিত্রের মত ঠিক চারি কোণা কতকটা জমি ছিল। জমিটিকে সমান চারি ভাগ করিয়া, এক ভাগ নিজের জন্য রাখিয়া বাকীটুকু চারিটি ছেলেকে এমন করিয়া ভাগ করিয়া দিল যে চারি ভাগই সমান ও দেখিতে একই আকারের হইল। কেমন করিয়া করিল দেখাও ত?
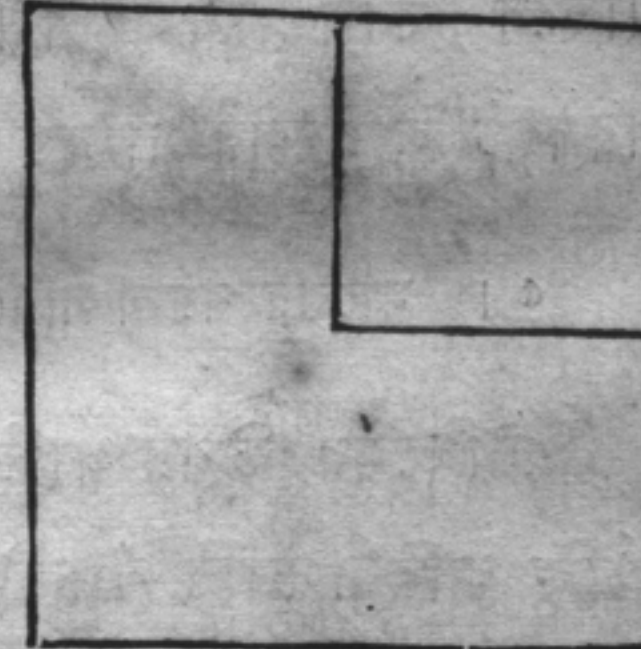
৩। নীচের যুক্তস্বর অক্ষরগুলিকে উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া বসাইতে পারিলে বেশ দুই ছত্র পদ্য হয়। পদ্যটি তোমরা বোধ হয় শুনিয়াছ। বলিতে পার পদ্যটি কি?

কুটিল পামর হাতি ফুল কানে সুখী
লিক লিক সরে বক বনপো সরাই

সখা
একাদশ ভাগ। ১১শ সংখ্যা।

নবেম্বর, ১৮৯৩।

বিবিধ।

মদ্যপান নিবারণের চেষ্টা।—জুনাগড়ের নবাব সাহেব আদেশ করিয়াছেন, তাঁহার রাজ্য মধ্যে কেহ মদ্যপান করিতে পারিবে না।

*
* *

দেশীয় দিয়াশলাই।—কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান্ ম্যাচ্ মানুফ্যাক্চারিং কোম্পানির কারখানা খোলা হইয়াছে। এই কোম্পানির দিয়াশলাই পয়সায় তিনটি করিয়া বিক্রয় হইতেছে। দেশীয় জিনিসের আদর বাড়িলেই দেশের শ্রীবৃদ্ধি।

*
* *

নূতন জলযান।—ইউরোপে এক প্রকার জলযান আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই জলযান জলের উপর দিয়া নয়—জলের ভিতর দিয়া চলিবে। ইহাতে চড়িয়া স্বচ্ছন্দে সমুদ্রতল হইতে রত্ন সংগ্রহ করা যাইবে। হাঁপাইতেও হইবে না, আর কিছুই নয়।

কুকুরের প্রভুভক্তি।—পঞ্জাবের অন্তর্গত ঝিলমে সম্প্রতি একটি লোকের কারাবাসের আদেশ হয়। ইহার একটি কুকুর ছিল। যখন লোকটিকে জেলে লইয়া যায়, কুকুরটিও সঙ্গে সঙ্গে গেল। কুকুরটিকে কিন্তু জেলের ভিতর প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না। তথাপি সে দ্বারের নিকট বসিয়া রহিল, তাড়াইলেও নড়িল না। এইরূপে পাঁচ ছয় দিন অনাহারে থাকিয়া কুকুরটি প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

*
* *

বড়লাটের পদ।—আমাদের বড়লাট আগামী শীত ঋতুতে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া বিলাত যাইবেন তোমরা জান। তাঁহার স্থানে লর্ড এল্‌গিন ভারতের বড়লাট হইয়া আসিতেছেন। ইঁহার প্রতিমূর্ত্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত আমরা স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম। এই পদ গ্রহণ করিবার জন্য ইঁহার পূর্ব্বে অপর কয়েক জনকেও অনুরোধ করা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা এত বড় একটি সম্মানের পদও স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে তিনজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সার এড্‌ওয়ার্ড্ গ্রে, ইহার বয়স ৩১ বৎসর মাত্র। দ্বিতীয়, লর্ড ক্রোমার, ইনি পূর্ব্বে ভারতবর্ষের রাজস্ব-সচিব ছিলেন। তৃতীয়, সার হেন্‌রি নরম্যান। ইঁহার কথা সেপ্টেম্বর মাসের সখায় লেখা হইয়াছে।

বিলাতে বাজি ছোড়া।

এ বছর কার্ত্তিক মাসে পূজার ছড়াছড়ি—আশ্বিন মাসের দুর্গাপূজা এবার কার্ত্তিক মাসে এসে পড়েছে, তা ছাড়া, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, ভাই-দ্বিতীয়া, কার্ত্তিকপূজা ত আছেই। তোমাদেরও সব স্কুলের বেশ তিন চারি সপ্তাহ করিয়া ছুটী—বড় আমোদ। বাড়ী বাড়ী ঠাকুর দেখে, নিমন্ত্রণ খেয়ে ছেলেরা সব অস্থির। তার উপর আবার—কার কি কাপড় হয়েছে, কার কেমন নূতন জুতা ও জরির জামা, কার টুপিতে কটা ফুল,—এই সব পোষাক মিলিয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তেই সময় চলে যায়। কিন্তু এত রকম আমোদ আহ্লাদ, যাত্রা, নিমন্ত্রণ ও পোষাক পরিচ্ছদের মধ্যে কিসে তোমাদের সকলের চেয়ে বেশী আমোদ হয় বল দেখি?

আমার মনে হইতেছে, ওই যেন অতুল বলিয়া উঠিল—"কেন ভাই-দ্বিতীয়ার দিনে—কেমন বড়দিদি আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রে, কত আদর ক'রে, নূতন কাপড় দেন, ছোট বোনটি, 'দাদা বোস, দাদা বোস, তোমায় ফোঁটা দি'—বোলে সাধাসাধি করে—আমার বড় আহ্লাদ হয়।"

অমূল্য বলিতেছে—"না, ভাই-ফোঁটার চেয়ে কার্ত্তিকপূজায় বেশী আমোদ। কেমন কার্ত্তিক ঠাকুর ঠিক আমাদেরই মত একজন ছেলে, আবার কেমন পাখাওয়ালা ময়ূরে ব'সে থাকে, হাতে তীরধনু, মাথায় পাগ্‌ড়ী—দেখে আমার দাদা বোলে ডাক্‌তে ইচ্ছা করে। আবার মা ব'লেছেন, কার্ত্তিক ছেলেবেলায় খুব ভাল ছেলে ছিল, মাকে বড় সম্মান কর্‌তো, আবার গায়েও খুব জোর ছিল, যুদ্ধ ক'রে কত রাক্ষসকে মেরে ফেলেছিল—সেই জন্য এখন সবাই কার্ত্তিকের পূজা করে।"

অমূল্য ঠিক বলিয়াছে। কার্ত্তিক বড় ভাল ছেলে ছিল বলিয়া লোকে এখন তাহাকে কত ভালবাসে; তোমরাও সকলে কার্ত্তিকের মত হইও—তা হ'লে তোমাদিগকেও এর পরে সবাই ভাল বেসে পূজা কর্‌বে। বাস্তবিক এ সকল উৎসবেও আনন্দ আছে বটে, কিন্তু এ সব ছাড়া কোন্ পূজায় তোমাদের এতই আমোদ হয় যে দিনরাত একদণ্ড বিশ্রাম থাকে না? সমস্ত দিন একবার বাড়ী, আর একবার দোকান ঘুরিয়া বেড়াও? কৈ, তোমরা ত বল্‌তে পার্‌লে না? তবে আমিই বলি—কালীপূজার দিনে—কেমন নয়? এখন ত তোমরা "হাঁ, ঠিক ব'লেছেন—আপনি ঠিক ব'লেছেন"—ব'লে নাচবেই।

কিন্তু কালীপূজার দিনে তোমাদের এত আহ্লাদ কেবল বাজি ছোড়ার জন্য। দুর্গাপূজার গোলমাল মিটিতে না মিটিতে ছেলেরা সব বাজি তৈয়ার করিতে ব্যস্ত হয়। কাচের গুঁড়া, লোহার চূর প্রভৃতির ছড়াছড়ি এবং বারুদ ইত্যাদির গন্ধে ত ছেলেদের পড়িবার ঘরে যাওয়া ভার। আবার দেওয়ালির দিন আসিতে না আসিতে দুম্‌দাম্ পট্‌পটাসের শব্দে দেশ একেবারে রৈ রৈ করে। বিলাতেও ঐ রকম বাজি-ছোড়ার জন্য একটি দিন আছে, তোমাদের এই সব পূজা ও আমোদের সময়, ইংরেজ বালকদের সেই আমোদের কথা আজ তোমাদিগকে বলিব।

খৃঃ ১৬০৫ অব্দে গাই ফক্‌স্ নামে একজন দুষ্ট লোক বিলাতের রাজা ও মন্ত্রীদিগকে মারিবার ইচ্ছায় পার্লামেণ্ট্ সভাগৃহের নীচে অনেক বারুদ লুকাইয়া রাখিয়াছিল, এবং ৫ই নবেম্বর তাহাতে

আগুন দিয়া রাজা ও মন্ত্রিগণ সহ পার্লামেণ্ট্ গৃহ উড়াইয়া দিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। এমন সময় ঐ গুপ্ত কাণ্ড প্রকাশ হওয়াতে সে ধরা পড়ে ও তাহার ফাঁসী হয়। সে আজ প্রায় তিন শ বছরের কথা। সেই দিন অবধি ৫ই নবেম্বর বিলাতে বাজি-ছোড়ার একটা উৎসব হইয়া থাকে। নবেম্বর মাসে আমাদের দেশের মত বিলাতেও খুব হিম পড়ে, আর সেখানে ঐ সময়ে কুয়াসা হইয়া বেলা ৮৷৯টা পর্য্যন্ত সব ঢাকা থাকে।

কিন্তু ভোর হইতে না হইতে ঐ দিন ছেলেরা সব জড় হ'য়ে রাস্তায় রাস্তায় গাই ফক্‌সের মূর্ত্তি বাহির করে ও বাড়ীতে বাড়ীতে দেখাইয়া পয়সা আদায় করে। তোমরা কেলুয়া ভুলুয়ার সঙ্ দেখেছ? বিলাতের ছেলেরা ঠিক সেই রকম করিয়া গাই ফক্‌স্ তৈয়ার করে। প্রথমে প্রকাণ্ড একটা খড় কিম্বা কাঠের পুতুল তৈয়ার করে, তার মুখে এক বাঁদরের মুখস দেয়, গায়ে একটা চটের জামা, ইজেরটা আলকাতরায় ছোবান কাপড়ের—তাও আবার ছেঁড়া কুটি কুটি, মাথায় একটা ভাঙ্গা টুপি, হাতে পায়ে কালী—দেখিলে হাসি থামান যায় না।

ছেলেরা সমস্ত দিন ঐ রকম গাই ফক্‌স্ নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, আর—

মনে কর, মনে কর,
পাঁচই নবেম্বর,
ভাব গাই ফক্‌সের আশা।
পার্লেমেণ্ট উড়াইতে
ওই দিন,—আগে হ'তে
তলা করে বারুদেতে ঠাসা।
শেষে, ঠিক প্রতিফল,
ফন্দি গেল রসাতল,
ধরা পোড়ে নিজেই হ'লো সারা;
তাই আজিকে তাকে নিয়ে
সকলকে তার কাজ জানিয়ে
সবাই মিলে ঘুরি পাড়া পাড়া।
হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে।

ইংরেজিতে এই গান গেয়ে পয়সা চায়। বড় মানুষের ছেলেরা অবশ্য নিজেরা গাই ফক্‌স্ নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় বেড়ায় না ও পয়সা চায় না; কিন্তু বাজি ছোড়াতে তাহাদেরই বেশী আমোদ। তোমরা সকলে যেমন কালীপূজায় বাজি কিনিতে, বাপ মার কাছ থেকে টাকা পয়সা পাও, তারাও সেই রকম পায়, আর পনর দিন আগে থেকে বাজি কিনিতে বা তৈয়ার করিতে আরম্ভ করে; পট্‌কা, তুবড়ি, ফুলঝুরি, দমা, দো-দমা, হাউই, বোমা, তারাবাজি, রং-মশাল কিছুই বাদ যায় না। কালীপূজার রাত্রির মত ঐ দিবস রাত্রিতেও বাজির ও আলোর চূড়ান্ত আমোদ। কলিকাতার ন্যায় বিলাতেও রাস্তায় বাজি ছোড়ার আইন নাই, সেই জন্য কোন ময়দান বা খোলা জায়গায় সকলে জড় হ'য়ে বাজি খেলে। ঐ রাত্রিতে বিলাতের অনেক বড় বড় বাড়ীতে ফুকো শিশি ও ফানুসের আলো দেয়। আলোক-মালা পরিয়া বাড়ীগুলি যেন হাসিতে থাকে; আবার আকাশের অন্ধকার তাড়াইয়া শূন্যে কত রকম বাজি ছুটিতে থাকে। এই রকম জাঁক জমকের মধ্যে ছেলেরা চারিদিকে আকাশে ফানুস ছেড়ে দেয়। আর ছেলেদের হাসি ও হাত-তালির হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে ও বাজি-ছোড়ার দুম্‌দাম্ আওয়াজে সমস্ত দেশ তোলপাড় করিতে থাকে।

চল, আমরা বেড়াতে যাই।

মাতা ডাকিলেন,—"ও মিনি, একবার এই দিকে আয় তো; আমি খোকাকে নিয়ে কোন কাজই কর্‌তে পার্‌ছি না—সব ভেঙ্গে চুরে ফেল্লে।"

মৃণালিণীর মাতা সংসারে একা। গৃহকার্য্যের সাহায্য করিবার কেহই নাই। মৃণালিণীর সবে মাত্র দশ বৎসর বয়স। সে বড় চঞ্চল। কোথায়ও দশ মিনিট স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। চঞ্চল হইলেও তাহার স্বভাবটী বড় মিষ্ট, পাড়ার সকল ছেলে মেয়েরা তাহাকে বড় ভাল বাসে। সর্ব্বদাই ছেলে মেয়েরা তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আমোদ আহ্লাদ করে। আবার গৃহকার্য্যে, যতদূর তাহার ক্ষুদ্র ক্ষমতায় কুলায়, সে মাতার ততটুকু সাহায্য করিয়া থাকে।

মৃণালিণী রমেশদের ঘরের বারান্দায় বসিয়া অন্যান্য ছেলে মেয়েদের সঙ্গে পূজার 'সখা' পড়িতেছিল, আর সকলে হাসিয়া কুটিকুটি হইতেছিল; এমন সময় মাতার ডাক কাণে গেল। অমনি সে ছুটিয়া গিয়া মাতার নিকট উপস্থিত হইল, এবং দেখিল, চারি দিকে নুন ছড়ান, আর খোকাবাবুর হাতে তেল লাগিয়া রহিয়াছে।

মৃণালিণী ডাকিল—"খোকা, এস ত ভাই বেড়াতে যাই।" সকলেই মিষ্ট স্বভাব ভাল বাসে। খোকাবাবুও দিদিকে বড় ভাল বাসিত। দিদির ডাক শুনিবামাত্র তাহার কাঁধে গিয়া উঠিল। দিদি খোকামণির মুখ হাত বেশ করিয়া পরিষ্কার করিয়া দিল। তার পর ভাই বোনে বেড়াইতে চলিল। মাতাও খোকাবাবুর হাত হইতে রক্ষা পাইলেন।

জীবন সর্দ্দার।

বাজিতপুর বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। জঙ্গলিয়া দেশে বাঘ ভালুকেরই ভয় হইয়া থাকে, কিন্তু বাজিতপুরে মানুষেরই ভয় ছিল। জীবন সর্দ্দার বড় বিখ্যাত ডাকাইত—তাহার অনেক সহচর—সে কাহাকেও ভয় করিত না—চিঠি লিখিয়া সকলকে জানাইয়া লোকের বাড়ী ডাকাইতি করিত। প্রাণে দয়া মমতার লেশমাত্র ছিল না—বড় নিষ্ঠুর বলিয়া লোকে তাহাকে বাঘ ভালুক অপেক্ষা ভয় করিত। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ চিঠি লিখিয়া কি আবার ডাকাইতি করা চলে? এখন সেইরূপই মনে হয় বটে, কিন্তু আগে এমন চলিত। অনেক দিনের কথা, তখন দেশে পুলিস পাহারার এমন বন্দোবস্ত ছিল না, সুতরাং পূর্ব্বে জানিতে পারিলেও, লোকে অনেক সময় ডাকাইতদিগের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইত না।

২

সোণারপুরের বসু-বংশ অতি পুরাতন ও ধনাঢ্য বংশ। তাঁহাদের বিস্তৃত জমিদারী, বাড়ীখানিও প্রকাণ্ড। দ্বারে বিশ পঁচিশজন দরওয়ান, এ ছাড়া অনেক পাইকও আছে, প্রভুত্বের সহিত বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন চলিয়া যায়। হঠাৎ একদিন বাবুর নামে একখানি পত্র আসিল। পত্রের মর্ম্ম মুহূর্ত্ত মধ্যে গ্রামময় রাষ্ট হইয়া পড়িল। পত্রখানি জীবন সর্দ্দার পাঠাইয়াছিল। পত্রে লেখা ছিল যে, সে যদি পনের দিনের ভিতর একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাঁচ হাজার টাকা না পায়, তাহা হইলে সোণারপুরের জমিদারদের বাড়ী আসিয়া টাকাকড়ি সমস্ত লুঠিয়া লইয়া যাইবে।

এ সংবাদ গ্রামে রাষ্ট হইলে গ্রামের লোক ভীত ও ত্রস্ত হইল। জীবন সর্দ্দারের নাম কে না শুনিয়াছে? সে নাম অতি ভয়ানক। গ্রামের সকলে ভীত হইল বটে, কিন্তু যাঁহাকে এ পত্র লেখা হইয়াছিল, তাঁহার মনে উদ্বেগ আসিলেও, ভয় জন্মে নাই। তাঁহার মাহিনা-করা সুশিক্ষিত শত লাঠিয়াল, সড়কিওয়ালা, দরওয়ান, পাইক রহিয়াছে, নিজের শরীরেও প্রচুর বল—তাঁহার ভয় হইবে কেন? তিনি হুকুম দিলেন,—ডাকাইত আসে আসুক, আমার লাঠিয়াল, সড়কিওয়ালা সকলে যেন সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত থাকে।

৩

বাবুদের বাড়ী জগদ্ধাত্রী পূজা—মহাসমারোহ। রাত্রি দুই প্রহরের সময় চারি দিকে গোলমাল উঠিল। সকলে বুঝিল, ডাকাইত পড়িয়াছে। যে যেখানে পারিল, পলাইল—ডাকাইতেরা বড় লক্ষ্য করিল না; লুণ্ঠনই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য, তাহারা বাড়ী লুঠিতে লাগিল। ডাকাইতেরা যত আশা করিয়াছিল, তাহা না পাইয়া বড়ই বিরক্ত হইল এবং ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিতে লাগিল।

উপক্রমে কিন্তু একটু বিলম্ব আসিয়া জুটিল। বাড়ীর সকলেই পলাইয়াছিল, কেবল একজন পারে নাই। সে বাবুর কন্যা—বয়স নয় বৎসর মাত্র—নাম লাবণ্যময়ী। লাবণ্যময়ী যথার্থই লাবণ্যের আধার। বালিকার সে মুখখানি দেখিলে কেহই তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। পাড়ার লোকের, বাড়ীর লোকের, সে বড় আদরের সামগ্রী ছিল। ডাকাইত পড়িলে সকলে যখন পলায়, তখন সে ঘুমাইয়াছিল। পরে গোলমাল শুনিয়া উঠিয়া আসে। তাহার মাতা তাহার আগেই গোলমাল শুনিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন, ফিরিয়া গিয়া তাহাকে বিছানায় না দেখিয়া কন্যা পলাইয়াছে ভাবিয়া চলিয়া যান। এইজন্য সে একলা রহিয়া গিয়াছে।

টাকা কড়ি বিশেষ কিছু না পাইয়া দস্যুদল ফিরিতেছিল, এমন সময় দেখিল প্রতিমার পুত্তলিকার ন্যায় সুন্দরী একটি বালিকা উঠানে দাঁড়াইয়া আছে। মনের মত টাকা কড়ি না পাইয়া, ডাকাইতেরা ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। এখন বালিকাকে দেখিয়া একজন দস্যু গিয়া তাহাকে ধরিল। ইচ্ছা, আছাড় দিয়া বালিকার মস্তকচূর্ণ করিবে। বালিকা বলিল,—"আমায় মেরো না, আমি চ'লে যাচ্চি, আমায় তোমরা ছেড়ে দাও।" সে মর্ম্মভেদী কাতরস্বর শুনিয়াও, কাহারও দয়া হইল না—নির্দ্দয় মানুষ সিংহ ব্যাঘ্র অপেক্ষা হিংস্রক। পাষাণহৃদয় দস্যু বালিকার পদদ্বয় ধরিয়া ঊর্দ্ধে উঠাইল—বালিকা এবার কাঁদিয়া বলিল,—"মা গো! বাবা গো! তোমরা কোথায়! আমায় যে মেরে ফেল্লে গো!" এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে হাঁকিল,—"খবরদার, প্রহ্লাদ!"

পশ্চাৎ হইতে যে কথা কহিল সে দস্যুপতি জীবন সর্দ্দার। যে, বালিকাকে মারিতে চাহিয়াছিল, তাহার নাম প্রহ্লাদ। নিষেধ শুনিয়া প্রহ্লাদ বুঝিল, দস্যুপতি কথা কহিয়াছে। সে ধীরে ধীরে বালিকাকে নামাইয়া দিল; তার পর বলিল, "অনেক লাভ হইবে লোভ দেখাইয়া আমাদের এখানে আনিলে, কিন্তু কি লাভ হইল বল? এই কয়টা টাকা, আর এই কয়খানা গহনা মাত্র! ইহার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অতি সামান্য। কথামত টাকা দেয় নাই সে জন্য তাহার কি শাস্তি হইল? তাহার এই একটি মেয়ে, এই মেয়েটিকে এখন মারিয়া ফেলিলেই তাহার কাজের উপযুক্ত দণ্ড হয়।"

জীবন সর্দ্দার তাহার কথার প্রত্যুত্তরে, কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় পিছন হইতে একটা সড়কি আসিয়া প্রহ্লাদের মাথায় লাগিল—প্রহ্লাদ পড়িয়া মরিয়া গেল। আর একটা সড়কি জীবন সর্দ্দারের বাহুতে লাগিল, সে আহত হইয়া ভূমিতে পড়িল। সড়কি, বাবুর সড়কিওয়ালাদের পক্ষ হইতে ছোড়া হইয়াছিল। সর্দ্দার পড়িল দেখিয়া, দস্যুরা ভয় পাইল এবং শীঘ্রই যে দিকে যে পারিল, পলাইয়া গেল।

৪

জীবন সর্দ্দার পড়িয়া গেলে, বালিকা তাহার পার্শ্বে আসিয়া বসিল। মনে মনে সে বুঝিয়াছিল, জীবনই তাহার জীবনরক্ষক। মুহূর্ত্ত মধ্যেই বাড়ী লোক জনে ভরিয়া গেল। তাহারা দেখিল জীবন আহত হইয়া পড়িয়া আছে, তাহার পাশে তাহাদের বাবুর মেয়ে বসিয়া রহিয়াছে। তাহারা জীবনকে দেখিয়াই ডাকাইত বলিয়া চিনিল, কিন্তু আর কিছু বুঝিতে পারিল না। একজন লাঠিয়াল পরীক্ষা করিয়া দেখিল জীবন তখনও মরে নাই, তখন সে জীবনের জীবনটুকু শেষ করিবার জন্য লাঠি তুলিবার উদ্যোগ করিল। কন্যাটি মানা করিল। কন্যার বারণ শুনিয়া সে একটু ইতস্ততঃ করিলেও অন্য একজন লাঠি উঠাইল। বালিকা তাহা দেখিয়া আপনি জীবনের উপর গিয়া পড়িল—আশা, নিজের ক্ষুদ্র দেহটুকু দিয়া জীবনের দেহ আচ্ছাদিত করিবে। বালিকার এই ব্যবহার দেখিয়া সে ব্যক্তি বলিল,—"তুমি, মা, সরিয়া যাও—ও ডাকাত—বাঁচিয়া উঠিলে আমাদের সকলকে মারিয়া ফেলিবে।" বালিকা উত্তর করিল,—"তোমরা সরিয়া যাও, এ কখনও কাহাকেও মারে না।" এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে বলিল,—"কি লাবণ্য?" সকলে ফিরিয়া দেখিল—বাবু।

৫

জীবন সর্দ্দার কন্যার প্রাণরক্ষা করিয়াছে, বাবুও যথারীতি চিকিৎসায় জীবনের প্রাণরক্ষা করিলেন। জীবন সারিয়া উঠিল। কিন্তু এখন আর সে দস্যু নয়। তাহাকে যখন মারিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল, তখন বালিকা কিরূপে তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল তাহা সে শুনিয়াছিল। সেই দিন হইতে তাহার জীবন-স্রোত ভিন্ন দিকে ফিরিল। জীবন সর্দ্দার এখন বাবুর বাড়ীর প্রধান পাইক। জীবন সর্দ্দারকে হারাইয়া দস্যুরা এখন জয়রাম সর্দ্দার নামে অপর এক জনকে দলপতি করিয়াছে। তাহারা এখনও খুব ডাকাইতি করে। জীবন সর্দ্দারের নামে যেমন সকলে কাঁপিত, জয়রামের নামেও তেমনই সকলে কাঁপে। একদিন লাবণ্যময়ী জীবনকে বলিয়াছিল,—"ওদের ধরাইয়া দাও না?" জীবন ইহার প্রত্যুত্তরে কি বলিয়াছিল সে সমস্ত ঠিক জানি না, তবে শুনিয়াছি সে একথা বলিয়াছিল যে, যে দিন ইহারা তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে আসিবে, সেই দিন দলশুদ্ধ নিপাত করিব।"

৬

আবার জগদ্ধাত্রী পূজা আসিয়াছে। বাড়ীতে আমোদ আহ্লাদ। আজ কিন্তু কেহ জীবনকে দেখিতে পাইতেছে না। জীবন এখন সকলেরই প্রিয় হইয়াছিল। কর্ত্তা ডাকেন—"জীবন!" গৃহিণী ডাকেন,—"জীবন!" লাবণ্যময়ী ডাকে "ছেলে!"—আজ জীবন কাহারও কথায় উত্তর দিতেছে না—আজ সে কোথায় গিয়াছে কেহ জানে না। রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় আবার আজ গোলমাল উঠিল—"ডাকাইত আসিতেছে।" আলোকমালায় প্রান্তর আলোকিত করিয়া দস্যুদল আসিতেছে দেখা গেল। বাড়ীর অনেকেই বলিল,—"জীবনেরই দল। ভাল মানুষের মত ভৃত্য থাকিয়া, সব সন্ধান জানিয়া আজ সে-ই আবার দল গুছাইয়া ডাকাইতি করিতে আসিতেছে, সেই জন্যই সন্ধ্যা হইতে তাহার দেখা নাই।" কথাটা সকলেই শুনিল, এবং কর্ত্তা, গিন্নী ও লাবণ্য ব্যতীত সকলেই বিশ্বাস করিল। মহা গোলমাল হইল; দরওয়ান, পাইক সকলে পলাইবার উদ্যোগ দেখিতে লাগিল। কর্ত্তা বলিলেন,—"কেহ পলাইও না—লড়াই কর।" সকলে প্রস্তুত হইল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, এক একটি করিয়া আলো ভূমিতে পড়িতেছে। আবার একটু পরেই দস্যুদল ছত্রভঙ্গ হইয়া মাঠের চারি দিকে দৌড়িতে লাগিল। ইহার মর্ম্ম কিন্তু কেহ কিছু বুঝিল না। রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় জীবন আসিতেছে, আর একজন মানুষকে ধরিয়া আনিতেছে। যাহাকে ধরিয়া আনিতেছে, সে জয়রাম—দস্যুদলের নেতা। এখন সকলে বুঝিল, আজ দস্যুহস্ত হইতে জীবনই সকলকে রক্ষা করিয়াছে। জীবন, জয়রামকে অনেক বুঝাইয়া, তাহাকে কি প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল, এবং পরিশেষে বাবুর অনুমতি লইয়া স্বেচ্ছাক্রমে তাহাকে নিজের পূর্ব্বার্জ্জিত অর্থ দিয়া ছাড়িয়া দিল। জয়রাম স্বীকার করিল আর দস্যুতা করিবে না। জীবনকে সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

৭

জীবন কিন্তু আর বাবুর বাড়ীতে থাকিতে চাহিল না। বাড়ীর লোকেরা তাহাকে দেখিতে না পাইয়া সন্দেহ করিয়াছিল, এ কথাও সে শুনিয়াছিল এবং সেই অবধিই তাহার মনে কি একটা চিন্তা আসিয়া জুটিল। সে এক দিন লাবণ্যময়ীকে বলিল,—"মা, আমি যাই, আমার কাজ ত ফুরাইয়াছে।" লাবণ্য বলিল,—"কোথা যাইবে? আমি তোমার মা, মাকে ছেড়ে কোথা যাবে?" জীবন বলিল,—"মা, আমি দস্যু ছিলাম, এ কলঙ্ক আমার ঘুচিবে না; এখন এ নাম শুনিলে আমারই লজ্জা হয়—লোকালয়ে মুখ দেখাইতে ইচ্ছা হয় না।" লাবণ্যময়ী অনেক বুঝাইলেন। লাবণ্যময়ীর পিতা মাতাও লাবণ্যময়ীর মুখে সকল শুনিয়া জীবনকে অনেক মিষ্ট কথায় বুঝাইলেন। জীবন ইহাতে বড় কিছু উত্তর করিল না। কিন্তু তাহার পর দিন হইতে আর জীবনকে বাবুর বাড়ীতে কেহ দেখিল না।

বিড়াল-বংশ।

সুরবালা বিড়াল বড় ভালবাসে। তাহার একটি বিড়ালী আছে। তাহাকে খাওয়াইতে ও আদর করিতেই সুরবালার প্রায় সমস্ত সময় যায়। বিড়ালীটির গায়ে হাত দিবার কাহারও যো নাই। হাত দিলে সুরবালা মহা অনর্থ ঘটাইয়া

বসে। বিড়ালীটি ভাল খাইতে পাইয়া বেশ ফুলিয়া উঠিয়াছে।

বিড়ালের এত আদর কেন? আমাদের উপকার করা দূরে থাকুক, বিড়ালের জ্বালায় দুধ মাছ লইয়া সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়। বিড়ালের স্বভাব বড়ই মন্দ। রীতিমত আহার পাইলেও খোলা দুধের বাটীতে মুখ দিয়া এক চুমুক খাইবেই খাইবে। অনেকে বলে, বাড়ীতে বিড়াল থাকিলে ইন্দুর থাকিতে পারে না। বিড়াল শিকারি জন্তু, ইহার দাঁত, নখ, থাবা ও মুখের শ্রী দেখিলেই বোধ হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী বধ করিয়া তাহাদের মাংস খাওয়াই ইহাদেরর স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু আমি দেখিয়াছি, উত্তম আহার পাইলে, বিড়াল ইন্দুরাদি জন্তুর লোভ ত্যাগ করে। এটি পোষমানার দোষ। বাড়ীতে রাখিয়া আহার যোগাইয়া, আমাদের সঙ্গে মিশিতে দিয়া, আমরা বিড়ালের অনেকগুলি স্বভাব বদলাইয়া দিয়াছি। এখন জ্ঞাতিগণের নিকট উহারা মুখ দেখাইতে লজ্জা বোধ করে।
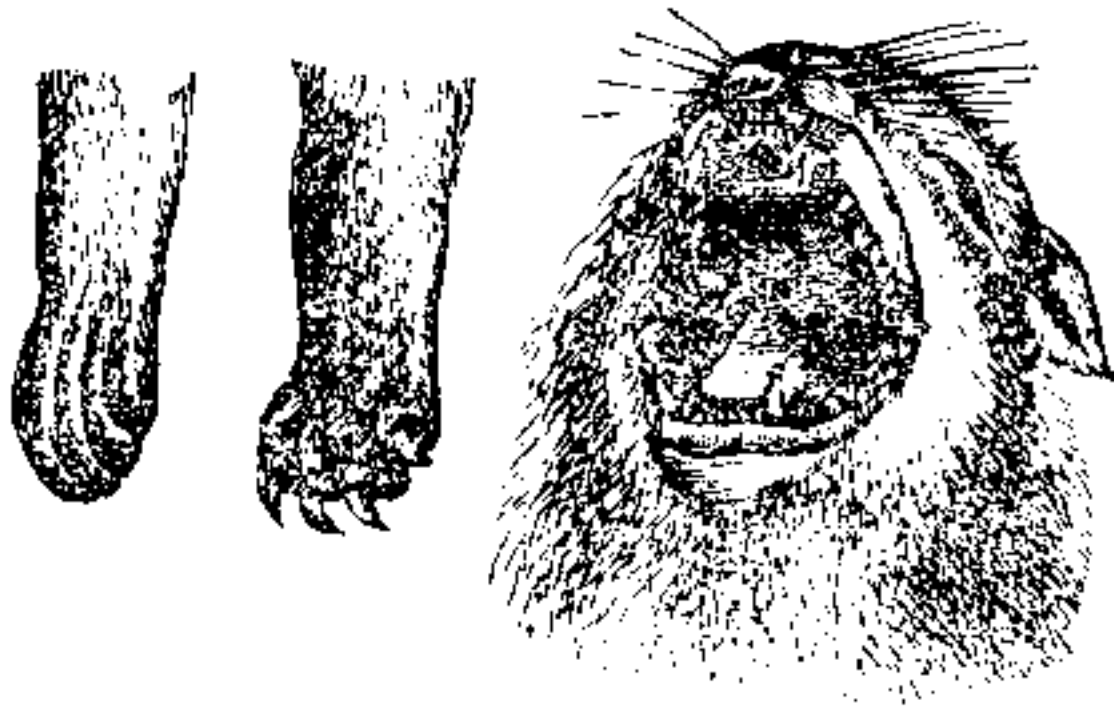
আমাদের পোষা বিড়ালের বাপ পিতামহ জঙ্গলে বাস করে। এজন্য তাহাদের নাম "বনবিড়াল" হইয়াছে। কোন কোন স্থানে বনবিড়ালকে "কটাস" বলে। পোষা বিড়াল অপেক্ষা বনবিড়ালের আকার কিছু বড়। গায়ের বর্ণ পাঁশুটে, লেজটি ছোট। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ইহার বাস। গ্রামে লম্বা তৃণময় স্থানে, ধান ও আকের ক্ষেতে কটাস বাস করে। ছোট ছোট পাখীই ইহার প্রধান খাদ্য।

কটাসের ন্যায় "মেছো বিড়াল" আমাদের পোষা বিড়ালের অতি নিকট-জ্ঞাতি। ইহা "উদ্‌বিড়াল" নহে। উদ্‌বিড়ালের পায়ের আঙ্গুল হাঁসের আঙ্গুলের মত জোড়া। মেছো বিড়াল কেবল মাছ খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। ইহার পরাক্রম কম নহে। মেছো বিড়াল না কি ছোট ছোট ছাগল মারিয়া খায়। শামুক ঝিনুকও ইহার খাদ্য। আহারের সুবিধার জন্য মেছো বিড়াল খাল বিল নদীর ধারে গাছের ঝোপে বাস করে। ইহাদের গায়ের লোম সকল কর্কশ ও চাকচিক্য-শূন্য। মাটির রঙের মত গায়ের রঙ। তাহার মধ্যে মধ্যে কালো কালো দাগ।

কটাস ও মেছো বিড়াল ব্যতীত আরও কয়েক রকম বিড়াল আছে। তাহাদিগকে বঙ্গদেশে সচরাচর দেখা যায় না। ইহাদের মধ্যে "চিতা বিড়াল" প্রধান। ইহারা বনে বাস করে।

চিতা বিড়াল লম্বা চৌড়ায় প্রায় পোষা বিড়ালেরই মত। কিন্তু পাগুলি কিছু বেশী লম্বা এবং কাণ দুটির উপর দিকটা গোল। গায়ের রঙ পাঁশুটে। সমুদায় গায়ে, পায়ে, লেজে কালো কালো দাগ আছে। কপালে চারিটা রেখা আছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই চিতা বিড়াল আছে। ইহারা বনের মধ্যে ছোট ছোট পাখী ও চতুষ্পদ জন্তু ধরিয়া খায়। ইহাদিগকে পোষমানান বড় কঠিন। বাস্তবিক দূর হইতে দেখিলে ইহাদিগকে এক একটি ছোট চিতা বাঘের মত দেখায়।

বাস্তবিক, চিতা বাঘ চিতা বিড়ালের নিকট-জ্ঞাতি। বিড়াল অপেক্ষা চিতা বাঘ অনেক বড়। লেজ ছাড়িয়া মাপ করিলে, বড় চিতা বাঘ তিন হাত লম্বা দেখা যায়। স্থানবিশেষে চিতা বাঘেরও

কিছু কিছু প্রভেদ ঘটিয়াছে। এক রকম চিতা বাঘের সর্ব্বাঙ্গ কালো। চিতা বাঘ অনায়াসে গাছে চড়ে। গ্রামের নিকটবর্ত্তী ছোট ছোট জঙ্গলে চিতা বাঘ প্রায়ই দেখা যায়। রাত্রিকালে গ্রামে প্রবেশ করিয়া ছাগল, ভেড়া কুকুর ধরিয়া লইয়া যায়। বড় চিতা বাঘ গরু পর্য্যন্ত মারিতে পারে। চিতা বাঘ পোষমানান সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন।

চিতাবাঘের পরই বড় বাঘ। বড় বাঘ বড়ই ভয়ানক জন্তু। ইহার নিকট কোন জন্তুরই পরিত্রাণ নাই। ইহা বড় বড় হরিণ, ভালুক, গোরু, মহিষ প্রভৃতি অনায়াসে বধ করে। মানুষকে বাঘ ভয় করে, কিন্তু একবার মানুষ মারিলে, ইহার মানুষ খাইবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে। তখন এই বাঘকে "মানুষখেগো" বলা যায়। বড় বাঘের কাণের পশ্চাৎ দিকে গলার পাশের লোমগুলি কিছু বেশী লম্বা। লেজের শেষে লোমপুচ্ছ নাই। গায়ের রঙ্গ, ঈষৎ লালের সহিত হরিদ্রা মিশান। মস্তক ও শরীরে আড়াআড়ি ভাবে কালো কালো লম্বা দাগ আছে। এই বাঘ এক একটা পাঁচ ছয় হাত লম্বা হয়। বাঘিনী লম্বায় কিছু ছোট। ভারতবর্ষের বড় বড় জঙ্গলে এই বাঘ আছে। গ্রীষ্মকালে জলাশয়ের নিকট ঘন বড় ঘাস ও ঝোপের মধ্যে বাঘ বাস করে। বাঘ জল ভয় করে না; অনায়াসে সাঁতার দিয়া, নদী নালা পার হইয়া যায়। দিনের বেলা শিকার মারিলে রাত্রি না হইলে খায় না। এই বাঘ পচা জন্তুও খায়।

বাঘিনী ৩৷৹ মাস কাল গর্ভধারণ করিয়া দুইটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত শাবক প্রসব করে। যে বাঘিনী অল্প দিন শাবক প্রসব করিয়াছে, সে অত্যন্ত হিংস্র হয়।

সিংহও বিড়ালের জাতি। কিন্তু উহা তত নিকট-জাতি নহে। সিংহ ও ব্যাঘ্রের স্বভাব প্রায় এক। উভয়েই দিবসে ঘুমায়, রাত্রিকালে আহার অন্বেষণ করে। বাঘ অপেক্ষা সিংহের বেশী সাহস এবং সিংহ দেখিতেও সুন্দর; এজন্য সিংহের নাম পশুরাজ। কিন্তু সিংহ অপেক্ষা বাঘ বেশী বলবান্। বাঘের ন্যায় সিংহও বড় বড় জন্তু অনায়াসে বধ করে এবং সময়ে সময়ে মানুষকেও মারিয়া থাকে।

বাঘের মত সিংহ লম্বা হয় না। সিংহ অপেক্ষা সিংহী আরও ছোট। সিংহের ঘাড়ে ১০।১২ অঙ্গুলি লম্বা কেশর থাকে। সিংহীর কেশর নাই। কিন্তু সিংহ ও সিংহী উভয়েরই লেজে লোমপুচ্ছ আছে। বাঘের মত সিংহের গায়ে লম্বা লম্বা রেখা নাই। বড় বড় সিংহের পেটে ও পেটের দুই পাশে অস্পষ্ট দাগ দেখা যায়।

অনেকের বিশ্বাস, এখন ভারতবর্ষে সিংহ নাই। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। তবে এ দেশে ক্রমশঃ সিংহের সংখ্যা কম হইতেছে বটে। রাজপুতানা ও তাহার নিকটবর্ত্তী প্রদেশের জঙ্গলে সিংহ বাস করে।

বাঘ পোষমানান বড় কঠিন। কিন্তু সিংহ পোষমানান তত কঠিন নয়। বিড়াল-বংশের সমুদয় জন্তুর মধ্যে সিংহকেই সহজে পোষমানান যায়। পোষমানাইতে হইলে, সিংহকে শাবকাবস্থায় ধরিতে হয়। অনেক সাহসী লোক দেশ বিদেশে পোষা সিংহের খেলা দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করে।

বিড়ালের একটু দূর-জ্ঞাতি "শিকারি চিতা বাঘ"। ইহার কথা দুই একটা না বলিলে, আমাদের দেশের বিড়ালবংশ-বর্ণনা অসম্পূর্ণ হয়। বিড়াল-বংশের অপরাপর জন্তুর ন্যায় ইহার পায়ের নখ নীচের দিকে তত বাঁকে না। ইহার পাগুলিও কিছু বেশী লম্বা এবং শরীরটা কিছু সরু। অনেক শিকারি ইহাকে পোষে এবং ইহা দ্বারা হরিণ শিকার করে। ইহার কথা গত জুলাই মাসের সখায় পড়িয়াছ। ইহার এক একটাও, কুকুর ও বিড়ালের

মত বশীভূত হয়। ইহা চিতাবাঘ অপেক্ষা কিছু উচ্চ ও কৃশ। চিতাবাঘের মত ইহার গায়েও কৃষ্ণ-বর্ণ দাগ আছে। ইহার ঘাড়ের ও পেটের নীচের লোমগুলি কিছু লম্বা।

সিংহ ও ব্যাঘ্রের মত বলবান্ জাতির নিকট সুরবালার পোষা বিড়ালের লজ্জিত হইবারই কথা। আদি বাস জঙ্গল ছাড়িয়া পরবাসে পরের নিকটে থাকিয়া সে বন্যভাব পরিত্যাগ করিয়াছে। অনেক গৃহপালিত পশুই প্রথমে বন্য ছিল। মানুষ কৌশল পূর্ব্বক ধরিয়া তাহাদিগকে বশ করিয়াছে। অবস্থার পরিবর্ত্তন বশতঃ গৃহপালিত পশুগুলির স্বভাবও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

বিড়াল-বংশের এই কয়েকটি জাতির কথা বলা গেল :—

১। বন্যবিড়াল। ৫। বড় বাঘ।
২। মেছো বিড়াল। ৬। সিংহ।
৩। চিতা বিড়াল। ৭। শিকারী চিতা বাঘ।
৪। চিতা বাঘ।

পরে দেখ, বিড়ালের বংশ মাংসাশিগোত্রের প্রধান বংশ। প্রকৃতপক্ষে এই বংশই "শ্বাপদ" নাম পাইবার উপযুক্ত। শ্বাপদ শব্দটি 'শ্বন্' ও 'পদ' এই দুইটি শব্দের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে। শ্বন্ অর্থে কুকুর, পদ অর্থে পা—পায়ের থাবা; ইহা হইতেই, যাহার কুকুরের ন্যায় পা বা থাবা, তাহার নাম শ্বাপদ। বিড়ালের থাবা দেখ, উহাতে কেমন ধারাল বাঁকা নখ আছে! বিড়াল তাহার নখগুলির বেশ মূল্য জানে। কেন না, যখন নখের আবশ্যকতা না হয়, তখন বিড়াল ইহা থাবার নীচে লুকাইয়া রাখে; সর্ব্বদা মাটিতে নখ লাগিলে উহা ক্ষয় পাওয়ার সম্ভাবনা। কোথাও চড়িতে হইলে কিম্বা শিকার মারিতে হইলে, বিড়াল নখগুলি বাহির করে। বিড়ালের মুখটি দেখ। মুখের উপর ও নীচের পাটিতে কেমন বড় বড় মজবুত ছুঁচল চারিটি দাঁত আছে। ইহা দ্বারা বিড়াল শিকার ধরে। এই দাঁতের পশ্চাতে আর কতকগুলি ধারাল দাঁত আছে। সেগুলি মাংস কাটিবার সময় কাঁচির মত কায করে। বিড়ালের কেমন ভয়ানক অস্ত্র আছে! সিংহ ও ব্যাঘ্রের ঐ সকল অস্ত্র আরও ভয়ানক। তাহাতেই উহারা বড় বড় জন্তুকে বধ করিতে পারে। অতএব বিড়াল-বংশের প্রধান লক্ষণ এই যে, সকলেরই প্রায় গোল মস্তক ও মাংস ছেদনের উপযুক্ত দন্ত আছে। ইহাদের উপর নীচে দুই পাটিতে কুড়িটি দাঁত; তন্মধ্যে সম্মুখের ছেদন করিবার দাঁতই ছয়টি করিয়া বারটি। প্রত্যেক পায়ে চারিটি করিয়া আঙুল, এবং সেই আঙুলে বাঁকা বাঁকা নখ আছে। বিড়াল-বংশের সকল জন্তুই আঙুলের উপর ভর দিয়া চলে—আমাদের মত কিম্বা ভালুক-বংশের মত পায়ের তলায় ভর দিয়া চলে না। শিকারি চিতা বাঘ ব্যতীত বিড়াল-বংশের সকল জন্তুই পায়ের নখগুলিকে বাঁকাইয়া পায়ের নীচে লইয়া যাইতে পারে। ইহাদের পায়ের প্রত্যেক আঙুলের নীচে এক একটা মাংসপিণ্ড আছে।

তোমাদের অনেকেই হয় ত বাঘ ও সিংহ দেখ নাই। কিন্তু বিড়াল দেখিতে কাহারও বাকি নাই। সিংহ ব্যাঘ্রের বৃহৎ আকারের কাছে বিড়াল উপহাসাস্পদ হইলেও, উহাদের গঠনের সহিত বিড়ালের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্য আছে বলিয়াই, আমাদের দেশে "বাঘের মাসি" বলিয়া বিড়ালের একটা পরিচয় শুনিতে পাই। তোমরা ঘরে বসিয়া "বাঘের মাসি"র গঠনাদি ভাল করিয়া দেখিলে, বনের দুরন্ত বাঘ ও সিংহাদির গঠনেরও অনেকটা আভাস পাইবে।

লর্ড্ এল্‌গিন্।
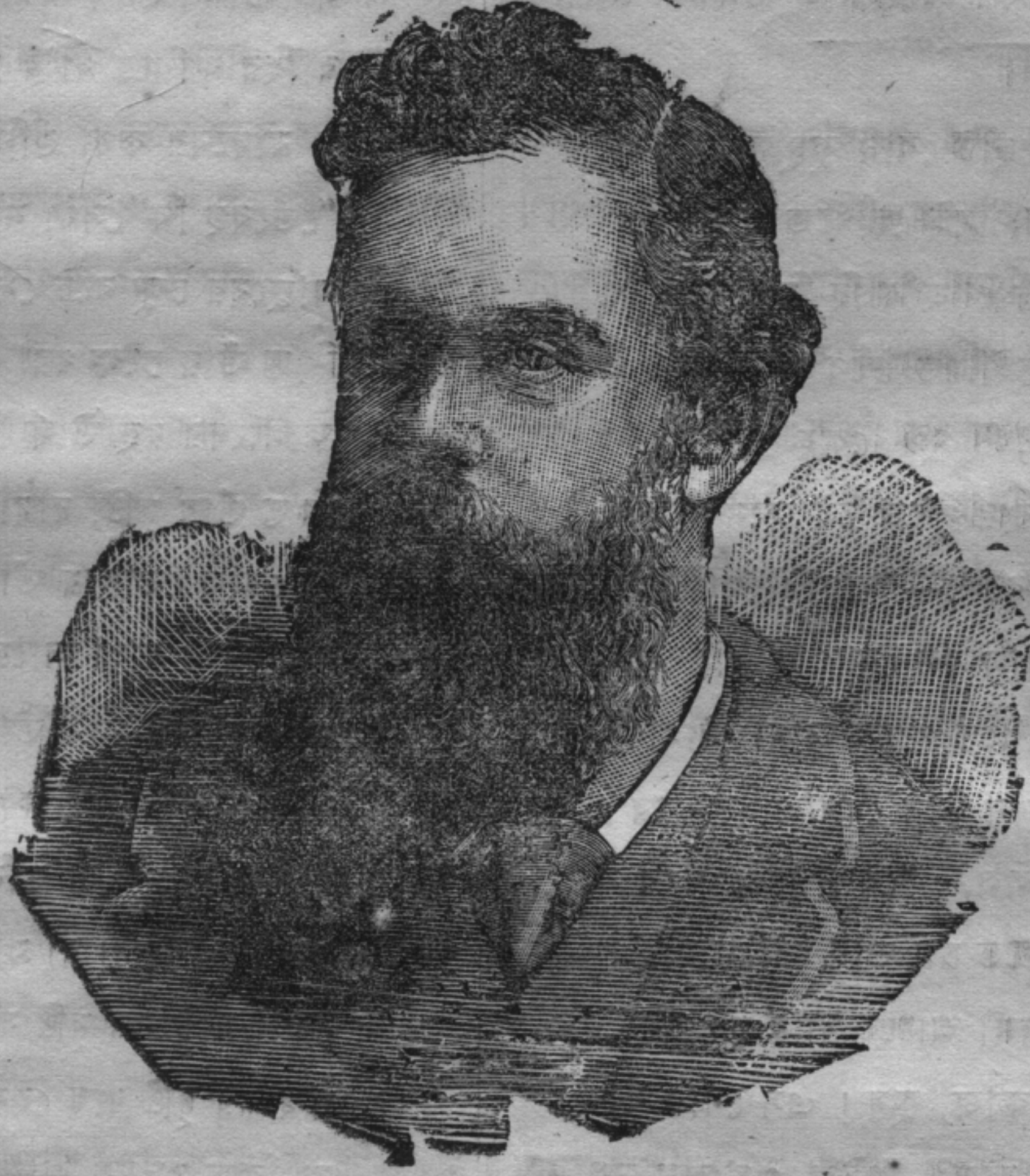
উপরে যে মহাত্মার প্রতিমূর্ত্তি দেখিতেছ, ইঁহারই নাম লর্ড্ এল্‌গিন্—ইনিই আমাদের বর্ত্তমান বড় লাট লর্ড্ ল্যান্স্‌ডাউন্ মহোদয়ের পর তাঁহার পদে ভারতের গবর্ণর জেনারল মনোনীত হইয়া আসিতেছেন। এল্‌গিন্ বংশের সহিত ভারতবর্ষের সংশ্রব এই নূতন নয়, ইঁহার পিতা—এল্‌গিন বংশের অষ্টম লর্ড্—খৃঃ ১৮৬২ অব্দে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল হইয়া আসিয়াছিলেন।

কানাডার অন্তর্গত মন্ট্রিল্ নগর লর্ড্ এল্‌গিনের জন্মস্থান। আমেরিকায় জন্ম হইলেও, ইঁহার বিদ্যাশিক্ষা বিলাতেই হইয়াছিল। ইঁহার পিতা যখন ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি হইয়া আইসেন, ইঁহার বয়স তখন বার তের বৎসর বই নয়, এবং তখন ইনি ইংলণ্ডে থাকিয়াই বিদ্যাশিক্ষা করিতেছিলেন। খৃঃ ১৮৬৩ অব্দে, পিতার মৃত্যু হইলে, ইনি সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন। খৃঃ ১৮৭৩ অব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বেলিওল কলেজ হইতে ইনি বি-এ ও তৎপর বৎসর এম-এ উপাধি লাভ করেন।

কলেজ হইতে বাহির হইয়া ইনি কিছুদিন মহারাণীর পারিবারিক কোষাধ্যক্ষতা ও অন্যান্য কার্য্য করেন। ইহার পর ১৮৮৬ অব্দে আয়র্লণ্ডের লর্ড্ লেফ্‌টেনান্টের পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। আগামী জানুয়ারি মাসের শেষাশেষি ইঁহার এ দেশে আসিয়া কার্য্যভার লইবার কথা।

ঈশ্বরের দৃষ্টি।

যাদবের ছোট বোন কুমুদিনী নাম,
বড় চারুশীলা সেই দেখিতে সুঠাম।
একদিন অন্য কেহ নাহি ছিল ঘরে,
ভাই বোন দুইটিতে সুখে খেলা করে।
যাদব বলিল, "কুমু! কেহ হেথা নাই,
গোপনে খাবার খুঁজে দুই জনে খাই।"
কুমুদিনী বলে,—"দাদা! গোপনে খাইব,
হেন গুপ্ত স্থান বল কোথায় পাইব?
কেহ না দেখিতে পাবে আমা দোঁহাকারে,
হেন গুপ্ত স্থান তুমি দেখাও আমারে।"
যাদব বলিল,—"বেশ, চিন্তা তার নাই,
ভাণ্ডার-ঘরেতে চল ভাই বোনে যাই।
ভাঁড়-ভরা ননী আছে, খা'ব দুই জনে,
বিলম্বে কি কাজ, কুমু! এস মোর সনে।"
কুমুদিনী বলে,—"উহা গুপ্তস্থান নয়,
আছে হোথা অপরের দেখিবার ভয়।
ওই দেখ আমাদের প্রতিবেশী মণি,
পথে গাছ কাটিতেছে, দেখিবে এখনি।"
যাদব বলিল,—"তবে এস মোর সনে,
রসুই-ঘরেতে ত্বরা যাই দুই জনে।
কুলুঙ্গিতে থালে ঢাকা আছে গুড়পিঠে,
যত পারি খা'ব, উহা লাগে বড় মিঠে।"
কুমুদিনী বলে,—"দাদা যাব না হোথায়,
গুপ্তস্থান নহে উহা কহি যে তোমায়।
প্রতিবেশী দীনু ভার জানালার ধারে,
ব'সে আছে আমা দোঁহে দেখিবারে পারে।"
যাদব বলিল,—"কুমু! এস তবে যাই,
সিঁড়ির তলায় গিয়ে কুলচুর খাই।
সেখানে জানালা নাই, নাই ফাঁক, আলো,
জমাট আঁধার সেথা মিশমিশে কালো।
সরা-ঢাকা হাঁড়ি-ভরা আছে কুলচুর,
বাহির করিয়ে খা'ব দুজনে প্রচুর।"
যাদবের কথা শুনি কুমুদিনী কয়,—
"ভেবেছ কি সেথা নাহি দেখিবার ভয়?
মানুষের চক্ষু বটে সেথা এড়াইবে,
কিন্তু তাঁর চক্ষে ধরা এখনি পড়িবে।
আমাদের বহু ঊর্দ্ধে বিরাজেন তিনি,
কিন্তু তাঁর দৃষ্টি, দাদা! দিবস যামিনী।
দেওয়াল ভেদিয়ে তাঁর দৃষ্টি ছুটে আসে,
অন্ধকারে যাহা আছে, দেখেন অনা'সে।
জান না কি নাম তাঁর ঈশ্বর মহান্,
তাঁর চক্ষে নাহি কোথা গোপনীয় স্থান।"
যাদব এ কথা শুনি, মনে পেয়ে ভয়,
বলে,—"কুমু! যা বলিলে বটে তা নিশ্চয়।
যেথা মানুষের দৃষ্টি যাইতে না পারে,
ঈশ্বরের দৃষ্টি যায় হেন অন্ধকারে।
যা কিছু অন্যায় কাজ,—কোথাও কখন,
না করিব, আজি হ'তে করিলাম পণ।"

মহারাজ দলিপ সিংহ।

অনেকেরই পাঠক পাঠিকার নিকট দলিপ সিংহের নাম বিশেষ অপরিচিত নহে। খ্রিঃ ১৮৮৭ অব্দে কোহিনুর-শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা মহারাজ দলিপের নামোল্লেখ করিয়াছি। দলিপ, মহারাজ রণজিৎ সিংহের চতুর্থ এবং কনিষ্ঠ পুত্র, লাহোর রাজবাটীতে খ্রিঃ ১৮৩৮ অব্দের

৪ঠা সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ পুত্র হইলেও, অল্প সময়ের মধ্যে বড় দুইটি ভ্রাতার মৃত্যু হওয়ায় তৃতীয়কে অতিক্রম করিয়া শিখসৈন্য কর্ত্তৃক ইনিই খ্রিঃ ১৮৪৩ অব্দে পিতৃসিংহাসনে অধিরোহিত হন। এখন দলিপ মহারাজ চক্রবর্ত্তী হইলেন।

প্রবল পরাক্রান্ত রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর শিখসৈন্যদের মধ্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। অরাজকতা আপনার মস্তক উত্তোলন করিয়া রাজত্ব করিতে থাকে; সাধারণ লোকে ধন প্রাণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হয়। বালক মহারাজ দলিপ সিংহ ও তাঁহার মাতা শান্তি সংস্থাপন করিতে পারিলেন না। "ঘরের ঢেঁকি কুমীর হইল"; গোলাপ সিংহ তলে তলে বিদ্রোহে যোগ দিলেন। মন্ত্রী ও সেনাপতির দোষে আপনাদের মধ্যে বিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। মহাভারতের সময় হইতেই গৃহ-বিচ্ছেদেই ভারতবর্ষের পতন। গৃহ-বিচ্ছেদের সুযোগেই মুসলমানেরা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। গৃহ-বিচ্ছেদেই শিখসৈন্যগণ বিদ্রোহী হইল এবং এই বিদ্রোহ নিবারণ ও রণজিতের বংশধরকে সাহায্য করিবার মানসে তথনকার বড়লাট হার্ডিঞ্জ সাহেব খ্রিঃ ১৮৪৫ অব্দে পঞ্জাব অভিমুখে সসৈন্যে গমন করিলেন। ইনি, খ্রিঃ ১৮৪৬ অব্দে বিদ্রোহী শিখসৈন্যদিগকে পরাভূত করিয়া পঞ্জাব সুসাশনের ভার ভারত গভর্ণমেণ্টের হস্তে আনিলেন। বালক মহারাজ দলিপও ভারত গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে রহিলেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানেও কিন্তু পঞ্জাবে সুসাশন হইল না। বিদ্রোহী শিখসৈন্য আরও উদ্ধত হইয়া উঠিল।

লর্ড হার্ডিঞ্জের পর লর্ড ডাল্‌হৌসি আসিয়াছেন। পঞ্জাব তথনও বিদ্রোহীদের রঙ্গভূমি। ডাল্‌হৌসি সুশাসনের অছিলায় পঞ্জাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ইংরেজ জয়ী হইল। ঘরের ঢেঁকি গোলাপ সিংহ ৯০ লক্ষ টাকা সেলামী দিয়া দলিপের কাশ্মীর রাজ্য আত্মসাৎ করিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ যাহা মনেও কল্পনা করেন নাই, লর্ড ডাল্‌হৌসি তাহা কার্য্যে পরিণত করিলেন। মহারাজ দলিপ সিংহাসনচ্যুত হইলেন।

পঞ্জাব এইরূপে বৃটিশরাজ্যভুক্ত হইল। দলিপের ধনরত্ন সকল ইংরেজ তত্ত্বাবধায়ক লোগিন সাহেবের হাতে পড়িল। এই সময়ই অমূল্যরত্ন কোহিনুর ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। একদা এক ব্যক্তি মহারাজ রণজিৎকে কোহিনুরের মূল্য জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিয়াছিলেন, "তিন জুতি।" কিন্তু দলিপের নিকট হইতে কোহিনুর গ্রহণ করিতে ইংরেজের "এক জুতিরও" দরকার হয় নাই।

দলিপ সিংহ রাজ্যচ্যুত হইয়া, প্রায় ৫ লক্ষ টাকা বাৎসরিক বৃত্তি পাইয়া ফরক্কাবাদে বাস করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর পরে দলিপ খ্রিষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

১৬ বৎসর বয়সে মহারাজ দলিপ বিলাত যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বালক মল্ল ও পুত্ত হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়াছিলেন। দলিপ তাঁহাদের ও তাঁহার পিতার নামে কলঙ্ক লেপন করিলেন। রাজনীতি-কুশল ডাল্‌হৌসি দলিপের মতে সায় দিলে খ্রিঃ ১৮৫৪ অব্দে তিনি ইংলণ্ডে বেড়াইতে গেলেন। তথায় মহারাণী ও তাঁহার পুত্র কন্যাদের স্নেহ ও ভালবাসায় তিনি আপনাকে ভুলিলেন, পিতার বীরত্ব হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিলেন, আনন্দে নাচিয়া কুদিয়া সাহেবী জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। সাধের পঞ্জাব তাঁহার মনে আর স্থান পাইল না।

লোগিন সাহেব তাঁহাকে উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে রাখিয়া ইংরাজি, ফরাসিস্, জর্ম্মন, ইতালীয়, ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিলেন। খ্রিঃ ১৮৫৬ অব্দে

ভারতে সিপাহি যুদ্ধের তরঙ্গাঘাতে বৃটিশ সিংহাসন কাঁপিতেছিল। মহারাজ তখন একবার ভারতবর্ষে আসিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পারিলেন না।

পরে খ্রিঃ ১৮৬১ অব্দে দলিপ একবার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ভারতের আব হাওয়া তাঁহার না কি সহ্য হইল না; তাই, আফগানস্থানবিজয়ী, বিক্রমকেশরী কষ্ট-সহিষ্ণু রণজিৎ সিংহের ত্রয়োবিংশ বর্ষীয় পুত্র কলিকাতা পর্য্যন্ত আসিয়া পুনর্ব্বার ইংলণ্ড গমন করিলেন। এই সময় তাঁহার মাতাও দলিপের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে মাতার মৃত্যু হইল। তিনি মাতার ভস্মাবশেষ লইয়া ভারতে প্রত্যাগমন করেন। এবং পুনরায় ইংলণ্ডে যাইবার সময় মিসর দেশীয় একটি অনাথা বণিক-কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহেও দলিপ পিতার মান সম্ভ্রম রক্ষা করিতে পারেন নাই।

খ্রিঃ ১৮৮৭ অব্দে দলিপ-পত্নীর মৃত্যু হইল। স্ত্রীর মৃত্যুর দুই বৎসর পরে, ৫১ বৎসর বয়সে, তিনি পুনরায় বিবাহ করিলেন। তাঁহার হৃদয়-হীনতার পরিচয় পাইয়া তাঁহার বন্ধু বান্ধবেরা বড়ই দুঃখিত হইলেন।

দলিপের বাৎসরিক বৃত্তি প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ছিল, ইহাতেও তাঁহার ব্যয় সংকুলান হইত না। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট অধিক অর্থ চাহিতে লাগিলেন। পৈতৃক ধন সম্পত্তি তাঁহাকে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে টাকা কড়ি ও পৈতৃক ধন সম্পত্তি লইয়া ইংরাজরাজের সহিত তাহার মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। ক্রমে এই মনোমালিন্য দলিপকে অর্ব্বাচীন করিয়া তুলিল। ক্রমে তিনি বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া উঠিলেন এবং ইংরাজের চিরশত্রু রুসের আশ্রয়ভিক্ষা চাহিলেন। রুস কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া ইংরাজের বিদ্বেষভাজন হইতে ইচ্ছা করিলেন না।

শেষবার দলিপ যখন ভারতবর্ষে আগমন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন, তখন পথিমধ্যে অর্ব্বাচীনের মত এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া বসিলেন। ইহাতে সুচতুর ইংরাজ এডেন হইতে ইঁহাকে বন্দী করিয়া ইংলণ্ডে লইয়া গেলেন। মহারাণীর নিকট ক্ষমা চাহিয়া দলিপ সে বার নিষ্কৃতি লাভ করিলেন এবং মনোদুঃখে ফ্রান্সের রাজধানী পারী নগরে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিগত লক্ষ্মী-পূর্ণিমার দিনে পারী নগরের কোন পান্থশালায় ৫৫ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবনবায়ু শেষ হইয়াছে। যাঁহার জন্মে পঞ্জাব নৃত্য-গীতাদি উৎসবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, যিনি পৃথিবী মধ্যে অমূল্য ধন কোহিনুরের প্রকৃত স্বত্বাধিকারী, যাঁহার অনুগ্রহ দৃষ্টিতে কত শত সম্পন্ন ব্যক্তিরাও আপনাদিগকে অনুগৃহীত মনে করিতেন, আজ সেই ব্যক্তি বন্ধুবান্ধবরহিত সামান্য লোকের ন্যায় বিদেশের একটি পান্থশালায় এই পৃথিবীর দুঃখ ক্লেশের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেন। ইঁহার তাপিত আত্মাকে ভগবান শান্তিদান করুন। বিক্রমকেশরী রণজিতের সাধের রাজ্য ধন তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল, দলিপের মৃত্যুতে বীর রণজিতের রক্তবিন্দুও পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইল।

বিড়ালে মানুষে যুদ্ধ।

প্রশান্ত মহাসাগরের অনেকগুলি দ্বীপে এখনও অসভ্য জাতির বাস আছে। খ্রিষ্টান মিশনরিগণ জাহাজে করিয়া এই সকল দ্বীপে গিয়া খ্রিষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন। একবার কয়েকজন মিশনরি একটি দ্বীপে গমন করেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনের একটি বিড়াল ভয় পাইয়া পলাইয়া যায়, সাহেবেরা তাহাকে আর খুঁজিয়া পান নাই। বিড়ালটি কিন্তু দৌড়িয়া গিয়া সেই দ্বীপবাসীদের এক দেবগৃহে প্রবেশ করে। পরদিন যখন দ্বীপবাসীরা তাহাদের পুরোহিতকে লইয়া পূজা করিতে গৃহের দ্বার খুলিল, তখন বিড়ালটি আলোক দেখিয়া ডাকিয়া উঠিল। দ্বীপবাসীরা শূকর ও ইঁদুর ভিন্ন আর কোন পশুর বিষয় বড় একটা জানিত না, কারণ আর কোন পশু সে দ্বীপে বড় নাই। কাজেই তাহারা দেব-গৃহে বিড়ালের ডাক শুনিয়া এবং বিরল অন্ধকারে তাহার চক্ষু জলিতে দেখিয়া ভাবিল, যে সমুদ্র হইতে এক দৈত্য উঠিয়া সেখানে আশ্রয় লইয়াছে। তাহাদের পুরোহিত সর্ব্বপ্রথমে ঘরে ঢুকিতেছিলেন, কিন্তু যেমন বিড়ালের ডাক শুনিলেন ও জ্বলজ্বলে চক্ষু দুটি দেখিলেন, অমনি পিছনে লাফাইয়া পড়িয়া সকলকে চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"সমুদ্র হইতে একটা দৈত্য আসিয়া দেবতার ঘরে বাসা করিয়াছে, তোমরা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া আইস।" তাহারা তৎক্ষণাৎ ভীত হইয়া স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গেল এবং নিজ নিজ অস্ত্র শস্ত্রে সাজিয়া গিয়া দেবতার ঘরের চারিদিকে সারি দিয়া প্রায় পাঁচ শত লোক দাঁড়াইল। যে মুহূর্ত্তে দৈত্য বাহির হইয়া পলাইবে আর অমনি সকলে পড়িয়া মারিয়া ফেলিবে, এইটি ঠিক করিয়া রহিল। কিন্তু বিড়ালটি অধিক লোক দেখিয়া পলাইবার জন্য যেমন বাহির হইল, অমনি লোকগুলা চীৎকার করিয়া উঠিল। বিড়ালটি ভয় পাইয়া এক দিক দিয়া ছুটিয়া পলাইল। সে যে দিকে ছুটিল, সে দিকের লোকগুলা বিড়ালকে আসিতে দেখিয়া মহা ভয়ে আকুল হইয়া অস্ত্র শস্ত্র ফেলিয়া ছুটিল, দেখা দেখি সকলেই ছুটিয়া পলাইল। তার পর সন্ধ্যাকালে যখন দ্বীপবাসীরা দেবমন্দিরে শূকর-মাংসাদি পোড়াইয়া খাইয়া নাচ গান করিতেছিল, তখন বিড়ালটি খাদ্যের লোভে আবার দেখা দিল, কিন্তু লোকগুলা দৈত্যকে আবার আসিতে দেখিয়া যে যে দিকে পারিল ভয়ে ছুটিয়া পলাইল। শেষে, রাত্রিতে বিড়ালটি যখন একজনের বাস-স্থানের নিকট নিদ্রা যাইতেছিল, তখন সে ব্যক্তি তাহাকে দেখিতে পাইয়া আরও ৫।৬ জনকে ডাকিয়া আনিয়া সকলে মিলিয়া বিড়ালটাকে মারিয়া ফেলিল। তখন তাহাদের বাহাদুরি দেখে কে? সেই রাত্রিতেই সেখানে অনেক লোক জড় হইয়া গেল এবং সকলেই বিস্ময়ের সহিত দৈত্যের আকার প্রকার দেখিতে লাগিল। এখনও এমন দেশ ও এমন মানুষ আছে, যে বিড়াল দেখিয়াও ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হয় ইহা শুনিয়া হয় ত তোমরা আশ্চর্য্য হইতেছ, কিন্তু এ সমস্তই সত্য কথা বলিয়া জানিও।

ধাঁধা।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

১ম। বাতিটি সমতলে রাখিবার কথা। সুতরাং সলিতা জ্বালিয়া দিলে, দুই দিকের বাতি একটু একটু গলিয়া পড়িতে থাকিবে। কিন্তু একই সময়ে, একই হারে, দুই মুখ গলিয়া পড়া সম্ভব নহে। কেন না, সলিতা দুইটি সমান হইবে এবং কোন দিকেই বাতাস থাকিবে না, এমন আশা করা যায় না। সুতরাং যে দিকের বাতি বেশী গলিয়া পড়িবে, সে দিকটা হাল্‌কা ও কাজেই অন্য দিকটা ভারি হইয়া নুইয়া পড়িবে। ভারি হইয়া নুইয়া পড়িলে, সে দিকের বাতির শিখা বাতির গায়ে বেশী লাগিবে এবং সে দিকের বাতিও কিছু বেশী পরিমাণে গলিয়া পড়িবে। সুতরাং সে দিকটা শীঘ্রই আবার হাল্‌কা হইয়া উপরে উঠিবে। এইরূপে একবার এক দিক নামিবে, একবার অন্য দিক নামিবে।

কিন্তু ইহাই শেষ নয়। বেগ বাড়িবে কেন? ঘন ঘন উঠিতে নামিতে থাকিলেই বেগ বাড়িবে। এবং এইজন্যই ক্রমে ক্রমে বাতিটি লম্বভাবে আসিয়া পড়িবে। ঠিক ইহার মত আর একটি পরীক্ষা বলা যাইতে পারে। এক গাছি সুতায় একটি ছোট ইট ঝুলাইয়া দিয়া পরিদোলক (Pendulum) করিলে, সেই পরিদোলকটিকে কোন দিক হইতে খুব অল্প জোরে কোন হাল্‌কা জিনিস (যেমন পাখীর পালক) দিয়া একটু ঠেলিয়া দিলে, প্রথমতঃ উহা অল্প নড়িবে, কিন্তু যখন পুনর্ব্বার পালকের নিকট আসিয়া ফিরিতে থাকিবে, তখন পূর্ব্বের মত অল্প জোরে একটু ঠেলিয়া দিলে উহার বেগ কিছু বৃদ্ধি হইবে। এইরূপ পুনঃপুনঃ করিতে থাকিলে, জিনিসটি প্রবল বেগে দুলিতে থাকিবে। এখন, একটু একটু চর্ব্বি গলিয়া পড়িয়া, বাতিটি একটু একটু এদিক ওদিক উচু নীচু হইতে হইতে, কেমনে করিয়া বেগ বাড়িয়া লম্বভাবে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহা বুঝিতে বোধ হয় তোমাদের কষ্ট হইবে না।

২য়। একটা সমচতুর্ভুজ জমির এক-চতুর্থ অংশ বাদ দিলে, বাকী জমিখানি চিত্রানুযায়ীরূপে সমান চারি ভাগ করা যাইতে পারে।
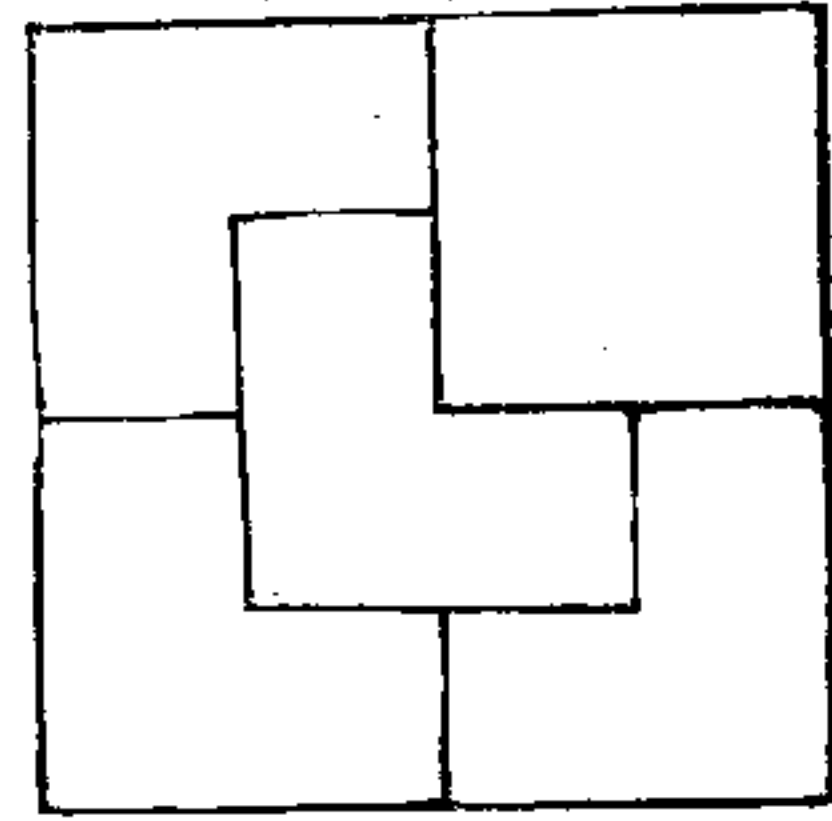
এক-চতুর্থাংশ বাদ যাওয়াতে সমান তিনটি অংশ আছে। উহার প্রত্যেকটিকে আবার সমান ৪ ভাগে বিভাগ কর। সমান বারটি ক্ষেত্র হইল। ইহাদের বাহিরের তিন তিনটিকে লইয়া এক একটি ক্ষেত্র কর এবং ভিতরের তিনটি দ্বারা একটি ক্ষেত্র কর। এক্ষণে সমান আকৃতির চারিটি ক্ষেত্র হইল।

৩য়। পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল॥

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ গতবারের তিনটি ধাঁধারই ঠিক উত্তর দিয়াছেন :—

শ্রীবিনয়ভূষণ ঘোষ, কলিকাতা; শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা; শ্রীগিরিবালা দাস, বীরশ্রী।

সখা
একাদশ ভাগ। ১২শ সংখ্যা।

ডিসেম্বর, ১৮৯৩।

রত্ন।

মণি মাণিক্যাদি মধ্যে যেটি সর্ব্বোজ্জ্বল, সেইটিকে রত্ন বলে। মনুষ্যের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান্, তিনিই মনুষ্য-রত্ন। সুন্দর গোলাপ ফুলের আদর যেমন সকলেই করিয়া থাকে, রত্নের আদরও সেইরূপ সর্ব্বত্র। রাজার আদর স্বদেশে, কিন্তু বিদ্বানের পূজা সর্ব্বদেশে।

যে দেখিতে কুৎসিত, দরিদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যাহার জ্ঞাতি কুটুম্ব প্রতিবেশী ধনবান্ নহে, রত্ন উপাধি লাভ করিবার তাহারও অধিকার রহিয়াছে। যাহার বুদ্ধিবৃত্তি স্বভাবতঃ প্রখরা নহে, যাহার স্মৃতিশক্তি সতেজ নহে, তাহার মধ্যেও বীজ অবস্থায় এমন অনেক গুণ রহিয়াছে, যাহার অনুশীলন করিলে সে ঐ সমস্ত গুণ সম্বন্ধে রত্ন উপাধি প্রাপ্ত হইতে পারে। পিতা মাতার সেবা, ভাই ভগিনীর প্রতি স্নেহ, গুরুজনের আজ্ঞাপালন, সকলের নিকট বিনয় প্রদর্শন, ভগবানে ভক্তি, সর্ব্ব জীবে দয়া ইত্যাদি সদ্‌গুণে বিভূষিত হইয়া সকলেই রত্ন হইতে পারে। সকল মনুষ্যই কিছু কালিদাস, ভবভূতি হইতে পারে না, সকলেই সেক্ষপীয়র, গ্লাড্‌ষ্টোন হয় না, সকলেই কখনও রাজারাণী হইতে পারে না, কিন্তু পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়া সকলেই নিজ নিজ স্বভাবের উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। একটি তিন্তিড়ী বৃক্ষ হইতে চেষ্টা করিয়া কখনও আম্র উৎপাদন করা যায় না সত্য, কিন্তু পুনঃপুনঃ চেষ্টা দ্বারা তিন্তিড়ী বৃক্ষ হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তেঁতুল, এবং আম্র বৃক্ষ হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট আম্র ফল জন্মান যায়।

গুণার্জ্জনের জন্য পুনঃপুনঃ চেষ্টা ও যত্নে সকল মনুষ্যের অধিকার আছে। কারণ মনুষ্য কর্ম্ম করিবার শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। একমাত্র আলস্য সর্ব্বপ্রকার দুঃখ যন্ত্রণার মূল। যাহাতে আলস্য দূর হয়, সেইরূপ অনুষ্ঠান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আমার বুদ্ধি নাই, গুণ নাই, রূপ নাই, বা আমি দরিদ্রের সন্তান, আমি কাহারও প্রিয় হইতে পারি না, এইরূপ মনে ভাবিয়া সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট থাকিলে জীবনের কোন কার্য্য হয় না, মানুষ জড়ের মত হইয়া যায়। এজন্য যে যে অবস্থায় জন্মগ্রহণ করুক না কেন, পুনঃপুনঃ চেষ্টা দ্বারা সদ্‌গুণে বিভূষিত হইতে প্রয়াস পাওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

রত্ন উপাধি লাভ করিতে হইলে পরিশ্রম অবলম্বন এবং আলস্য ত্যাগ করা বিধেয়। যদি ইচ্ছা করিলেই ভাল মানুষ হওয়া যাইত, যদি আকাশের দিকে চাহিলেই সদ্‌গুণগুলি হৃদয়ে পতিত হইত, তবে সকলেই সাধু, সুশীল, বিদ্বান্ ও বিনয়ী হইতে পারিত। যাহা কেন পাইবার ইচ্ছা কর-না, তজ্জন্য আত্মসংযম ও পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়াই, সকলেই ভাল মানুষ হইতে পারে না। অথচ পুরুষ-

কার মাত্রই মানুষের অবলম্বনীয়। ভাল মানুষ হইতে পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিতেছ কিন্তু পুনঃপুনঃ বিফল মনোরথ হইতেছ, তথাপি ভগ্নোদ্যম না হইয়া কাতরভাবে ভগবানের শরণ লওয়া কর্ত্তব্য। প্রথম অবস্থায় যদিও তোমার শক্তির অভাব বোধ হয়, নিরস্ত না হইয়া পুনরায় চেষ্টা কর—যত বার না পারিবে, মানুষের কাছে দুঃখের কথা প্রকাশ না করিয়া ভগবানের কাছে শক্তি প্রার্থনা কর—দেখিবে, সর্ব্বশক্তিময়ের অনুগ্রহে তুমি সাধুপথে অগ্রবর্ত্তী হইতে পারিতেছ। এইরূপে নিয়ত চেষ্টা করিতে করিতে যখন দেখিবে দশদিন বিফল-মনোরথ হইয়া একদিন সফল-মনোরথ হইয়াছ, দশবার পতিত হইয়া একবার উঠিতে পারিয়াছ, তখন আবার তোমার শক্তি শতগুণ বৰ্দ্ধিত হইয়া যাইবে। তখন তুমি অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইবে, কিছুতেই ভগ্নোদ্যম হইবে না। তখন তোমা দ্বারা পরিবার, সমাজ, দেশ—এমন কি সমগ্র মনুষ্যজাতির মঙ্গল সাধিত হইবে, এবং তখনই তুমি ভগবানের অভিপ্রেত কার্য্য সাধনে প্রকৃত সক্ষম হইবে। জীব-প্রতিপালন এবং জীবে দয়া তখন তোমা দ্বারা অবাধে সাধিত হইতে থাকিবে। ভগবান অলস এবং কাপুরুষ ব্যক্তি দ্বারা কোন কার্য্য সম্পাদন করান না।

যদি কেবল মাত্র আহার নিদ্রার পারিপাট্যকে পশুত্ব অবস্থা অপেক্ষা উন্নত অবস্থা বলিয়া তোমার বোধ থাকে, ভাল মানুষ হইয়া নিজের ও জগতের উপকার করা যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে জীবনের প্রথম অবস্থা হইতেই গুণরত্ন-লাভের চেষ্টা করিতে হইবে—প্রথম হইতেই কতকগুলি অভ্যাস উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

প্রথম অভ্যাস ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। এবং জীবনের শেষ অবস্থায় ধর্ম্মই একমাত্র সহায় হইয়া দাঁড়াইবে। ইহার অনুষ্ঠান করিতে হইলে, বাল্যকাল হইতেই কতকগুলি নিয়ম পালন করা চাই।

রাত্রির বিশ্রামের পর প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিবার সময়, ঈশ্বরের নাম স্মরণ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ রাত্রিতে শয্যায় বিশ্রাম করিতে যাইবার পূর্ব্বেও তাঁহার নাম লইতে হয়। আহারের সময়, তাঁহার প্রদত্ত ভোজ্য উপভোগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে অগ্রে নিবেদন করিয়া আহার করিতে শিক্ষা করাই উচিত। শয়ন, ভোজন, গমনাদি প্রত্যেক কার্য্যের অনুষ্ঠানেই যদি আমরা তাঁহাকে স্মরণ করিয়া চলিতে শিখি, তবে সৎকার্য্য করিবার ইচ্ছাই আমাদের স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়ে। সৎকার্য্য সাধনই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য। সুতরাং সৎকার্য্যশীল হইবার জন্য, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এবং সন্ধ্যা হইতে আবার প্রভাত পর্য্যন্ত যাহা করিবে, যেন তাঁহারই কার্য্য করিতেছ এইরূপ স্মরণ রাখিতে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। যেন সকল কার্য্যে তাঁহারই পূজা করিতেছ এইরূপ মনে রাখিতে পারিলে আমাদের দুঃখ থাকে না। এজন্য সাধু পুরুষেরা বলেন,—

"প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ,
যৎ করোমি জগন্মাত স্তদেব তব পূজনম্।"

বাস্তবিক ইহাই চরিত্র-সংগঠনের সাধারণ নিয়ম।

দ্বিতীয় অভ্যাস, বাল্যে বিদ্যা এবং যৌবনে ধন। কিন্তু ধর্ম্মহীন হইয়া বিদ্যা এবং ধন উপার্জ্জনের প্রয়াস পাইলে অভিমান, অসন্তোষ, দম্ভ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি নানাপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া উদ্দেশ্য লাভের বিঘ্ন করিয়া থাকে। ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া মনুষ্য যখন মনে করে, ভগবান নাই বা ভগবান কিছুই নন—আমিই আমার পুরুষকারে বা ক্ষমতায় সমস্ত উপার্জ্জন করিতেছি, তখন বাস্তবিক সে

তাহার দুঃখের কূপ খনন করে মাত্র। এইরূপ ধনবান দুঃখীর দৃষ্টান্ত আজিকার দিনে বিরল নয়।

যে বাল্যে বিদ্যা উপার্জ্জনে অবহেলা করে, যৌবনে তাহার ধনলাভ কদাপি সম্ভব নহে। বালকদিগের পাঠই "তপস্যা" বা সাধনা। বিদ্যাতে সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে, কতকগুলি বিষয়ে অবশ্য দৃষ্টি রাখিতে হয়। এতৎসম্বন্ধে প্রাচীন বহুদর্শী জ্ঞানিগণের উপদেশ শিরোধার্য্য। তাঁহারা বলেন,—

"কাকচেষ্টা বকধ্যানং শুনোনিদ্রা তথৈব চ,
স্বল্পাহারী গৃহত্যাগী বিদ্যার্থেঃ পঞ্চলক্ষণম্।"

বিদ্যার্থীর পক্ষে কাকের ন্যায় চেষ্টা, বকের ন্যায় মনোযোগ, কুকুরের ন্যায় নিদ্রা, এবং অল্পাহার ও পরিবার মধ্যে অনবস্থান সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

সকলেই বোধ হয় দেখিয়া থাকিবে, কাক আহার লাভের জন্য সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বালকগণ পাঠাভ্যাসের জন্যও সর্ব্বদা সেইরূপ ব্যগ্র থাকিবে। আবার, শুধু পুস্তক সম্মুখে খুলিয়া রাখিলে বা পুস্তক হাতে করিয়া লোক দেখান পড়িলে বিদ্যা হয় না। পাঠকালে বকধ্যান স্মরণ করা কর্ত্তব্য। দেখিয়াছ বক কেমন ধীরভাবে একাগ্রচিত্তে জলাশয়ের নিকটে দণ্ডায়মান থাকে—তদ্গতচিত্ত হইয়া আহারের প্রতি কেমন লক্ষ্য করিয়া থাকে। অন্য পক্ষ্যাদির কোলাহলে বক কখনও অন্যমনস্ক হয় না। পাঠাভ্যাসকালে, বালকদিগেরও সেইরূপ একাগ্রতা শিক্ষা করা উচিত। অন্যমনস্ক হইয়া সমস্ত দিন পুস্তক লইয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা অল্প সময় একাগ্রচিত্তে পাঠাভ্যাস করিলেও কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে।

আহার ও নিদ্রা অধিক ভাল নহে। কুকুরের নিকট নিদ্রা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। ইহারা অধিক নিদ্রা যায় না, আবার ইহাদের নিদ্রাও খুব সজাগ। বালকেরা রাত্রি ৮।৯টার সময় নিদ্রা গিয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান অভ্যাস করিলে সুস্থ শরীরে বিদ্যালাভে সমর্থ হইতে পারে। অভ্যাস হইয়া গেলে ৬।৭ ঘণ্টার অধিক নিদ্রা আবশ্যক হইবে না। আবার পুনঃপুনঃ অধিক আহারও পাঠার্থীর পক্ষে দূষণীয়। অধিক আহারে শরীর জড়ভাব প্রাপ্ত হয় এবং মনের কার্য্য সম্যক স্ফুরিত হয় না।

বিদ্যার্থীর, স্বগৃহ হইতে দূরে থাকাই প্রশস্ত। পূর্ব্বে গুরুগৃহ ছিল, এক্ষণে ছাত্রাবাসে কতকটা সেইরূপ কার্য্য হয়। আর যাঁহারা এখন পুত্রকন্যাদিগকে ছাত্রাবাসে রাখিতে অনিচ্ছা করেন, তাহাদের পাঠাগারের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়া দিলেও কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। বালক বালিকাদিগকে পাঠকালে সাংসারিক কার্য্য হইতে একবারে অব্যাহতি দেওয়াই উচিত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বিনা চেষ্টায় কোন কার্য্যই হয় না। উপরি উক্ত অভ্যাস লাভ করিতে হইলেও পুনঃপুনঃ চেষ্টা আবশ্যক। যতদিন অভ্যাস না হয়, ততদিনই প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে।

এইরূপে ধর্ম্মশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই যদি বাল্যকালে বিদ্যা উপার্জ্জিত হয়, তবে উত্তরকালে ধন লাভ করিয়া অবশ্যই সুখী হইতে পারিবে। যিনি এই প্রকার অভ্যাস দ্বারা চরিত্রগঠন করেন, তিনিই রত্ন। তাঁহা দ্বারা তাঁহার নিজের, এবং পরিবার, সমাজ, দেশ, জাতি ও অপর সাধারণের যথেষ্ট উপকার হয়। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ রত্ন উপাধি লাভ করিবার উপায়ও বলিয়া দিয়া গিয়াছেন। একবারে সকল বিষয়ে রত্ন হইতে না পার, হতাশ হইও না। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, "জাতৌ জাতৌ যদুৎকৃষ্টং তৎ রত্নং ইতি কথ্যতে।" গুণ অনেক আছে। যখন যে গুণে রত্ন হইতে পার, তাহারই চেষ্টা কর।

অতুলের গাড়ী।

গড়্-গড়্ গড়্-গড়্ কাঠের গাড়ী টান্‌ছে অতুল তাড়াতাড়ি;
খানিক দূরে দৌড়ে গিয়ে,
ঠেক্‌লো চাকা ইঁটে।
আর চলে না গাড়ীখান,
তবু অতুল মারে টান,
পূরো জোরে ভরটা দিয়ে,
ডান পা, কোমর, পিঠে॥
খুকী ব'সে গাড়ীর খোলে,
পুতুল খোকা ঘুমোয় কোলে;
থাম্‌লো গাড়ী দেখে খুকী
কাঁদো মুখে কয়;—
"ও বও-দা! গাযী তানো,
চুপ্‌তি কোয়ে দাঁয়িয়ে কেনো? দেগে উতে কাঁদ্‌বে থেলে, তাইতো আমাল্ ভয়॥"

কুকুর-বংশ।

কুকুর-বংশের সকল জন্তুই প্রকৃত শ্বাপদ। কুকুর, নেকড়ে বাঘ, শিয়াল ও খেঁক্‌শিয়াল কুকুর বংশের পরিচিত জন্তু। ইহাদের সাধারণ লক্ষণ এই যে মস্তকটি লম্বা, লেজ ছোট, বিড়াল-বংশের জন্তুর ন্যায় পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়া চলে, আমাদের মত পায়ের তলায় ভর দিয়া চলে না। পদের গঠন হইতেই ইহারা শ্বাপদ নাম পাইয়াছে। আঙ্গুলের নীচে এক একটা মাংসপিণ্ড আছে। পশ্চাতের দুই পায়ে চারি চারি আট আঙ্গুল এবং সম্মুখের দুই পায়ে পাঁচ পাঁচ দশ আঙ্গুল; এই-রূপে সর্ব্বশুদ্ধ ১৮টি আঙ্গুল আছে। কোন কোন পোষা কুকুরের পশ্চাতের পা দুটিতেও দশটি আঙ্গুল অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ২০টি আঙ্গুল দেখা যায়। সম্মুখের পায়ের বুড় আঙ্গুলটি এত ছোট যে মাটি স্পর্শ করে না। নখগুলি তত ধারাল নহে, এবং বিড়ালের ন্যায় নখগুলিকে পশ্চাৎ দিকে বাঁকাইতে পারে না।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই কুকুর-বংশের কোন না কোন জন্তু আছে। ইহাদের মধ্যে এত সাদৃশ্য যে, দেখিবা-মাত্রই কুকুর-বংশীয় কি না, চিনিতে পারা যায়। ইহারা সকলেই মাংসাশী অর্থাৎ মাংস ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। সকলেরই ঘ্রাণ, শ্রবণ ও দর্শন শক্তি প্রবল। আমাদের দেশে কুকুর-বংশের তিনটি জাতি আছে। ইহাদের কথা বলা যাইতেছে।

বন্য বিড়াল গৃহপালিত হইয়া আমাদের পোষা বিড়াল হইয়াছে; কিন্তু বন্য কুকুর হইতে আমাদের গৃহপালিত কুকুর আসে নাই। নেকড়ে বাঘ ও শিয়াল আমাদের পোষা কুকুরের পূর্ব্বপুরুষ। প্রথমে কুকুর-পরিবারের অর্থাৎ নেকড়ে বাঘ ও শিয়ালের কথাই বলা যাইতেছে। ইহাদের লেজ বড় বড় লোমে আবৃত, চোখের তারা গোল, এবং ইহাদের দশটি স্তন আছে।

নেকড়ে বাঘের গাত্র রক্তাভ পাংশুবর্ণ। মস্তক সহিত দেহ প্রায় দুই হাত লম্বা, লেজটি প্রায় এক হাত। বঙ্গদেশে নেকড়ে বাঘ অধিক নাই। নিবিড় বনে নেকড়ে বাঘ থাকে না। দশ বারটা নেকড়ে একত্র মিলিয়া বেড়ায়। ছাগ, মেষ, ছোট হরিণ ও পাখী শিকার করিয়া আহার করে। দুই তিনটি মিলিয়া কখনও কখনও লোকালয়ে প্রবেশ করে। কখনও কখনও ইহারা শিয়াল, কুকুর, শশক প্রভৃতি বধ করে। নেকড়ে বাঘ যেমন ধূর্ত্ত, তেমনই সাহসী। ইহাদের কৌশল প্রকাশের অনেক গল্প শুনা যায়। নেকড়ে বাঘ অনায়াসে পোষ মানাইতে পারা যায়। আমাদের গ্রাম্য কুকুর নেকড়ের দলে মিশিয়াছে এরূপ শুনা গিয়াছে।

ধূর্ত্ততার জন্য শৃগাল যেমন প্রসিদ্ধ, তেমন কোন জন্তুই নহে। শিয়াল দেড় হাত দুই হাত লম্বা। ভারতের সকল স্থানেই শৃগাল আছে। বনে, গ্রামের জঙ্গলে এবং সহরেও শৃগাল দেখা যায়। শিয়ালের ডাক তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। রাত্রি-কালে ইহারা আহারান্বেষণে বাহির হয়। ইহারা সকল প্রকার মৃত জন্তুর দেহ ভক্ষণ করে, এজন্য শ্মশানভূমির নিকটে শিয়ালের গর্ত্ত প্রায়ই দেখা যায়। কোন জন্তু না পাইলে ইহারা কুল, আক, জনার খাইয়া কৃষকের বিস্তর ক্ষতি করে। কোন কোন স্থলে গ্রাম্য কুকুরের সহিত শিয়ালের ভাব হইতে দেখা গিয়াছে। কুকুর যেমন কখনও কখনও পাগল হয়, শিয়ালও তেমনই পাগল হয়। পাগ্‌লা কুকুরের ন্যায় পাগ্‌লা শিয়ালের কামড়েও ভয়ানক বিষ আছে।

নেকড়ের ও শিয়ালের জ্ঞাতি বন্য কুকুর। বন্য কুকুর নাম হইতে আপাততঃ মনে হয় যেন বন্য কুকুর আমাদের গ্রাম্য কুকুরের মত হইবে। বাস্তবিক তাহা নহে। শিয়ালের সহিত বন্য কুকুরের সাদৃশ্য। বন্য কুকুরের গায়ের রঙ্গ পোড়ামাটির রঙ্গের মত। শিয়ালের লেজের মত বন্য কুকুরের লেজ লম্বা লম্বা লোমে পরিপূর্ণ।

বন্য কুকুর বনে থাকে। বঙ্গদেশে বন্য কুকুর নাই। ইহারা ২০।২২টা একত্রে দল বাঁধিয়া বেড়ায়, কিন্তু লোকালয়ে প্রবেশ করে না। সুযোগ পাইলে ভেড়া, ছাগল, গোরু অনায়াসে বধ করে। বন্য শূকর, হরিণ প্রভৃতি ইহাদের প্রধান খাদ্য। বন্য কুকুর না কি বড় বড় বাঘকেও বধ করিতে পারে। বন্য কুকুর পোষমানান বড় কঠিন।

কুকুর-বংশের তৃতীয় জ্ঞাতি খেঁক্‌শিয়াল। শিয়াল অপেক্ষা খেঁক্‌শিয়ালের লেজ লম্বা, মুখ সরু, পা ছোট। লেজের লোমও বড় বড়। কাণ দুটি বড় বড় এবং চোখের তারাটি বিড়ালের ন্যায় রেখা-কার। খেঁক্‌শিয়ালীর ছয়টি মাত্র স্তন।

খেঁক্‌শিয়াল অনেক রকম আছে। ভারত-বর্ষেই প্রায় ৪।৫ রকম খেঁক্‌শিয়াল দেখা যায়। বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে যে খেঁক্‌শিয়াল দেখা যায়, তাহারই বিষয় দুই চারি কথা বলা যাইতেছে।

খেঁক্‌শিয়াল প্রায় এক হাত লম্বা, লেজটি তিন পোয়া লম্বা। বঙ্গদেশের প্রায় সকল গ্রামে ও মাঠে খেঁক্‌শিয়াল আছে। ইহারা ছাগলছানা, ইন্দুর, পোকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীব আহার করে। কোন কোনটা কাঁকড়া ও চিংড়িমাছও খায়। কাঁকড়া ধরা সম্বন্ধে

লোকে বলে যে কাঁকড়ার গর্ত্তে খেঁক্‌শিয়াল তাহার লেজটি প্রবেশ করাইয়া দেয়। কাঁকড়া তাহার সাঁড়াশীর মত পা দিয়া শিয়ালের লেজ চিমটাইতে থাকে। তখন শিয়াল লেজটি কাঁকড়া শুদ্ধ টানিয়া বাহির করে। চিংড়ি মাছও না কি এই প্রকারে ধরে। কুল, শশা, তরমুজ খাইয়া ইহারা কৃষকের বিস্তর অনিষ্ট করে।

খেঁক্‌শিয়াল খোলা জায়গায় গর্ত্ত করিয়া বাস করে। গর্ত্তগুলি বড় সুন্দর ও বিচিত্র। গর্ত্তের অনেকগুলি দ্বার থাকে। একটা দ্বার দিয়া ধরিতে গেলে, অন্য দ্বার দিয়া পলাইয়া যায়।

বড়দিন।

ভাই, বড়দিনের ছুটি!
বাবা কাকা ঘরে এয়েছেন
থাক্‌বেন দিন ছুটি।
আমরা সবাই মনের সাধে
কর্‌বো ছুটোছুটি,
খাবো রসে ভরা কমলা, আঙুর,
কপি, কড়াইশুঁটি।
বাবা কাকার সঙ্গে যাবো,
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবো,
ঘোড়দৌড় আর ঘোড়ার নাচ
দেখ্‌বো সবে জুটি'!

আমাদের সাহস ও বাহু-বলের কথা।

তোমরা ইতিহাসে পড়িয়াছ, অনেক দেশের অনেক বীরপুরুষ নিরস্ত্র হইয়া সিংহ ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। ইতিহাস-লেখকেরা ইঁহাদের সাহস ও বাহুবলের প্রশংসা করিতে ত্রুটি করেন নাই। পঞ্জাবের অধিপতি মহারাজ রণজিৎ সিংহের একজন বৃদ্ধ সেনাপতি ছিলেন। ইঁহার যেরূপ সাহস, সেইরূপ বাহুবল ছিল। কোন পর্ব্বতগুহায় একটি দুর্দ্দান্ত সিংহ বাস করিত। পঞ্জাবের বৃদ্ধ সেনাপতি বন্দুক ও তরবারি না লইয়া, সিংহের বাসস্থান সেই গহ্বরে প্রবেশ করেন। তাঁহার অসামান্য বাহুবলে পশুরাজের পরাক্রম খর্ব্ব হয়। পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ এই কেশরিবিজয়ী সেনাপতির সাহসের সম্মান করিতে বিমুখ হয়েন নাই।

দিল্লীর সম্রাট শের শাহের কথা তোমরা জান। ইনি নিজের পরাক্রমে মোগল সম্রাট হুমায়ুনকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিল্লীর সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শের শাহের পূর্ব্বের নাম ছিল ফরিদ খাঁ। ইনি শূরবংশীয় ছিলেন। এজন্য লোকে ইঁহাকে ফরিদ খাঁ শূর বলিয়া ডাকিত। ইনি স্বহস্তে একটি ব্যাঘ্র বধ করেন। পারস্য ভাষায় ব্যাঘ্রের নাম 'শের'। এজন্য ফরিদ খাঁর নাম শের শাহ হয়। ফরিদ খাঁ আপনার বাহুবল ও সাহসের গৌরব বাড়াইবার জন্য 'শের শাহ' এই নাম গ্রহণ করেন।

তোমরা নুরজাহানের নাম শুনিয়াছ। ইনি মোগল সম্রাট জাহাঁগীরের মহিষী হইয়া আপনার

অসামান্য ক্ষমতা ও আধিপত্যের পরিচয় দেন। এখন আমরা যে আতরের গন্ধে আমোদিত হইয়া থাকি, নুর্‌জাহানের যত্নে তাহা ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়। এখনকার বাই-আনা পোষাকও নুর্‌জাহানের আমলে প্রস্তুত হয়। নুর্‌জাহানের পূর্ব্বনাম মেহেরুন্নেসা। সম্রাট জাহাঁগীর ইঁহাকে বিবাহ করিয়া, নুর্‌জাহান অর্থাৎ "জগতের জ্যোতিঃ" নামে পরিচিত করেন। প্রথমে শের আফ্‌গান নামক একজন প্রসিদ্ধ বীর পুরুষের সহিত নুর্‌জাহানের বিবাহ হয়। সর্ব্বপ্রথম নুর্‌জাহানের যেমন মেহেরুন্নেসা নাম ছিল, সেইরূপ প্রথমে শের আফ্‌গানেরও অস্তাজিলো নাম ছিল। অস্তাজিলো বিনা অস্ত্রে ব্যাঘ্র বধ করিয়া, শেরশাহের ন্যায় 'শের আফ্‌গান' নাম ধারণ করেন। ফরিদ খাঁ শূর ও অস্তাজিলো, উভয়েই আপনাকে ব্যাঘ্রনিহন্তা বলিয়া গৌরবান্বিত করিতে ত্রুটি করেন নাই, যেহেতু উভয়েই পূর্ব্বনাম পরিত্যাগ করিয়া, অস্ত্র ব্যতীত এক একটা প্রকাণ্ড বাঘ মারিয়া ফেলার পরিচয় দিবার জন্য শের নাম গ্রহণ করেন।

এক সময়ে আমাদের দেশেও এইরূপ ব্যাঘ্রনিহন্তা বীর পুরুষের অভাব ছিল না। ফরিদ খাঁ ও অস্তাজিলো যাহা করিয়াছেন, এক সময়ে একজন বাঙ্গালী যুবকও তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু ফরিদ খাঁ ও অস্তাজিলো এজন্য যে প্রশংসা পাইয়াছেন, সে প্রশংসা এই হতভাগ্য বাঙ্গালী যুবকের অদৃষ্টে ফলে নাই।

বঙ্গের এই সাহসী ও শক্তিশালী যুবকের নাম উদয়নারায়ণ। ইঁহার উপাধি মজুমদার। ইনি মিত্রবংশীয় ও ঢাকা জেলার অন্তর্গত উলাইল গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ঘটনাক্রমে উদয়নারায়ণের ভূসম্পত্তি অপরের হস্তগত হয়। উদয়নারায়ণ এজন্য মুর্ষিদাবাদে যাইয়া নবাবের নিকটে অভিযোগ করেন। নবাব কহিলেন, যদি উদয়নারায়ণ নিরস্ত্র হইয়া ব্যাঘ্র বধ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি পুনর্ব্বার ভূসম্পত্তির অধিকারী হইবেন। উদয়নারায়ণ বিলক্ষণ সাহসী ও বলিষ্ঠ ছিলেন। নবাবের কথায় ভীত হইলেন না। অবিলম্বে একটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রের সহিত উদয়নারায়ণের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। উদয়নারায়ণের হস্তে তরবারি বন্দুক প্রভৃতি কিছুই ছিল না। উদয়নারায়ণ কেবল আপনার বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া, ভয়ঙ্কর শ্বাপদের ক্ষমতানাশে উদ্যত হইলেন। উদয়নারায়ণের উদ্যম সফল হইল। তাঁহার অসামান্য শক্তিতে ব্যাঘ্র ক্রমে নিস্তেজ ও গতাসু হইল। নবাব সন্তুষ্ট হইলেন। উদয়নারায়ণের সাহস ও বাহুবল দেখিয়া, তাঁহার হস্তে ভূসম্পত্তি প্রত্যর্পণের আদেশ দিলেন। এক সময়ে বাঙ্গালীর এইরূপ সাহস ও শক্তি ছিল। শের শাহ্ ও শের আফ্‌গানের কথা অনেকেই জানে—অনেকেই ইতিহাসে তাঁহাদের বীরত্বের কথা পড়িয়া স্তম্ভিত হয়, কিন্তু হতভাগ্য দেশের হতভাগ্য জীব—উদয়নারায়ণের কথা কেহই জানে না। ইতিহাসেও তাঁহার কথা দেখা যায় না। আমাদের সকল কথাই এখন এইরূপে চাপা পড়িয়াছে। যাহাতে আমাদের গৌরব ও প্রশংসা, এখন আর তাহার আলোচনা হয় না। সাধারণে আমাদিগকে কাপুরুষ নিস্তেজ বলিয়াই মনে করে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে কখনও কাপুরুষ ও নিস্তেজ ছিলাম না। আমাদের সাহস—আমাদের বীরত্ব—আমাদের তেজস্বিতার অনেক কথা আছে। ভালরূপে বাঙ্গালার ইতিহাসের আলোচনা করিলে সে সকল কথা তোমরা ক্রমে জানিতে পারিবে।

ফেরোজ্ শা মেটা।

খৃষ্টীয় ১৮৪৫ অব্দের ৪ঠা আগষ্ট বোম্বাই নগরে ফেরোজ্ শা মেটা জন্মগ্রহণ করেন। ফেরোজ্ শা জাতিতে পার্সি। ইঁহার পিতা বোম্বাইর একটি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের একজন অংশীদার ছিলেন। ষোল বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ফেরোজ্ শা স্থানীয় ম্যাট্রিকিউলেশন্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং খৃঃ ১৮৬৪ অব্দে বোম্বাইর এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় কৃত-কার্য্যতা লাভ করেন। ছয় মাসের মধ্যেই আবার এম, এ পরীক্ষায় বিশেষ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে, পার্সি যুবকদিগের মধ্যে, ইনিই প্রথম এম এ উপাধি লাভ করেন।

এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ সার্‌ আলেক্‌জাণ্ডার গ্রাণ্ট, ফেরোজ্‌ শার অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়া পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার উপর বড়ই সন্তুষ্ট ছিলেন। ফেরোজ্‌ শার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বাগ্মিতা শক্তির বিষয়ও তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। এজন্য ফেরোজ্‌ শা এম্‌ এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই, তাঁহাকে বারিষ্টার করিবার জন্য বিলাত পাঠাইতে তাঁহার পিতাকে তিনি অনুরোধ করিলেন। ফেরোজ্‌ শার পিতার ইচ্ছা না থাকিলেও, শেষে তিনি গ্রাণ্ট্‌ সাহেবের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং ফেরোজ্‌ শাকে বিলাতে পাঠান হইল। তিন বৎসর তথায় জ্ঞানলাভ করিয়া ফেরোজ্‌ শা বারিষ্টার হইলেন।

ইহার পর ফেরোজ্‌ শা দেশে আসিয়া ব্যবহারাজীবের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং অল্প সময়ের মধ্যেই, এই কার্য্যে, তাঁহার যশ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। দেশ-হিতকর বিবিধ কার্য্যে তিনি এই সময়েই বিশেষরূপে মনোযোগ দিবার সুবিধা পাইলেন। যাহারা তাঁহাকে এত দিন চিনিত না, এখন তাহারাও তাঁহাকে চিনিতে আরম্ভ করিল। স্বদেশী বিদেশী অনেক বড় বড় লোক মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসাবাদ ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

ফেরোজ্‌ শা জাতীয় মহাসমিতির একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। খ্রিঃ ১৮৯০ অব্দে কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির ষষ্ঠ সাংবৎসরিক অধিবেশনে ইনিই সভাপতির পদে বরিত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি ইনি আমাদের বড়লাট মহোদয়ের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। আমরা আশা করি, তিনি সেখানেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবেন।

ভল্লূকপালিতা কন্যা।

[কলিকাতা অনাথ-আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্ত লিখিয়াছেন :—]

গত বৎসর নবেম্বর মাসের "সখায়" আপনার ক্ষুদ্র পাঠক পাঠিকাদিগের জন্য ভল্লূকপালিতা কন্যার বিষয় লিখিয়াছিলাম এবং তাহার পরে কিরূপ উন্নতি হয় তাহাও লিখিয়া দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলাম। এই এক বৎসরের বৃত্তান্ত লিখিতেছি, পাঠক পাঠিকাগণ একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে পারিবেন।

আমরা ইহার নামকরণ করিয়াছিলাম ; নাম হইয়াছিল—"জাম্ববতী।" কিন্তু কেহই সে নাম ধরিয়া তাহাকে ডাকে না। "ভল্লূকী" নামেই সে পরিচিত।

ভল্লূকীর অনুকরণপ্রিয়তা অতি আশ্চর্য্য! সে যাহা করিতে দেখে, তাহাই করিতে চেষ্টা করে। ভালুক নিজের বিছানা পাতিয়া লয়, মশারি টাঙ্গায়। কোন প্রকার অসুবিধা হইলে চীৎকার করে। রাত্রিতে বাহিরে যাইবার প্রয়োজন হইলে, দ্বারের হুড়কা খুলিয়া বাহিরে যায়, আবার ফিরিয়া আসিয়া হুড়কা বন্ধ করিয়া শয়ন করে। আপনার ভিজা বস্ত্র ও বিছানা রৌদ্রে শুকাইতে দেয়, কিন্তু না বলিলে করে না।

স্নান করিতে, গা মুছিতে, চুল আঁচড়াইতে, পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিতে, অলঙ্কার পরিতে সে

এত ভাল বাসে যে, তাহার জন্য যত কেন কষ্ট হউক না, কিছুতেই বিরক্ত হয় না।

আগে গাড়ীতে উঠিতে হইলে মহা হাঙ্গাম বাধাইত। এখন গাড়ী করিয়া কোথাও বেড়াইতে যাইবার সময় তাহার মুখে হাসি আর ধরে না।

সামান্য একটু অসুখ হইলে হাত বুক ও ললাট পরীক্ষা করিতে ইঙ্গিত করে। ঔষধ সেবন করিতে দিলে বড় আহ্লাদ হয়। ঔষধের তীব্র আস্বাদে মুখ প্রথমতঃ বিকৃত করে বটে, কিন্তু কষ্ট প্রকাশ করে না।

ভল্লুকী বড় পরিষ্কার। চলিবার সময় পায়ে একটু কাদা কিম্বা গোবর লাগিলে, যতক্ষণ তাহা না মুছিয়া পরিষ্কার করিবে, ততক্ষণ আর চলিবে না। কোথাও একটু জল লাগিলে, কাপড় দিয়া তখনই মুছিয়া ফেলে।

যখন মেজাজ ভাল থাকে, তখন হাসি নাচ, আমোদ প্রমোদ যথেষ্ট করে। তখন তাহাকে যাহা করিতে বলা যায়, তাহাই করিবার চেষ্টা করে। এবং অন্য লোককে সেই কার্য্য যেরূপ করিতে দেখিয়াছে, মনোনিবেশপূর্ব্বক ঠিক সেই রূপ করিবার চেষ্টা করে,—যেমন ঘর ঝাঁট দেওয়া বাসন মাজা, কাপড় কাচা, কাপড় কুচান প্রভৃতি গৃহকর্ম্ম করিবার বড় ইচ্ছা। কিন্তু হাতে পায়ে বল নাই। সুতরাং অল্পক্ষণ চেষ্টা মাত্র করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

যখন রাগিয়া থাকে, কাহার সাধ্য তাহার সম্মুখে যায়। ছেলেরা গেলে ধাক্কা দেয়, প্রহার করে, চীৎকার করে। তখন তাহার গায় বা কাপড়ে হাত দিলে, সে স্থান টুকু সে ঝাড়িয়া ফেলে। অধিক বিরক্ত করিলে, এমন চীৎকার করিয়া কাঁদে যে কাণে তালা লাগিবার উপক্রম হয়।

তাহাকে কথা কহাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম; "বা," "মা" বলিতে শিখিয়াছিল। কিন্তু এমন কষ্ট হয় যে, মানুষ মরিবার সময় যেমন তাহার সমস্ত অঙ্গে টান পড়িয়া থাবি খায়, কথা কহিবার চেষ্টা করিলে ইহার দশাও সেইরূপ হয়; এবং দুই দিন এইরূপ চেষ্টা করিলেই প্রায় জ্বর হয়।

যখন তাহাকে আনা হইয়াছিল, তখন আস্বাদনের তারতম্য সে বড় বুঝিত না; ঝাল তিক্ত মিষ্ট যে প্রকার হউক, খাদ্য পাইলেই আনন্দিত হইত—কোন খাদ্যেই মুখ বিকৃত করিত না। এখন ঝাল বা তিক্ত মুখে পড়িলেই মুখ বিকৃত করে, মিষ্ট ও সুস্বাদ খাদ্য পাইলে আনন্দের সীমা থাকে না।

আহার করিতে ভল্লুক এমন পটু যে যত দাও তত খাইবে, "না" বলিতে জানে না। আগে থাবা ভরিয়া ভাত লইয়া মুখের নিকট ছাড়িয়া দিত; কিছু মুখে যাইত, অবশিষ্ট বুকে পেটে ছড়াইয়া পড়িত। এখন কিন্তু আঙ্গুলে করিয়া ভাত তুলিয়া খায়, কখন কখন গরাস পাকাইয়াও খাইয়া থাকে; একটীও ছড়ায় না। যদি একটি ভাত থালার বাহিরে পড়ে, যত্নপূর্ব্বক সেটিকে তুলিয়া লয়। পূর্ব্বে মুখে যাহা দিত, তাহার কিছুই বাহিরে ফেলিত না, মাছের কাঁটা, থোড়ার ছিবড়া, ফলের খোসা—সমস্তই গিলিয়া ফেলিত। এখন, সেগুলি বাহির করিয়া ফেলে। অতি পরিষ্কার রকমে মাছের কাঁটা ও চিংড়ি মাছের খোসা ফেলিয়া দেয়। পূর্ব্বে চিবাইত না; খাদ্য মুখে করিয়া দু একবার চপ্‌চপ্‌ করিয়া গিলিত, এজন্য তাহার চর্ব্বণের দাঁতগুলি বর্দ্ধিত হয় নাই; সেগুলি অতি ক্ষুদ্র, পোকা ধরা এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া আছে। এখন অল্প অল্প চিবাইয়া খাইতে শিখিয়াছে। পূর্ব্বে মুখ ধুইত না, দাঁত মাজিত না; এখন ছাই দিয়া মুখ ধুইতে শিখিয়াছে।

তবে, অধিকাংশ ছাই-ই উদরসাৎ করে। দাঁতন ভাঙ্গিয়া দিলেও তদ্দারা দাঁত মাজিয়া থাকে। অতি কষ্টে কুলকুচা করিতে শিখান গিয়াছে; এখনও ভাল পারে না, মুখে জল দিলে প্রায়ই গিলিয়া ফেলে।

কোন ভদ্রলোক তাহাকে দেখিতে আসিলে, ইঙ্গিত করিবা মাত্র নমস্কার করে। আহারের পূর্ব্বে ঈশ্বরের উদ্দেশে নমস্কার না করিয়া আহার করে না। অন্য কোন ছেলে যদি নমস্কার না করিয়া আহার করিতে বসে, তাহা হইলে তাহাকে ধমক দেয় এবং নমস্কার করিতে ইঙ্গিত করে। কাহারও গায়ে পা লাগিলে নমস্কার করিতে হয় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে,—ভল্লুকের গা যদি কাহারও গায় লাগে, তাহা হইলেও ভল্লুক নমস্কার করে।

ভদ্র ও ইতর লোকের মধ্যে প্রভেদটুকু ভালুক বেশ বুঝে। ভদ্রলোক কথা কহিলে, গায় হাত দিলে খুব আনন্দ প্রকাশ করে, কিন্তু কোন ইতর লোক—স্ত্রীই হউক বা পুরুষই হউক—কথাবার্ত্তা কহিলে আদৌ গ্রাহ্য করে না, বরং বিরক্ত হয়, এবং তাহারা গায়ে হাত দিলে রাগিয়া চীৎকার করে।

শিল্পকার্য্য করিতে ভালুক অত্যন্ত ভাল বাসে। যেখানে একটু নেকড়া পায়, তাহা লইয়া সূতা বাহির করে, এক মনে সেই সূতা পাকায় এবং সূচে সূতা পরাইয়া ছেঁড়া নেকড়া সেলাই করে। আবার, একখানি খোলা পাইলে, তাহাকে ঘসিয়া আপনার ইচ্ছামত আকারে পরিণত করে এবং তাই লইয়াই অনেকক্ষণ কাটাইয়া দেয়। নিজের খেলিবার বস্তুতে ভালুক কাহাকেও হাত দিতে দেয় না—লুকাইয়া রাখে।

গৃহের যে সমস্ত দ্রব্যে তাহার হাত দেওয়া উচিত নহে, সে তাহা স্পর্শও করে না। অন্য কোন শিশু নিষিদ্ধ দ্রব্যে হাত দিলে বা নিষিদ্ধ কার্য্য করিলে, তাহাকে ইঙ্গিতে বারণ করে, বারণ না শুনিলে চীৎকার করিয়া অন্য লোককে ডাকিয়া দেয় এবং দোষী শিশু যাহা করিয়াছে তাহা বুঝাইয়া দেয়।

আজিও তাহার কয়েকটী পশুভাব বিলক্ষণ রকম আছে। কোন নূতন খাদ্য দ্রব্য দিলে না শুঁকিয়া খায় না। ছোট ছোট বিস্কুটের সহিত সেইরূপ ছু একখানা খোলা মিশাইয়া তাহার হস্তে দিলে, সে বিস্কুটগুলি খাইবে, খোলাগুলি হাসিয়া ফেলিয়া দিবে। একটী সন্দেশ, আর সেইরূপ আকারের একখানা সাবান দিয়া দেখা গিয়াছে সন্দেশটী আনন্দের সহিত খাইল, কিন্তু সাবানখানি আঘ্রাণ লইয়া ফেলিয়া দিল। এইরূপ অনেকবার পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সে পশুর ন্যায় আপনার খাদ্য চিনিয়া লইতে পারে। অন্ধকারে তাহার কিছুমাত্র ভয় নাই, গভীর রাত্রে ঘুটু ঘুটে অন্ধকারে একাকী খুব ঘুটু ঘুটু করিয়া বেড়ায়। তাহার কিছুমাত্র লজ্জা নাই। অন্যে বস্ত্র পরিধান করে, দেখা দেখি বস্ত্র পরিধান করে মাত্র; উলঙ্গ হওয়া যে অত্যন্ত অন্যায়, ইহা তাহাকে এ পর্য্যন্ত কিছুতেই বুঝাইতে পারা গেল না। তাহার বিষ্ঠা মূত্রের ধারণা শক্তি এত কম, যে নাই বলিলেই হয়; সেই জন্য প্রায়ই বাড়ীময় বিষ্ঠা ছড়াইয়া থাকে। প্রত্যহ শয্যায় মূত্রত্যাগ করে। কোন কোন রাত্রে দশ বার বারও মূত্রত্যাগ করিয়া থাকে। নিদ্রা যাইবার সময় মুখটী কোণে গুঁজিতে বা মুখে একখানা কাপড় জড়াইতে পারিলে বড় আরামে নিদ্রা যায়।

ভল্লুকীর গায়ের রক্ত বিষাক্ত বলিয়া অনুমান হয়। একদিন একটা মশা ইহার গায় বসিয়া কিছু রক্ত পান করিয়া পড়িয়া মরিয়া যাইতে দেখিয়াছি। ইহার শরীর এত ভারী যে টানিয়া তোলা কষ্টকর। কিন্তু হাতে পায়ে বল নাই বলিলেই হয়। দাঁড়াইয়া

আছে, এমন সময় কোন শিশু টানিলে বা সামান্য ধাক্কা দিলেই পড়িয়া যায়। কিন্তু একদিন একটী সাত আট বৎসরের বালক তাহার বিছানায় শুইয়াছিল, ভল্লূক তাহার একটা হাত ধরিয়া টানিয়া ফেলিয়া দিল।

পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহার কখনও কখনও জ্বর হয়, চোখে ঘা মুখে ঘা প্রভৃতি পীড়া হয়। যখন যে পীড়া হয় তাহা সহজে আরাম হয় না, অনেক দিন কষ্ট দেয়। ইতিপূর্ব্বে রক্তহীনতা রোগে কষ্ট দিয়াছে, শীতের হাওয়ায় অনেকটা সারিয়াছে। কিন্তু চিকিৎসকেরা বলেন, এ অধিক দিন বাঁচিবে না। প্রথমতঃ, ভুটানবাসীরা নিম্ন বঙ্গে বড় গরম অনুভব করে, ইহারও তাহাই হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, জলপাইগুড়িতে আহারের চেষ্টায় সমস্ত দিন ঘুরিত। এখানে ঘুরিতে পায় না, অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলিতেও চায় না।

বিড়ালীর শাস্তি।

বনের পাখীটির মনের সুখ নাই,
খাঁচায় ঝট্ পট্ করে,
একমনে বিড়ালী
চেয়ে চেয়ে দেখে তাই,
টস্ টস্ জিবে জল সরে।

মাঝে মাঝে আধখানা
মুখ বা'র করে পাখী,
খাঁচায় চঞ্চুটি হেনে,
তাই দেখে' মনে লোভ,
চঞ্চুটি কামড়িয়া
মুণ্ডটি ধরে মেনি টেনে।

ওই—ওই—ফের ওই চঞ্চুটি বাহিরায়,
থির নাহি হয় প্রাণ আর,
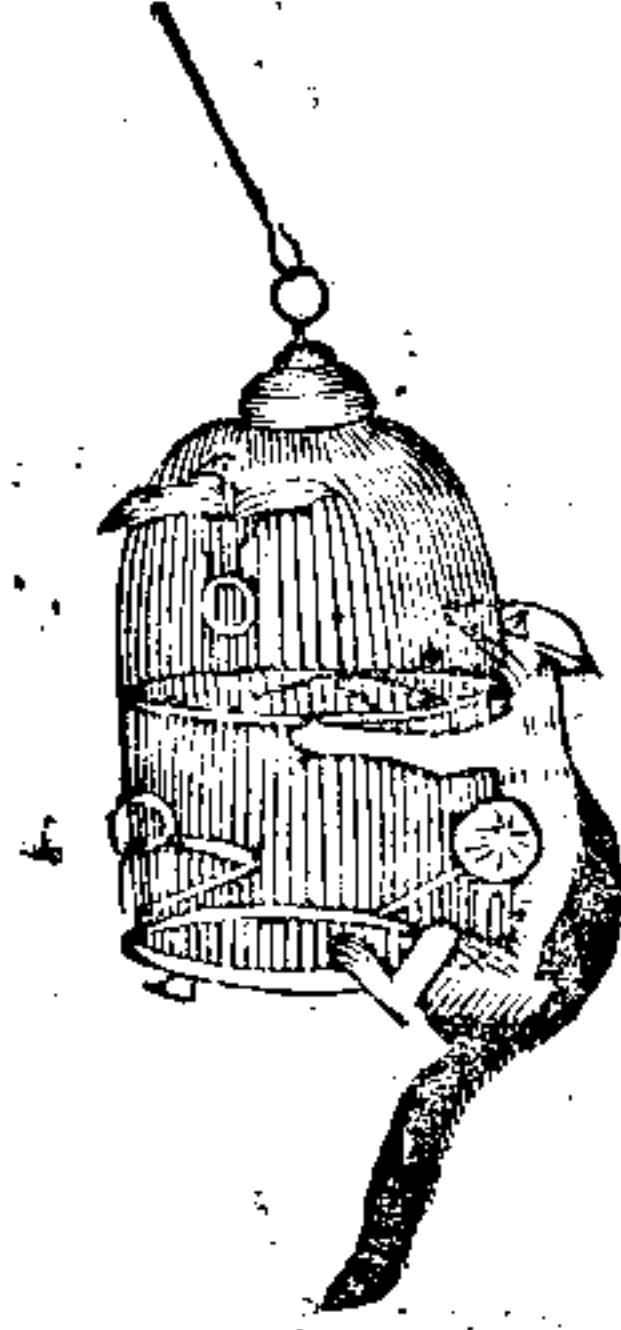
ঝপ্ করে পড়ে মেনি খাঁচাটিতে লাফিয়ে,
দোলে খাঁচা লাফানিতে তার।
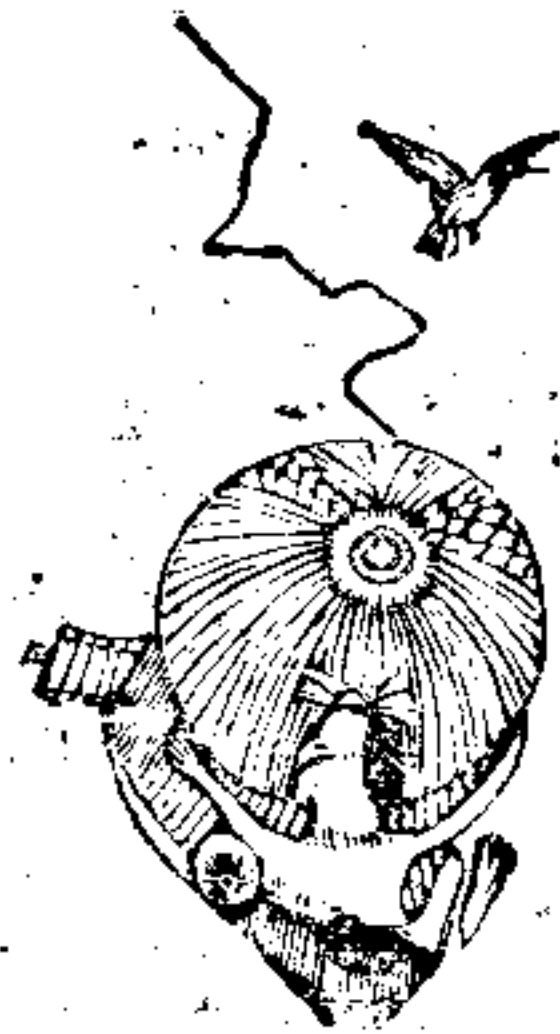
কট্ করে' কাটে সুতো, ঘুরে ছুলে পড়ে খাঁচা,
খোলে দ্বার পেয়ে ঝাঁকাঝাঁকি,
চিৎপাত হ'য়ে মেনি পড়ে' যায় চিপ্ করে'
ফুক্ করে' উড়ে যায় পাখী।